হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী

হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী

৬

সম্পাদনায়

গীতা দত্ত

সুখময় মুখোপাধ্যায়

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি

কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ॥ কলকাতা-সাত

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ৩০, ১৩৯১
জুলাই ১৫, ১৯৮৪
দ্বিতীয় মুদ্রণ
ভাদ্র ১৭, ১৩৯১
সেপ্টেম্বর ৩, ১৯৮৪

প্রকাশিকা
গীতা দত্ত
এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
এ/১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলকাতা-৭০০ ০০৭

মুদ্রাকর
ধনঞ্জয় দে
রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ
রমেন আচার্য
কলকাতা-৭০০ ০০৯

অলঙ্করণ
তাপস দত্ত
কলকাতা-৭০০ ০২৯

বাঁধাই
জয়দুর্গা বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
কলকাতা-৭০০ ০০৯

দাম
ত্রিশ টাকা

লেখক প্রসঙ্গে

আজ থেকে একচল্লিশ বছর আগে অর্থাৎ ১৯৪৩ সালে যখন আমি পারিবারিক পুস্তক প্রকাশনা ব্যবসায় ঢুকি তখন থেকে আজ পর্যন্ত অনেক বিখ্যাত লেখক-লেখিকাকে দেখবার আমার সৌভাগ্য হয়েছে। তার একটা কারণ এইজন্যে যে, আমার পিতৃদেব সুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত ছোটদের মাসিকপত্র 'মৌচাক'কে ঘিরে যে আড্ডা হোতো, সেই সময় অনেক নামকরা লেখকই সেখানে আসতেন। বলতে কি তারও আগে 'ভারতী' পত্রিকার আড্ডা থেকেই 'মৌচাকে'র জন্ম।

সেইজন্যে আজকে যাঁর কথা আমার প্রথমেই মনে পড়ছে তিনি হচ্ছেন হেমেন্দ্রকুমার রায়। অনেকেরই ধারণা তিনি শুধু ছেলেদের জন্যে এ্যাড্‌ভেঞ্চার আর ভূতের গল্পই লিখে গেছেন। ছেলেদের গল্প-উপন্যাস লেখবার আগে তিনি বড়দের জন্য প্রচুর গল্প, নাটক, গান ইত্যাদি লিখে গেছেন। সেই সময় তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত কলা সমালোচক। বাংলায় প্রথম মঞ্চ এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধে যে পত্রিকাটি বেরিয়েছিল—তিনি ছিলেন তার সম্পাদক। পত্রিকাটির নাম 'নাচঘর'।

আমার পিতৃদেবের আত্মজীবনী 'আমার কাল আমার দেশ' থেকে হেমেন্দ্রকুমারের সম্বন্ধে কিছু উদ্ধৃতি তুলে দিচ্ছি ঃ

"এর পর থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ছোটদের লেখা নিয়েই তিনি কাটিয়ে দিলেন। তাঁর লেখার মধ্যে এমন একটা সহজ, সুন্দর, সরলতা ও মাদকতা ছিল যা পড়তে শুরু করলে শেষ না করে ওঠা যায় না। মূলতঃ তাঁর লেখাগুলি কিশোর-কিশোরীদের জন্যে হলেও বড়রাও তা থেকে সমান আনন্দ পেতেন। এইখানেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, আর এই শ্রেষ্ঠত্বের জন্যই তিনি একজন শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্যিক হিসাবে 'মৌচাক' পুরস্কার পেয়েছিলেন।

ভারতীয় চিত্রশিল্প ও আর্টের প্রতি তাঁর অসাধারণ আগ্রহ ছিল। এই জন্য তিনি আর্ট সম্পর্কিত বহু প্রবন্ধ লিখেছিলেন। থিয়েটার,

সিনেমা ইত্যাদির প্রতিও তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। কয়েকটি থিয়েটারে ও ছবির পর্দায় তিনি নৃত্যের পরিকল্পনা করে দিয়ে তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি রেখে গেছেন। মঞ্চ ও চিত্রজগতের সমস্ত শিল্পীদের সঙ্গেই তাঁর অন্তরঙ্গতা ছিল। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার, নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী, নৃত্য যাদুকর উদয়শঙ্কর—এঁরা ছিলেন হেমেন্দ্রকুমারের বিশিষ্ট বন্ধু।

গীতিকার হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল অসামান্য। শিশিরকুমার প্রযোজিত ও যোগেশ চৌধুরী রচিত বিখ্যাত 'সীতা' নাটকের 'অন্ধকারের অন্তরেতে' গানখানি তাঁরই রচনা। এ ছাড়াও তাঁর বহু গান রেডিও, গ্রামাফোন ও থিয়েটারে অত্যন্ত প্রশংসার সহিত গীত হয়েছে। তাঁর কয়েকটি উপন্যাস 'পায়ের ধূলো', 'যকের ধন', 'তরুণী' চিত্রায়িত হয়েছে।"

১৬৯ শরৎ বসু রোড
কলিকাতা-২৬

সুপ্রিয় সরকার

সূচীপত্র

হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী

ছয়

মহাভারতের শেষ মহাবীর

(একটা মশককে অমর করে দিলুম,সেও তোমাদের মতো বড়ই হেমেন্দ্রভক্ত,মোটেই নড়তে চাইল না।)

প্রথম

পালা সুরুর আগে

আধুনিক ইতিহাস বলে, কুরুক্ষেত্রের যোদ্ধাদের কাহিনী হচ্ছে পৌরাণিক রূপকথা। এখানে ঐতিহাসিকদের সঙ্গে তর্ক করবার দরকার নেই। রামায়ণী কথাকেও তাঁরা আমল দেন না। এ নিয়েও গোলমাল করে লাভ নেই।

কিন্তু আজ আমরা যে মহাবীরের কাহিনী বলতে বসেছি, তিনি পৌরাণিক ইতিহাস-পূর্ব যুগের মানুষ নন। কেবল প্রাচীন ইতিহাসে, ভ্রমণ-কাহিনীতে, কাব্যে ও নাট্য-সাহিত্যেই তাঁর নাম অমর হয়ে নেই, তাঁকে সত্যিকার রক্ত-মাংসের মহাবীর ব'লে স্বীকার করেছেন আধুনিক ঐতিহাসিকরাও। সপ্তম শতাব্দীর আর্যাবর্ত গৌরবোজ্জ্বল হয়ে আছে একমাত্র তাঁরই নামের মহিমায়। তিনিই হচ্ছেন ভারতের শেষ হিন্দু-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। এই ব'লে তিনি নিজের নাম সই করতেন—মহারাজাধিরাজ শ্রীহর্ষ। ইতিহাস তাঁকে হর্ষবর্ধন ব'লে জানে।

ভারতে সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে হর্ষবর্ধন হচ্ছেন চতুর্থ স্থানীয়। ঐতিহাসিক ভারতে সর্বপ্রথম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গ্রীক-বিজয়ী চন্দ্রগুপ্ত (৩২৩ বা ৩২২ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে কিংবা তারও দুই-এক বৎসর আগে)। তাঁর সাম্রাজ্য মৌর্য-সাম্রাজ্য নামে বিখ্যাত। এই বিশাল সাম্রাজ্যের উপরে পূর্ণ গৌরবে প্রভুত্ব বিস্তার করেন যথাক্রমে তাঁর পুত্র ও পৌত্র বিন্দুসার ও অশোক। ২৩২ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে সম্রাট অশোকের মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মৌর্য-সাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হয়। তারপর অর্ধ শতাব্দী যেতে না যেতেই লুপ্ত হয়ে যায় মৌর্যরাজ্য।

মৌর্যদের কয়েক শতাব্দী পরে দ্বিতীয় ভারতীয় সাম্রাজ্য স্থাপন

করেছিলেন সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন ৩৩০ খৃষ্টাব্দে। দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে প্রায় সারা ভারতবর্ষ তিনি জয় করেছিলেন। এই দ্বিতীয় ভারত-সাম্রাজ্য ইতিহাসে গুপ্ত-সাম্রাজ্য নামে বিখ্যাত। সমুদ্রগুপ্তের আরো তিন জন প্রসিদ্ধ বংশধর হচ্ছেন সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (কালিদাসের কাব্যের বিক্রমাদিত্য), সম্রাট প্রথম কুমারগুপ্ত এবং সম্রাট স্কন্দগুপ্ত। শেষোক্ত সম্রাটের মৃত্যুর (৪৬৭ খৃঃ) পর গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হয় বটে, কিন্তু গুপ্ত-রাজারা আরো কিছুকাল পর্যন্ত সিংহাসন রক্ষা করতে পেরেছিলেন।

সম্রাট স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পরে ভারতের উপরে বিদেশী ও বর্বর হূণদের প্রাধান্য ক্রমেই বেড়ে উঠতে থাকে। হূণ রাজা মিহিরকুল শেষটা এমন অত্যাচার আরম্ভ করে যে, মালবের অধিপতি যশোধর্মদেব তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে বাধ্য হন। যশোধর্মদেবের আহ্বানে ভারতের আরো কয়েকজন রাজা এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। ৫২৮ খৃষ্টাব্দে মিহিরকুলের সঙ্গে যশোধর্মদেবের স্মরণীয় যুদ্ধ হয়। মিহিরকুল পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়।

এই যশোধর্মদেবই হচ্ছেন তৃতীয় ভারতীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর যে শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে তাতে স্পষ্ট ভাষায় লেখা আছে, তিনি পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে পশ্চিমে আরব সাগর পর্যন্ত এবং উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে ত্রিবাঙ্কুরের শেষ পর্যন্ত ভূভাগের অধিকারী ছিলেন। তাঁর আনুমানিক মৃত্যুকাল হচ্ছে ৫৫০ খৃষ্টাব্দ।

আশ্চর্য কথা হচ্ছে এই যে, এত বড় একজন দিগ্বিজয়ী সম্রাট সম্বন্ধে ইতিহাস আর বিশেষ কিছুই বলতে পারে না। কিংবা এ জন্যে বিস্মিত না হ'লেও চলে। কারণ, ইংরেজ ঐতিহাসিক যে সম্রাট সমুদ্রগুপ্তকে "ভারতীয় নেপোলিয়ন" উপাধি দিয়েছেন, এক শত বৎসর আগেও আমরা তাঁর নাম পর্যন্ত জানতুম না। দৈবগতিকে এলাহাবাদের অশোক-স্তম্ভের উপরে উৎকীর্ণ সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি হরিষেণের লিখিত এক শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে, তাই আজ আমরা তাঁর

অপূর্ব ও বিচিত্র কাহিনী জানতে পেরেছি। সুতরাং এমন আশা করলে অন্যায় হবে না যে, হয়তো অদূর-ভবিষ্যতে ঐ ভাবেই আমরা হঠাৎ একদিন সম্রাট যশোধর্মদেবেরও সম্পূর্ণ বা প্রায়-সম্পূর্ণ ইতিহাস সংগ্রহ করতে পারব।

ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র বৃহৎ নাম ছিল যশোধর্মদেবের। কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক বা সামাজিক অবস্থা কি-রকম ছিল, আজ পর্যন্ত তা আবিষ্কৃত হয়নি। বড় জোর এইটুকু বলা যায়, যশোধর্মদেবের মৃত্যুর পর উত্তর-ভারতে আর কোন একচ্ছত্র সম্রাট বিদ্যমান ছিলেন না। উত্তরাপথের ভিন্ন ভিন্ন দেশে রাজত্ব করতেন ভিন্ন ভিন্ন রাজারা এবং মিহিরকুল না থাকলেও উত্তর-পশ্চিম পাঞ্জাবের এখানে-ওখানে মাথা তোলবার চেষ্টা করত ছোট ছোট হূণ-রাজারা বা তাদের নিকট-সম্পর্কীয় গুর্জর-বংশীয় দলপতিরা।

উত্তর-ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে তখন (ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে) রাজত্ব করতেন যে-সব অপেক্ষাকৃত পরাক্রান্ত রাজা, তাঁদের মধ্যে প্রধানত এই তিনজনকে নিয়ে আমাদের কাহিনী আরম্ভ করব। থানেশ্বরের প্রভাকরবর্ধন। মালব দেশের গুপ্তবংশীয় রাজা দেবগুপ্ত। মগধ, গৌড় ও রাঢ়-দেশের গুপ্তবংশীয় রাজা শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত।

দ্বিতীয়

যুবরাজের যুদ্ধযাত্রা

কুরুক্ষেত্র।

এ নাম শুনলে আজও প্রত্যেক হিন্দুর ধমনীতে ধমনীতে চঞ্চল হয়ে ওঠে রক্তস্রোত। এ কেবল কুরু-পাণ্ডবের আত্মঘাতী যুদ্ধক্ষেত্র নয়,

এখানেই প্রথমে পার্থসারথিরূপে ভগবানের অবতার শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র মুখে আত্মপ্রকাশ করেছিল গীতার মহাবাণী। এখানে একদিকে যেমন ভীমার্জ্জুন, কর্ণ, ভীষ্ম ও দ্রোণ প্রভৃতি মহা মহা যোদ্ধারা অপূর্ব বীরত্ব দেখিয়ে অর্জন করেছিলেন অমরত্ব, আর একদিকে তেমনি নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল আর্য-ভারতের সমস্ত ক্ষাত্র-বীর্য। এই শতস্মৃতি-বিজড়িত ভূমির উপরে গিয়ে দাঁড়ালে আজও হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করা যায় শত মৃত পুত্রের শোকে কাতর গান্ধার-কন্যা গান্ধারীর করুণ ক্রন্দন, নিষ্ঠুর সপ্তরথীর দ্বারা আক্রান্ত বালক অভিমন্যুর নিষ্ফল সিংহ-নাদ, দুঃশাসনের রক্তপান ক'রে তৃতীয় পাণ্ডবের উন্মত্ত তাণ্ডব, রক্ত-বন্যায় ভাসতে ভাসতে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর ঊনচল্লিশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার ছয় শত সৈন্যের চরম মৃত্যুযন্ত্রণা! এই বিরাট নরমেধযজ্ঞের ফল কি? পাণ্ডবদের মৃত্যুর পরে আর্যাবর্তে এমন কোন ক্ষত্রিয় রইল না, বিদেশী যবনদের বাধা দেবার জন্যে সবল হস্তে যে অস্ত্রধারণ করতে পারে! তাই তারই কিছুকাল পরে উত্তর-ভারতের নাট্যশালার মধ্যে প্রবেশ করতে দেখি ইরাণী এবং গ্রীক দিগ্বিজয়ীদের।

ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কুরুক্ষেত্র বা স্থানেশ্বরের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন প্রভাকরবর্ধন। তখন গুপ্তসাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল বটে, কিন্তু গুপ্তবংশীয় ক্ষুদ্রতর রাজারা তখনও ভারতবর্ষের মধ্যে সব-চেয়ে সম্ভ্রান্ত ব'লে গণ্য হতেন। প্রভাকরবর্ধনের রাণী ছিলেন যশোমতী। তিনি গুপ্তবংশজাতা এবং সেই জন্যে তাঁর স্বামী নিজেকে ভাগ্যবান্ ব'লে মনে করতেন। তাঁদের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ রাজ্যবর্ধন এবং কনিষ্ঠ হর্ষবর্ধন। রাজশ্রী নামে তাঁদের এক কন্যার নাম ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে। তিনি ছিলেন কান্যকুব্জের অধিপতি গ্রহবর্মার সহধর্মিণী।

তখন ভারতের প্রত্যেক রাজাই ভাবতেন, বাহুবলে পররাজ্য অধিকার করাই হচ্ছে রাজার বা বীরের ধর্ম! যে রাজা নিজের রাজ্যের নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকতে চাইতেন, তাঁদের

যোগ্যতা সম্বন্ধে জনসাধারণ উচ্চ ধারণা পোষণ করত না। সত্য কথা বলতে কি, আজও পৃথিবী একটুও বদলায়নি। আজও পৃথিবীর যত যুদ্ধবিগ্রহের একমাত্র কারণ হচ্ছে পররাজ্য লোভ।

গুপ্তরাজকন্যা যশোমতীকে বিবাহ ক'রে প্রভাকরবর্ধনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ক্রমেই উচ্চতর হয়ে উঠছিল। উত্তরে পাঞ্জাবের কয়েকটি প্রদেশ করতলগত ক'রে, দক্ষিণে মধ্য-ভারতের মালব দেশ পর্যন্ত তিনি নিজের বিজয়-পতাকা বহন ক'রে নিয়ে গেলেন। মালবের গুপ্তবংশীয় রাজা খুব সম্ভব যুদ্ধক্ষেত্রেই জীবন বিসর্জন দিলেন। সেই বংশের দেবগুপ্তকে সামন্তরাজরূপে মালবের সিংহাসনে বসিয়ে প্রভাকরবর্ধন আবার স্থানেশ্বরে ফিরে এলেন। তখন ভারতে সম্রাট পদবীর চলন ছিল না। যাঁরা সাম্রাজ্যের অধিকারী হতেন তাঁরা গ্রহণ করতেন একরাট কিংবা মহারাজাধিরাজ পদবী। প্রভাকরবর্ধন মহারাজাধিরাজরূপে পরিচিত ছিলেন।

৬০৪ খৃষ্টাব্দ। খবর এল উত্তর-পশ্চিম পাঞ্জাবের দুর্ধর্ষ হূণরা আবার বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।

প্রভাকরবর্ধন যুবরাজকে ডেকে বললেন, "রাজ্যবর্ধন, আমি ক্রমেই বৃদ্ধ হয়ে পড়ছি। অদূর-ভবিষ্যতে তুমিই হবে মহারাজা। আমি বর্তমান থাকতেই তোমার উচিত, রাজকার্যে অভ্যস্ত হওয়া। বিজাতীয় হূণরা বিদ্রোহী হয়েছে, তুমি তাদের দমন করতে যেতে পারবে কি?"

তরুণ যুবক রাজ্যবর্ধন নতমস্তকে হাস্যমুখে বললেন, "ক্ষত্রিয় আমি, অস্ত্রধারণ করাই আমার কর্তব্য। মহারাজের আদেশ হ'লেই আমি যুদ্ধযাত্রা করতে পারি।"

প্রভাকরবর্ধন বললেন, "উত্তম, বৎস! এবারে হূণদের এমন শিক্ষা দিয়ে আসবে, ভবিষ্যতে তারা যেন আর মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। কিন্তু স্মরণ রেখো যুবরাজ, এই হূণরা সহজ-শত্রু নয়। তোমার জননীর পূর্বপুরুষরা এক সময়ে ছিলেন ভারতবর্ষের সম্রাট।

কিন্তু দুরাত্মা হূণদের দৌরাত্ম্যেই তাঁদের বিপুল সাম্রাজ্য আজ পরিণত হয়েছে অতীতের স্বপ্নে।"

রাজ্যবর্ধন বললেন, "স্মরণ রাখব মহারাজ।"

পনেরো বছরের ছোট রাজকুমার হর্ষবর্ধন, পিতার নয়নের মণি। তিনি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললেন, "পিতা, আমিও কি ক্ষত্রিয় নই? দাদা যাবেন যুদ্ধে, আর আমি ব'সে থাকব রাজপ্রাসাদে? কেন, আমার কি অস্ত্রশিক্ষা হয়নি।"

প্রভাকরবর্ধন তার মাথার উপরে সস্নেহে হস্তার্পণ ক'রে বললেন, "এখনো সময় হয়নি পুত্র! যথাসময়ে তুমিও যুদ্ধযাত্রা করবে বৈ কি।"

কিন্তু হর্ষবর্ধন বোঝ মানে না।

মহারাজা তখন বাধ্য হয়ে বললেন, "বেশ বাছা, তুমিও কিছু সৈন্য নিয়ে যুবরাজের পিছনে পিছনে যাও। যুদ্ধক্ষেত্রের অনতিদূরে পার্বত্য অরণ্যে তুমি মৃগয়ার অনেক সুযোগ পাবে। সেইখানে শিবির স্থাপন কোরো। দরকার হ'লে যুবরাজ তোমাকে আহ্বান করবেন।"

এ ব্যবস্থা মন্দের ভালো। হর্ষবর্ধন আর কিছু বললেন না।

তৃতীয়

হরিষে বিষাদ

নীলাকাশের অনেকখানি আচ্ছন্ন ক'রে দাঁড়িয়ে আছে পর্বতের পর পর্বত, নীল মেঘমালার মত। তাদের শিখরগুলো বিপুল শূন্য ভেদ ক'রে উঠে গিয়েছে উপর দিকে, তারা যেন কোন দুর্গম দানব-লোকের কোলে পাথরে গড়া সারি সারি পূজা-দেউল। সেই পার্বত্য রাজ্যের নিচের দিকটা আচ্ছন্ন ক'রে আছে, বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত এক গহন অরণ্যের লতাগুল্মতরুর নিবিড় শ্যামলতা।

সেখানে বনস্পতিদের মাথার উপরে রবিকররেখার সোনার ঝালর দেখে ভেঙে গিয়েছে গানের পাখীদের রাতের ঘুম; উত্তপ্ত জীবনের আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে তারা প্রেরণ করছে আকাশে বাতাসে পৃথিবীর দিকে দিকে গীতিময়ী প্রীতির বাণী।

কিন্তু কলকণ্ঠ বিহঙ্গদের স্তম্ভিত ও স্তব্ধ ক'রে আচম্বিতে অদূরে জেগে উঠল বৃহৎ এক জনতার উত্তেজিত কোলাহল। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল হস্তীর বৃংহিত, ধাবমান অশ্বদলের দ্রুত পদধ্বনি।

চঞ্চল হ'য়ে উঠল অরণ্যের অমানুষ বাসিন্দারা। এসব বিপদজনক ধ্বনি তাদের কাছে অপরিচিত নয়। কোন্ অন্তরালে একটি মৃত মৃগের দেহ নিয়ে ব'সে চিত্রবিচিত্র ব্যাঘ্র নিশ্চিন্ত প্রাতরাশের আয়োজন করছিল; কোন্ ঝোপের আড়ালে শুয়ে শুয়ে মাটির উপরে লাঙ্গুল আছড়ে বাঘিনী আহ্বান করছিল তার শাবকদের খেলা করবার জন্যে। সারা রাত বনে বনে ঘুরে ভল্লুক ও ভল্লুকী ক্লান্ত দেহে গিরিগুহায় ফিরে দিবানিদ্রার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল; অন্ধকারের বিভীষিকা দূর হয়েছে দেখে হরিণ-হরিণীরা সাহস সঞ্চয় ক'রে দলে দলে বেরিয়ে এসেছিল নতুন রোদে চিকণ শিশিরস্নাত তৃণভূমির উপরে। সমবেত মানুষদের ভয়াল সাড়া পেয়ে তারা সবাই আতঙ্কে শিউরে উঠে যে যেদিকে পারল স'রে পড়ল। বনতল শব্দিত ও কম্পিত ক'রে একসঙ্গে মিলে-মিশে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল বাঘ, ভাল্লুক, বরাহ, বয়ার, নেকড়ে, হরিণ ও শশকরা। উপরেও গাছের শাখা ছেড়ে আকাশের আশ্রয় নিলে সারস, বক, হাঁস, ময়ূর ও আরো নানা জাতের পাখীরা। বানররা আরো উঁচু ডালের উপরে উঠে ঘনপত্রের আড়ালে আত্মগোপন ক'রে কিচির-মিচির শব্দে চারি দিকে রটিয়ে দিতে লাগল একই আসন্ন বিপদের সংবাদ। বনবাসী এই সব জীব কেউ কারো বন্ধু নয় বটে, কিন্তু তারা সব চেয়ে ভয়ানক শত্রু ব'লে মনে করে মানুষদের। বাঘ জীবহিংসা করে কেবল নিজের প্রাণরক্ষার জন্যে, কিন্তু মানুষ হত্যা করে অকারণ আনন্দেই। হরিণরা বনে থেকে

বাঘের খোরাক হ'তেও রাজি, তবু মানুষের কাছে লোকালয়ে আসতে প্রস্তুত নয়।

বনে আজ শিকার করতে বেরিয়েছেন স্থানেশ্বরের রাজকুমার হর্ষবর্ধন। সঙ্গে আছে তাঁর বয়স্যরা এবং সৈন্যগণ।

দীর্ঘদংষ্ট্রা বিপুলবপু এক বরাহ—দুই চক্ষে তার ক্রোধের অগ্নি, নাসারন্ধ্রে ঝড়ের ঝাপটা, চার পায়ে বিদ্যুতের গতি! পেছনে পেছনে ধেয়ে আসছে এক তেজী ঘোড়া, পৃষ্ঠে আসীন তরুণ হর্ষবর্ধন, দক্ষিণ হস্তে তাঁর উদ্যত বর্শাদণ্ড।

হঠাৎ অরণ্যপথে দেখা দিলে আর এক অশ্বারোহী, দূর থেকেই সে চীৎকার ক'রে বললে, "রাজকুমার, রাজকুমার। ক্ষান্ত হোন—অশ্বরশ্মি সংযত করুন।"

রাশ টেনে ধরতেই হর্ষবর্ধনের ঘোড়া দাঁড়িয়ে পড়ল এবং সেই অবসরে এক লাফ মেরে পাশের ঝোপের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল বরাহটা।

অনতিবিলম্বে অশ্বারোহী কাছে এসে পড়ল।

হর্ষবর্ধন বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বললেন, "এমন অসময়ে এসে আমাকে বাধা দিলে, কে তুমি?"

অশ্বারোহী মাটির উপরে নেমে প'ড়ে নতমস্তকে অভিবাদন ক'রে বললে, "রাজকুমার, আমি মহারাজাধিরাজ প্রভাকরবর্ধনের বার্তাবাহ।"

—"কি বার্তা তুমি এনেছ?"

—"মহারাজা মৃত্যুশয্যায় শায়িত?"

হর্ষবর্ধন সচমকে বললেন, "সেকি, আমি যে পিতাকে সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় দেখে এসেছি।"

বার্তাবাহ বললে, "জীবন হচ্ছে স্রোতের ফুলের মত—এই আছে এই নেই। মহারাজা মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আপনাকে স্মরণ করেছেন। অবিলম্বে রাজধানীতে ফিরে না গেলে আপনি তাঁকে জীবন্ত দেখতে পাবেন না।"

চতুর্থ

আবার দুঃসংবাদ

সপ্তাহ কাল পরে হর্ষবর্ধন যখন অশ্রুভারাক্রান্ত চক্ষে পিতার রোগশয্যার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন, মহারাজা প্রভাকরবর্ধনের সংজ্ঞা তখন লোপ পেয়েছে।

বিপদের উপরে বিপদ। মহারাণী যশোমতী প্রতিজ্ঞা করেছেন, স্বামীহারা পৃথিবীতে তিনি এক মুহূর্ত বাস করতে রাজি নন, প্রভাকর-বর্ধনের আগেই দেহত্যাগ করবেন জ্বলন্ত চিতায়।

হর্ষবর্ধন মায়ের পায়ের তলায় আছড়ে প'ড়ে আকুল কণ্ঠে ব'লে উঠলেন, "মা, মা। আমি কি একসঙ্গে মাতৃপিতৃহারা হব?"

যশোমতী বললেন, "বাছা, স্নেহের মোহে আমাকে অভিভূত করবার চেষ্টা কোরো না। সন্তানকে ইহলোকে রেখে পিতামাতা পরলোকে গমন করবেন, এই হচ্ছে ভগবানের নিয়ম! কিন্তু তার পরও পিতামাতা জীবিত থাকেন সন্তানের মধ্যেই। সুতরাং আমাদের অভাব তোমাকে অনুভব করতে হবে না। ধার্মিক হও, বীর্যবান হও, আর্যাবর্তের গৌরব হও,—তোমার প্রতি এই আমার শেষ আশীর্বাদ।"

প্রধান মন্ত্রী এসে বললেন, "মহারাণি, মহারাজের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, আজকের রাত কাটে কি না সন্দেহ! এখন আমাদের কর্তব্য কি? যুবরাজ সুদূর রণস্থলে, কিন্তু রাজসিংহাসন তো এক মুহূর্ত শূন্য থাকতে পারে না। তবে কি আমরা ছোট রাজকুমারকেই সিংহাসনের অধিকারী ব'লে মনে করব?"

যশোমতী শান্ত স্বরে বললেন, "মন্ত্রিবর, জ্যেষ্ঠ আর কনিষ্ঠ, জননীর কাছে সব পুত্রই সমান। যাকে যোগ্য মনে করেন, তাকেই

আপনারা সিংহাসনের উপরে স্থাপন করতে পারেন। আমি এখন পরলোকের যাত্রী, ঐহিক বিষয় নিয়ে আর কেন আমার সঙ্গে পরামর্শ

করতে এসেছেন ? আমার চোখের সামনে এখন জাগছে কেবল স্বামি-দেবতার পবিত্র পাদপদ্ম, তাই দেখতে দেখতে এইবারে আমি অগ্নি-শয্যায় শয়ন করব" বলতে বলতে তিনি সেখান থেকে প্রস্থান করলেন দ্রুতপদে।

প্রধান মন্ত্রী দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বললেন, "তাই তো, মহারাজা এখন হতবাক্, মহারাণীও আমাদের কোন স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে গেলেন না। আমাদের কর্তব্য কি, কিছুই বুঝতে পারছি না।"

হর্ষবর্ধন বললেন, "আপনাদের কর্তব্য তো খুব স্পষ্ট।"

মন্ত্রী সবিস্ময়ে বললেন, "কি রকম ?"

"পিতৃদেবের মৃত্যু সুনিশ্চিত। এখন আপনাদের কর্তব্য হ'ল যুবরাজের জন্যে অপেক্ষা করা।"

"রাজকুমার, আপনি বালক, তাই এমন কথা বলতে পারলেন। শূন্য সিংহাসন যে কত বিপদের আধার, সে জ্ঞান এখনো আপনার হয়নি। কার জন্যে আমরা অপেক্ষা করব ? যুবরাজ ! তিনি গিয়েছেন ভয়াবহ হূণদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। যুদ্ধে তিনি যদি বার বার পরাজিত হন তাহলেও ততটা চিন্তার কারণ নেই, কারণ এর পরেও শত্রুদের দ্বিতীয় বার বাধা দেবার সুযোগ হ'তে পারে। কিন্তু ভগবান না করুন, যুদ্ধে যদি যুবরাজের মৃত্যু হয়, তাহলে এই বিশাল সাম্রাজ্যকে রক্ষা করবে কে ?"

হর্ষবর্ধন পূর্ণকণ্ঠে বললেন, "রক্ষা করব আমি। দাদার অবর্তমানে আমি আছি। কিন্তু মন্ত্রীমহাশয়, এটুকু ভালো ক'রেই জেনে রাখবেন, যুবরাজ বর্তমান থাকতে কোন দিনই আমার মনে ঠাঁই পাবে না তুচ্ছ রাজ্যলোভ।"

হর্ষবর্ধনের কচি মুখে এখনো দেখা যায়নি গোঁফের রেখা ! সেই শিশুর মতন সরল মুখের পানে তাকিয়ে প্রবীণ মন্ত্রী মনের ভিতর থেকে একটুও জোর পেলেন না। মনে মনে বললেন, "তোমার মুখ দেখলে এখনো তোমাকে নারী ব'লেই সন্দেহ হয়। হূণ যুদ্ধে যুবরাজের পতন হ'লে তুমিই রাজ্য রক্ষা করবে বটে।"

হর্ষবর্ধন দাঁড়িয়েছিলেন প্রাসাদের এক বাতায়নের সামনে। বাইরের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তিনি ব'লে উঠলেন, "দেখুন মন্ত্রীমশাই, দেখুন দেখুন।"

—"কি রাজকুমার!"

—"এক অশ্বারোহী সৈনিক বায়ুবেগে অশ্বচালনা ক'রে প্রাসাদের সিংহদ্বারে এসে নামল। নিশ্চয় যুদ্ধক্ষেত্রের কোন বার্তা এসেছে।"

পরক্ষণেই শোনা গেল ঘন ঘন ভেরী, দামামা ও বহু কণ্ঠের উচ্চ জয়ধ্বনি।

মন্ত্রী উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, "তাহ'লে কি যুবরাজ হূণ যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন?"

হর্ষবর্ধন বললেন, "নিশ্চয়। বর্বর হূণদের সাধ্য কি আমার দাদাকে পরাজিত করবে।"

প্রাসাদের প্রধান প্রহরী বেগে ছুটে এসে খবর দিল, "রণক্ষেত্র থেকে অগ্রদূত সংবাদ বহন করে এসেছে, মহাবীর রাজ্যবর্ধনের প্রবল প্রতাপের সামনে দুর্বৃত্ত হূণ-দস্যুদল ঝটিকাতাড়িত তৃণদলের মত নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে! অসংখ্য হূণ-বন্দী নিয়ে যুবরাজ রাজধানীর দিকে আগমন করছেন।"

চারিদিকে শোক-দুঃখের সঙ্গে আনন্দের বিচিত্র সম্মিলন। মহা-সতী মহারাণী যশোমতীর চিতাগ্নিশিখা ম্লান হ'তে না হ'তেই মহা-রাজাধিরাজ প্রভাকরবর্ধনের অন্তিম নিশ্বাস মিলিয়ে গেল অনন্তের অতলে। এবং ক্রন্দন-মুখরিত রাজপুরীর মধ্যে যখন প্রবেশ করলেন নতশিরে সাশ্রুনেত্রে যুবরাজ রাজ্যবর্ধন, তখন তার মুখে দেখা গেল না যুদ্ধজয়ের কোন আনন্দেরই নিদর্শন।

রাজ্যবর্ধনও তরুণ যুবক, হর্ষবর্ধনের চেয়ে মাত্র চার বৎসরের বড়। যথাসময়ে তিনি পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করলেন বটে, কিন্তু ভাগ্য তাঁর প্রতি সুপ্রসন্ন হ'ল না। তিনি ভালো ক'রে সিংহাসনে বসতে না বসতেই পাওয়া যেতে লাগল দুঃসংবাদের পর দুঃসংবাদ।

প্রথমেই শোনা গেল, মালব দেশের গুপ্তবংশীয় রাজা দেবগুপ্ত বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন।

রাজ্যবর্ধন মন্ত্রণা-সভা আহ্বান করলেন।

কিন্তু মন্ত্রণা-সভার কর্তব্য স্থির হ'তে না হ'তেই পাওয়া গেল চরম দুঃসংবাদ।

মালবরাজ দেবগুপ্ত কান্যকুব্‌জ আক্রমণ করেছেন। সেখানকার রাজা এবং রাজ্যবর্ধনের সহোদরা রাজশ্রী দেবীর স্বামী গ্রহবর্মা যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হয়েছেন। রাজশ্রীও বন্দিনী, "সাধারণ দস্যুর স্ত্রীর মত তাঁর দুই চরণে পরিয়ে দেওয়া হয়েছে লৌহশৃঙ্খল।"

কেবল তাই নয়, মগধ-গৌড়-রাঢ় দেশের গুপ্তবংশীয় মহারাজা শশাঙ্ক-নরেন্দ্রগুপ্ত মালবপতির সঙ্গে যোগ দেবার জন্যে সসৈন্যে এগিয়ে আসছেন দ্রুতবেগে।

দারুণ ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে রাজ্যবর্ধন বললেন, "কি, আমার নিরপরাধ ভগিনীর অপমান। আমি এখনি যুদ্ধযাত্রা করব।"

মন্ত্রিগণ ও সেনাপতি জানালেন, "মহারাজ, আমাদের সমগ্র বাহিনী এখনো প্রস্তুত হবার সময় পায়নি।"

রাজ্যবর্ধন অধীর কণ্ঠে বললেন, "চাই না তোমাদের সমগ্র বাহিনী! আমার সঙ্গে চলুক কেবল দশ হাজার অশ্বারোহী! দুরাচার দেবগুপ্তের মত তুচ্ছ পতঙ্গের পক্ষচ্ছেদ করতে সেই সৈন্যই যথেষ্ট। স্থানেশ্বরের রাজকন্যা বিধবা, আমার সহোদরা বন্দিনী, আমি কি আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করতে পারি?"

পঞ্চম

বাংলার রাজা শশাঙ্ক

মধ্য ও পশ্চিম ভারত মহারাজাধিরাজ প্রভাকরবর্ধনের অধিকার-ভুক্ত ছিল বটে, কিন্তু উত্তর-পূর্ব ভারতেও প্রায় তাঁর মতনই ক্ষমতাশালী আর এক নরপতি ছিলেন, তাঁর নাম শশাঙ্ক-নরেন্দ্রগুপ্ত। উত্তর-পূর্ব ভারতের মগধ, গৌড় ও রাঢ়দেশ শশাঙ্কের অধীনতা স্বীকার করেছিল; এমন কি, দক্ষিণ উড়িষ্যার কোঙ্গোদমণ্ডলের মাধববর্মাও ছিলেন তাঁর সামন্ত রাজা।

মহারাজা শশাঙ্কের মনে ছিল অত্যন্ত উর্চ্চাকাঙ্ক্ষা। যে পরাক্রান্ত গুপ্ত-সম্রাটরা এক সময়ে সসাগরা ভারতভূমির শাসনদণ্ড দৃঢ় হস্তে পরিচালনা করতেন এবং যাঁদের রাজত্বকালে ভারতবর্ষ জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ললিতকলা এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেছিল, সেই সম্ভ্রান্ত বংশেই তাঁর জন্ম। গুপ্ত-বংশের এক কন্যা মহাসেনগুপ্তাকে জননীরূপে পেয়ে স্থানেশ্বরের প্রভাকরবর্ধন নিজেকে যার-পর-নাই ভাগ্যবান ব'লে মনে করতেন। সুতরাং সেই রাজবংশেরই মুকুটধারী পুত্র হয়ে শশাঙ্কের মনে যে বিশেষ উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হবে, এ জন্যে বিস্মিত হবার দরকার নেই।

শশাঙ্কের প্রবল ইচ্ছা ছিল যে, আবার তিনি ফিরিয়ে আনবেন গুপ্তবংশের পূর্বগৌরব। এই ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে তিনি জয় করতে লাগলেন রাজ্যের পর রাজ্য। কেবল মগধ, রাঢ় ও গৌড় বঙ্গের অধীশ্বর হয়েই তিনি পরিতুষ্ট হ'তে পারলেন না। তিনি দেখলেন, কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মা কর্ণসুবর্ণ (এখন রাঙামাটি নামে খ্যাত। এ স্থানটি মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের দক্ষিণে আছে) নগর পর্যন্ত আক্রমণ ও

অধিকার করতে সাহসী হয়েছেন। তিনিও তখন কামরূপ-রাজকে আক্রমণ ও পরাজিত না ক'রে নিশ্চিন্ত হ'তে পারলেন না।

এমন সময়ে গুপ্তবংশীয় আর এক রাজা, মালবের দেবগুপ্তের কাছ থেকে এল এক আমন্ত্রণ-লিপি।

দেবগুপ্ত লিখেছেন :

"মহারাজা শশাঙ্ক-নরেন্দ্রগুপ্ত

একই পবিত্র বংশে আমাদের জন্ম। আমাদের দু'জনেরই দেহের ভিতরে আছে একই পূর্বপুরুষের রক্ত। সেই রক্তের দোহাই দিয়ে আমি আপনার সাহায্য প্রার্থনা করছি।

গুপ্তবংশের সন্তান আমি, এত দিন বাধ্য হয়েই স্থানেশ্বরের প্রভাকরবর্ধনের প্রাধান্য স্বীকার করেছিলুম। কিন্তু এত দিন পর ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন। প্রভাকরবর্ধন আর ইহলোকে বিদ্যমান নেই। তাঁর দুই পুত্র অপ্রাপ্তবয়স্ক। তাই আমি বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রেই ক্ষান্ত হইনি, প্রভাকরবর্ধনের জামাতা কান্যকুব্জের মুখর বংশীয় রাজা গ্রহবর্মাকেও যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করেছি এবং তাঁর সহধর্মিণী রাজশ্রীও এখন আমার হস্তে বন্দিনী।

কিন্তু আমার লোকবল আপনার মত প্রবল নয়। গুপ্তচরের মুখে সংবাদ পেলুম, স্থানেশ্বরের নতুন রাজা রাজ্যবর্ধন আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছেন। আমার এই দুঃসময়ে আপনি যদি আমাকে সাহায্য করতে আসেন, তা'হলে কেবল যে আমি একাই উপকৃত হব তা নয়, আমরা দুইজনে মিলে হয়তো আমাদের পূর্বপুরুষদের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করতেও পারব। মহাশয়ের অভিমত অবিলম্বে জানতে পারলে বাধিত হব। ইতি"

মধ্য ও পশ্চিম-ভারত পর্যন্ত নিজের অধিকার বিস্তৃত করবার এমন সুযোগ শশাঙ্ক ছাড়তে পারলেন না। তিনি উত্তরে লিখলেন।

"মহারাজা দেবগুপ্ত,

আপনার সাহায্যের জন্যে আমি যত শীঘ্র সম্ভব যাত্রা করব।

কিন্তু বিনা অপরাধে আপনি রাজশ্রীদেবীকে বন্দিনী করেছেন কেন? এ যে গুপ্তবংশের পক্ষে কলঙ্কের কথা। গুপ্তবংশের কেউ কোন দিন নারীর বিরুদ্ধে হাত তোলেননি। অতএব অবিলম্বে রাজশ্রীদেবীকে মুক্তিদান করলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হব। ইতি"

কালবিলম্ব না ক'রে মহাসমারোহে শশাঙ্ক সৈন্যসজ্জা আরম্ভ করলেন। নির্বোধরা এবং শত্রুরা আজ অপবাদ দেয়, বাঙালী সামরিক জাতি নয়, বাঙালী অস্ত্রধারণ করতে জানে না। কিন্তু আগে—এমন কি খৃষ্টপূর্ব যুগেও বাঙালীদের কেউ কাপুরুষ বলতে ভরসা করত না। সাধারণত মগধ ও বঙ্গ বলতে সবাই তখন এক দেশই বুঝত। কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, মগধ ও বঙ্গের সিংহাসনে বিরাজ করছেন একই রাজা।

ইতিহাস-পূর্ব যুগেও দেখা যায়, মধ্য-এশিয়া থেকে আগত বিদেশী আর্য জাতি উত্তরাপথের অধিকাংশ অধিকার ক'রেও মগধ ও বঙ্গের স্বাধীনতা হরণ করতে পারেননি। বিখ্যাত গ্রন্থ "শতপথ ব্রাহ্মণ" রচনাকালেও মগধ ও বঙ্গ বাহুবলে আপন স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। মহাভারত ও রামায়ণেও বাঙালী রাজাদের নাম আছে। স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দেখিয়েছেন: "বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্বে বাঙালীরা জলে ও স্থলে এত প্রবল হইয়াছিল যে, বঙ্গরাজের একটি ত্যজ্যপুত্র সাত শত লোক লইয়া নৌকাযোগে লঙ্কাদ্বীপ দখল করিয়াছিলেন। * * * প্রাচীন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বড় বড় খাঁটি আর্যরাজগণ, এমন কি যাঁহারা ভারতবংশীয় বলিয়া আপনাদের গৌরব করিতেন, তাঁহারাও বিবাহ-সূত্রে বঙ্গেশ্বরের সহিত মিলিত হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন।"

মগধ ও বঙ্গের শূদ্র অধিপতি মহাপদ্মনন্দই হচ্ছেন আর্যাবর্তের সর্বপ্রথম সম্রাট বা "একরাট"। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে দিগ্বিজয়ী সম্রাট আলেকজাণ্ডার যখন ভারতের পঞ্চনদ প্রদেশ অধিকার করেন, তখন বহু বিজ্ঞাপিত আর্যবীরগণ প্রাণপণেও তাঁর অগ্রগতি রুদ্ধ করতে

পারেননি। সে-সময়ে আর্যাবর্তের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট বাস করতেন মগধ-বঙ্গের যুক্ত সাম্রাজ্যে। তাঁকে জয় না করলে ভারতবর্ষ জয় করা হয় না। অতএব আলেকজাণ্ডার মগধ-বঙ্গকে আক্রমণ করতে অগ্রসরও হয়েছিলেন কিন্তু গ্রীক ঐতিহাসিকেরই বর্ণনায় দেখি, মগধ-বঙ্গের শূদ্র রাজার মহাশক্তির কথা শুনে আলেকজাণ্ডার ভয় পেয়ে সমগ্র আর্যাবর্ত জয় করবার দুরাশায় জলাঞ্জলি দিয়ে পশ্চাৎপদ না হয়ে পারেননি।

মহারাজা শশাঙ্কের পরলোক গমনের অনেক পরেও দেখি, বাঙালীর বাহুবল অধিকতর প্রবল হ'য়ে উঠেছে। অষ্টম শতাব্দীতে গৌড়-বঙ্গের অধীশ্বর ধর্মপাল উত্তরে দিল্লী ও জলন্ধর পর্যন্ত এবং দক্ষিণে বিন্ধ্য গিরিশ্রেণী পর্যন্ত নিজের সাম্রাজ্য বিস্তৃত করেছিলেন। উপরন্তু বাঙালী সৈন্যদল জয়যাত্রায় বেরিয়ে রাজপুতানার কতক অংশ (ভোজদেশ ও মৎস্যদেশ), পাঞ্জাব (কুরু ও যদু), গান্ধার ও যবন, কীর (কাঙ্গড়া) ও অবন্তী (উজ্জয়িনী) প্রভৃতি দেশের রাজাদের অনায়াসে পরাজিত করেছিল।

পৃথিবীর ইতিহাসে বারংবার দেখা গিয়েছে, প্রত্যেক দেশেই উন্নতি ও অবনতির এক একটা যুগ আসে। কোথায় আজ প্রাচীন মিশর, পারস্য, গ্রীক, রোমীয়, তাতার ও আরব সাম্রাজ্য? এক জাতি ওঠে এবং এক জাতি পড়ে।

বাঙালীর ক্ষাত্রবীর্য দুর্বল হয়ে পড়েছিল মুসলমান অধিকারের যুগেই। কিন্তু বাঙালী কোনদিনই নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করতে রাজি হয়নি। মুসলমানরা যখন ভারতে অত্যন্ত প্রবল, তখনও স্বদেশের স্বাধীনতা-যজ্ঞে ইন্ধনের মতন আপন আপন জীবন বিলিয়ে দিয়েছিলেন বাংলার প্রতাপ, সীতারাম, চাঁদ রায় ও কেদার রায় প্রভৃতি। তবু দুষ্ট রসনায় শুনি মিথ্যা কথা—বাঙালী ভীরু, বাঙালী যোদ্ধা নয়। একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস।

বার বার প'ড়েও চীন আবার দাঁড়িয়ে উঠছে। বাঙালীও প'ড়ে মরবে না, আবার মাথা তুলে দাঁড়াবে।

অতঃপর আমাদের কাহিনীর সূত্র ধরা যাক্। মহারাজা শশাঙ্কের সৈন্যসজ্জা সমাপ্ত হ'ল। বিপুল এক বাহিনী নিয়ে তিনি মালবরাজ দেবগুপ্তকে সাহায্য করবার জন্য অগ্রসর হলেন। তাঁর মনে আনন্দের সীমা নেই। এত দিন পরে তিনি লাভ করেছেন দ্বিগ্বিজয়ে যাত্রা করবার যথার্থ সুযোগ। তাঁরও বুকের ভিতরে আজ যেন আবার জাগ্রত হয়েছে ভারতবিজয়ী সমুদ্রগুপ্তের অমর আত্মা।

দেবগুপ্ত আছেন কান্যকুব্জে। মগধ-বঙ্গ থেকে বহু—বহু দূরে। সেকালের কোন সৈন্যদলই একালের মত দ্রুতবেগে যুদ্ধযাত্রা করত না বা করতে পারত না। অশ্ব ও হস্তী অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে পথ পার হ'তে পারে বটে, কিন্তু কোন বাহিনীই তো কেবল অশ্বারোহী, গজারোহী বা রথারোহী সৈন্য নিয়ে গঠিত নয়, সঙ্গে সঙ্গে থাকে অসংখ্য পদাতিকও এবং তাদেরও পিছনে ফেলে রেখে অগ্রসর হওয়া চলে না। তার উপরে সেকালের পথ-ঘাটের অবস্থাও ভালো ছিল না। কাজে-কাজেই যদিও শশাঙ্কের মন যাচ্ছিল বাতাসের আগে আগে, তবু তাঁর এবং সৈন্যদের দেহের গতি হ'ল মন্থর।

অবশেষে শশাঙ্ক সদলবলে এসে উপস্থিত হলেন কান্যকুব্জের অনতিদূরে।

সেইখানে গুপ্তচরের মুখে শোনা গেল চরম এক দুঃসংবাদ!

যাঁকে সাহায্য করবার জন্য শশাঙ্ক নদ-নদী, পর্বত, কান্তার ও প্রান্তর অতিক্রম ক'রে স্বরাজ্য ছেড়ে এত দূরে এসে পড়েছেন, সেই মালবরাজ দেবগুপ্ত ইতিমধ্যেই স্থানেশ্বররাজ রাজ্যবর্ধনের দ্বারা আক্রান্ত, পরাজিত ও নিহত হয়েছেন!

শশাঙ্কের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পেলে আঘাত। কিন্তু তিনি অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন, এখন আর প্রত্যাগমন করা চলে না। তাহলে দেশব্যাপী নিন্দুকের জিহ্বা তাঁকে 'কাপুরুষ' বলে অখ্যাতি রটনা করবে। তার উপরে এখনো তাঁর প্রতিশোধ নেওয়া হয়নি। দেবগুপ্ত আর তিনি একই বংশজাত। রাজ্যবর্ধন তাঁর আত্মীয় ও বন্ধুকে

হত্যা করেছেন, তাঁকে শাস্তি না দিয়ে তিনি এ স্থান ত্যাগ করবেন না।

গুপ্তচরের দিকে ফিরে শশাঙ্ক শুধোলেন, 'প্রভাকরবর্ধনের কন্যা রাজশ্রী কোথায়?'

—'মহারাজা দেবগুপ্ত তাঁকে মুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু তার পর তিনি যে কোথায় গিয়েছেন, কেউ তা জানে না।'

—'দুর্বল নারীর প্রতি সবল পুরুষের অত্যাচার হচ্ছে মহাপাপ। হতভাগ্য দেবগুপ্তকে হয়তো সেই পাপের জন্যেই নিজের প্রাণ দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে। চর, তুমি আর কোন সংবাদ জানো?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ! কিন্তু তাও সুসংবাদ নয়।'

—'কি রকম?'

—'স্থানেশ্বরের মহারাজা রাজ্যবর্ধন আপনার আগমন-সংবাদ পেয়েছেন।'

—'এটা খুবই স্বাভাবিক। তার পর?'

—'তিনি আপনাকে আক্রমণ করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন।'

—'তাঁর সৈন্যসংখ্যা জানো?'

—'জানি। তিনি দশ হাজার অশ্বারোহী নিয়ে কান্যকুব্জ আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু এখন তাঁর সৈন্যসংখ্যা আরো কম। কারণ, মহারাজা দেবগুপ্তের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর প্রায় তিন হাজার সৈন্য হতাহত হয়েছে।'

শশাঙ্ক নীরবে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। তার পর বললেন, 'চর, তুমি মূল্যবান সংবাদ এনেছ। তোমাকে পুরস্কৃত করব। এখন যাও।'

গুপ্তচর অভিবাদন ক'রে বিদায় নিলে।

শশাঙ্ক সহাস্যে মনে মনে বললেন, 'আমার এক লক্ষ সৈন্যের বিরুদ্ধে রাজ্যবর্ধনের সাত হাজার সৈন্য। যুদ্ধে আমার জয় অনিবার্য।'

ষষ্ঠ

বাঙালী পাখী

শশাঙ্ক স্থির করলেন, রাজ্যবর্ধনকেই আগে আক্রমণ করবার সুযোগ দিবেন।

রাজ্যবর্ধন তরুণ যুবক, তাঁর প্রকৃতিও নিশ্চয় উগ্র; নইলে শশাঙ্কের বিপুল সৈন্যবল সম্বন্ধে কোন সন্ধান না নিয়েই মাত্র সাত হাজার সৈনিকের সঙ্গে এমনভাবে অগ্রসর হতে সাহস করতেন না।

শশাঙ্ক মৃদু হাস্য ক'রে সেনাপতিকে ডেকে বললেন, 'আমার কি মনে হচ্ছে জানেন? উত্তর-পশ্চিম ভারতের লোকেরা উত্তর-পূর্ব ভারতের লোকদের বরাবরই তুচ্ছ ব'লে জ্ঞান করেন। মগধ আর বঙ্গের বাসিন্দারা তাই তাঁদের মতে নগণ্য 'পক্ষী' মাত্র। রাজ্যবর্ধন বোধ হয় ভেবেছেন, তাঁর সাত হাজার যোদ্ধাকে দেখলেই আমার এক লাখ সৈন্য ভীরু পাখীর পালের মতই উড়ে পালিয়ে যাবে।'

সেনাপতি বললেন, 'চমৎকার যুক্তি বটে।'

শশাঙ্ক বললেন, 'অতিরিক্ত সৌভাগ্য মানুষের সুবুদ্ধি হরণ করে। উত্তর-ভারতের লোকেরা আমাদের কেবল 'অনার্য' ব'লে ডেকেই তুষ্ট নয়। তারা বলে কি না, মগধ আর বঙ্গদেশে পদার্পণ করলেও তাদের পাতিত্য দোষ জন্মাবে, তাদের আবার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। অহমিকা এর উর্ধে আর উঠতে পারে না। অতিদর্পে লঙ্কা আর অতি মানে কৌরবদের পতন হয়েছিল। আজকেও আবার তারই পুনরাভিনয় হবে। সেনাপতি মহাশয়, আপনি অর্ধচন্দ্র-ব্যূহ রচনা ক'রে শত্রুদের জন্যে অপেক্ষা করুন। ব্যূহের দক্ষিণ আর বাম বাহুতে স্থাপন করুন রথারোহী সৈন্যদের। শত্রুরা যখন ব্যূহের মধ্যভাগ আক্রমণ করবে, তখন আপনার কর্তব্য কি জানেন?'

হাস্যমুখে সেনাপতি বললেন, 'আপনাকে আর কিছু বলতে হবে না মহারাজ। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আজ যুদ্ধের নামে হবে প্রকাণ্ড একটা ছেলেখেলা।'

দুই ভুরু কুঞ্চিত ক'রে শশাঙ্ক বললেন, 'পতঙ্গ যখন অগ্নিতে আত্মাহুতি দেয় তখন অগ্নিকে কেউ তার জন্যে দায়ী করে না। স্বরাজ্য ছেড়ে এত দূরে আমি ছেলেখেলা করতে আসিনি, কিন্তু শত্রুরা যদি ছেলেখেলা করে তাহ'লে আমার কি দোষ?'

সেনাপতি বললেন, 'যুদ্ধে যে আমাদের জয় হবে সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। তারপর রাজ্যবর্ধনকে নিয়ে আমরা কি করব?'

শশাঙ্ক চিন্তিত মুখে কিছুক্ষণ মৌন থেকে বললেন, 'সেনাপতি মহাশয়, রাজনীতি বড় নির্মম, কারণ রাজনীতি বড় স্বার্থপর, আমাদের প্রধান পূর্বপুরুষ সমুদ্রগুপ্ত দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে অধিকাংশ প্রতিদ্বন্দ্বী রাজাকেই 'সমুলে উৎপাটন না ক'রে ক্ষান্ত হননি।'

সেনাপতি কিঞ্চিৎ ইতস্তত ক'রে বললেন, 'কিন্তু মহারাজ রাজ্যবর্ধনকে বালক বললেও চলে।'

—'সিংহশিশু অবহেলার যোগ্য নয়। আর একটা কথা ভুলবেন না। আমার রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশে আছে রাজ্যবর্ধনের রাজ্য শুনেছি, সে ধার্মিক ব'লে প্রজারা তাকে ভালোবাসে। রাজনীতি বলে যে, সীমান্ত প্রদেশের রাজা ধার্মিক হ'লে নিজের রাজ্যের কল্যাণ হয় না। এর পরে আপনাকে আর কিছু বলা বাহুল্য। আমি রাজ্যবৃদ্ধি আর নিজের রাজ্যের কল্যাণ চাই। বুঝলেন?'

অভিবাদন ক'রে বিদায় নিলেন সেনাপতি।

শশাঙ্ক আপন মনে বললেন, 'রাজ্যবর্ধন, তোমার উন্নতি আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিরোধী। কিন্তু তোমার জন্যে আমি দুঃখিত।'

রাজ্যবর্ধন দুর্ধর্ষ হূণ-সমরে বিজয়ী হয়ে ইতিহাসে স্থায়ী খ্যাতি অর্জন করেছেন। কিন্তু বয়সে তিনি কাঁচা হ'লেও তাঁর বুদ্ধিকে অপরিণত ব'লে মনে করা চলে না। তাঁরও আগে তাঁরই মতন বয়সে

গ্রীক-দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার অসাধারণ সামরিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে রাজ্যবর্ধনের মস্তিষ্কের স্থিরতা ছিল না। একে তাঁর সহোদরার স্বামী নিহত, তার উপরে বিধবা রাজশ্রীও নিরুদ্দেশ এবং তারও উপরে পঞ্চনদ অঞ্চলের সাধারণ কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে তিনিও সত্য সত্যই মনে করেছিলেন যে স্থানেশ্বরের সাত হাজার সৈন্য বঙ্গাধিপের লক্ষ সৈন্যের চেয়েও বলবান।

এই ভ্রান্ত ধারণার অবশ্যম্ভাবী ফল ফলতেও দেরি লাগল না। শশাঙ্ক যে ফাঁদ পেতেছিলেন, রাজ্যবর্ধন সেই ফাঁদেই পা দিলেন অন্ধের মত। স্থানেশ্বরের সাত হাজার অশ্বারোহী মগধ-বঙ্গের বিপুল বাহিনীর মধ্যভাগ আক্রমণ করল। মগধ-বঙ্গের মধ্যভাগের গজারোহী, পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যগণ তাদের বাধা দিতে লাগল এবং সেই অবকাশে তাদের অর্ধচন্দ্র ব্যূহের দক্ষিণ ও বাম বাহুও এগিয়ে এসে পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে সমগ্র স্থানেশ্বর বাহিনীকে একেবারে ঘিরে ফেললে। ঠিক বেড়াজালের মধ্যে আবদ্ধ হয়েও রাজ্যবর্ধনের সৈন্যরা যুদ্ধ করতে লাগল বটে বিপুল বিক্রমে, কিন্তু এক লক্ষের সামনে সাত হাজারের শক্তি কতটুকু? দেখতে দেখতে স্থানেশ্বরের ক্ষুদ্র বাহিনী নিঃশেষে হারিয়ে গেল সমুদ্রের মাঝখানে ঠিক নদীর মতই।

শিবিরের বাইরে যুদ্ধের কোলাহল—অস্ত্রে অস্ত্রে ঝনৎকার, আহতের আর্তনাদ, যোদ্ধার গর্জন, দামামার ডিমি-ডিমি-ডিমি, কিন্তু মহারাজ শশাঙ্ক তখন জনৈক পারিষদের সঙ্গে নিশ্চিন্ত মনে দাবা-বোড়ে খেলায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। জ্যোতিষী না হ'লেও তিনি জানতেন যে, আজকের যুদ্ধের ফলাফল কি হবে।

বার্তাবাহ সংবাদ নিয়ে এল,—স্থানেশ্বরের বাহিনী প্রায় নির্মূল, রাজ্যবর্ধন নিহত।

ভ্রূসঙ্কোচ ক'রে শশাঙ্ক শুধোলেন, 'নিহত? কার হস্তে?'

—'সেনাপতি মহাশয় স্থানেশ্বরের মহারাজাকে স্বহস্তে বধ করেছেন।'

শশাঙ্ক স্তব্ধ হয়ে রইলেন গম্ভীর মুখে। তারপর ধীরে ধীরে বললেন,

'পণ্ডিতরা বলেন, অমঙ্গল থেকেই মঙ্গলের উৎপত্তি হয়। উচ্চাকাঙ্ক্ষার আর এক ধাপ উপরে উঠলুম। স্থানেশ্বরের অমঙ্গলের উপরে মগধ-বঙ্গের মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা। এ-জন্যে রাজনীতি আমাকে অপরাধী ব'লে মনে করতে পারবে।'

সপ্তম

নায়কের মঞ্চে প্রবেশ

প্রভাত কাল। স্থানেশ্বরের রাজপ্রাসাদ।

আজ থেকে কিঞ্চিদধিক তেরোশো পঞ্চাশ বৎসর আগেকার কথা বলছি। বর্তমানের পটে সেদিনকার আর্যাবর্তের আলোক-চিত্র একেবারেই ঝাপ্‌সা হয়ে গিয়েছে বটে, কিন্তু আজও অপরিবর্তিত হয়ে আছে সেদিনকার দৃশ্যমানা প্রকৃতি!

নির্মল নীলাকাশ, জ্যোতির্ময় প্রভাত-সূর্য, সোনালী কিরণ-বন্যা, মুক্তকণ্ঠ গানের পাখী, স্নিগ্ধ সমীরণ-হিন্দোলায় ছন্দে ছন্দে আন্দোলিত শ্যামলতা। প্রকৃতি বর্ণনা করতে বসলে আজকের লেখকও এর চেয়ে নূতন কিছু দেখাতে পারবেন না।

রাজকুমার হর্ষবর্ধন আপন মনে করছিলেন কাব্য রচনা।

কৃপাণ এবং লেখনী, এই দুটিই হর্ষবর্ধনের কাছে ছিল সমান প্রিয়। বালক বয়স থেকে ভালবাসতেন তিনি কবিতাকে এবং পরিণত বয়সে এই কাব্যানুরাগ তাঁর খ্যাতিকে কতখানি অমর ক'রে তুলেছিল, সেটা আমরা দেখতে পাব যথাসময়েই। হর্ষবর্ধনের নিজের সৃষ্ট কাব্যালোকের মধ্যে আজও তাঁর মনের কথা উত্তপ্ত ও জীবন্ত হয়ে আছে বিশ্ব-সাহিত্যের মধ্যে!

হর্ষবর্ধন সেদিন কবিতা রচনা করছিলেন। কিন্তু প্রথম শ্লোকটি শেষ করতে না করতেই হঠাৎ বিঘ্ন উপস্থিত হ'ল।

পরিচারক এসে জানালে, সেনাপতি সিংহনাদ দ্বারদেশে অপেক্ষা করছেন। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তিনি দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছেন।

হর্ষবর্ধন সচমকে বললেন, "দুঃসংবাদ? কি দুঃসংবাদ?"

—"আমি জানি না প্রভু!"

—"বেশ, সেনাপতিকে এখানে আসতে বল।"

সেনাপতি সিংহনাদ ঘরের ভিতর এসে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখ-চোখ উদ্‌ভ্রান্তের মত।

—"কি ব্যাপার সেনাপতি?"

সিংহনাদ প্রায়-অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন,

"দেব দেবভূয়ং গত নরেন্দ্রে দুষ্টগৌড়ভুজঙ্গজগ্ধজীবিতে চ।

রাজ্যবর্ধনে বৃত্তেঽস্মিন মহাপ্রলয়ে ধরণীধারণায়াধুনাত্বং শেষঃ॥"

হর্ষবর্ধনের বুকের মধ্য দিয়ে যেন উল্কাগতির প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেল, খ'সে পড়ল তাঁর হাত থেকে লেখনী! আড়ষ্ট কণ্ঠে তিনি ব'লে উঠলেন, "সেনাপতি, কি বললেন? দুষ্ট গৌড়-ভুজঙ্গের দংশনে মহারাজা রাজ্যবর্ধন স্বর্গে প্রস্থান করেছেন?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ দেব!"

—"গৌড়-ভুজঙ্গ? মগধ-বঙ্গের রাজা শশাঙ্ক? সেই গৌড়াধম হত্যা করেছে আমার দাদাকে?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ দেব! কেবল তাকেই হত্যা নয়, সেই দুরাচারের কবলে প'ড়ে আমাদের সাত হাজার সৈন্য একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।"

—"আর আমার দিদি রাজশ্রী? তাঁর খবর কি? দাদা তো তাঁকেই উদ্ধার করতে গিয়েছিলেন।"

—"স্থানেশ্বরের রাজকন্যার কথা কেউ সঠিক বলতে পারছে না। কেবল এইটুকু জানা গিয়েছে যে তিনি এখন আর বন্দিনী নন। কিন্তু মহারাজা রাজ্যবর্ধনও তাঁর সন্ধান পাননি। লোকের মুখে প্রকাশ, রাজ-কন্যা না কি বিন্ধ্য পর্বতের কোথায় গিয়ে আত্মগোপন ক'রে আছেন।"

হর্ষবর্ধন আবার কি জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়ালেন তাঁর ভ্রাতৃ-সম্পর্কীয় ভণ্ডী ও আরো কয়েকজন মন্ত্রী।

ভণ্ডী বললেন, "কুমার হর্ষবর্ধন, রাজ্যের চারিদিকে বিষম আতঙ্কের

সৃষ্টি হয়েছে, স্থানেশ্বরের সিংহাসন আবার শূন্য। মহারাজা রাজ্যবর্ধনের শোচনীয় অকালমৃত্যু আমাদের সকলকেই স্তম্ভিত ক'রে দিয়েছে বটে, কিন্তু এখন আমাদের আত্মহারা হবার বা শোক করবারও অবকাশ নেই। হর্ষবর্ধন, রাজ্যের মঙ্গলের জন্যে এখনি তোমাকে মুকুট ধারণ করতে হবে।"

হর্ষবর্ধন বেগে উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর দুই বিস্ফারিত চক্ষে ঠিক্‌রে উঠল আগুনের ফিন্‌কি! দৃপ্তকণ্ঠে তিনি বললেন, "মুকুট? আমি এখন মুকুট ধারণ করব? ছার এই মুকুট! আমার অত্যাচারিতা অভাগিনী বিধবা সহোদরা নিরুদ্দেশ, আমার দাদার—স্থানেশ্বরের মহারাজাধিরাজের পবিত্র মৃতদেহ নিয়ে এখন হয়তো কাড়াকাড়ি করছে শকুনি-গৃধিনীর দল, এই সময়ে মুকুট ধারণ করব আমি? আপনারা জ্যেষ্ঠ, আপনারা জ্ঞানী, কিন্তু এ কি বলছেন আপনারা! মুকুট এখন আমার কাছে তুচ্ছাদপি তুচ্ছ, এখন আমার কাম্য কেবল প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা! আজ আপনারা সকলে আমার এই প্রতিজ্ঞা শুনে রাখুন, যত দিন না দিদি রাজশ্রীকে উদ্ধার করতে পারছি, যতদিন না আমার দাদার শত্রুদের শাস্তিবিধান করতে পারছি, ততদিন আমি দক্ষিণ হস্ত দিয়ে অন্নগ্রহণ করব না।"

অষ্টম

রাজশ্রী

হর্ষবর্ধনের সামনে রয়েছে এখন দুটি প্রধান কর্তব্য। ভ্রাতৃহন্তা বঙ্গেশ্বর শশাঙ্ককে শাস্তি দেওয়া এবং নিরুদ্দিষ্টা ভগিনী রাজশ্রীকে উদ্ধার করা।

কিন্তু সর্বাগ্রে রাজশ্রীর সন্ধান না নিলে চলবে না। রাজশ্রী হর্ষের

চেয়ে আট-দশ বৎসরের বড় ছিলেন। শৈশবে তিনি দিদির কোলে চড়েছেন, তাঁর কাছে কত আবদার করেছেন। দিদিকে তিনি কেবল ভালোবাসতেন না। তাঁকে দেখতেন অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে। কারণ, রাজশ্রী ছিলেন একাধারে বিদ্যাবতী ও বুদ্ধিমতী! হর্ষের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, রাজশ্রী যদি পুরুষ হ'তেন তাহ'লে তিনি থাকতে স্থানেশ্বরের সিংহাসনে বসবার যোগ্যতা হ'ত না আর কারুর!

সেনাপতি সিংহনাদ নিবেদন করলেন, 'দেব, রাজশ্রীদেবীকে আগে উদ্ধার করতে গেলে নরাধম গৌড়াধিপতি যদি পালিয়ে যায়? বঙ্গ হচ্ছে দুর্গম দেশ, সেখানকার লোকদের আশ্রয় কেবল স্থলপথ নয়, জলপথও। একবার সে পলায়নের সুযোগ পেলে আর কি আমরা তাকে ধরতে পারব?'

হর্ষ বললেন, 'হয়তো পারব না, তবু উপায় নেই। রাজশ্রীদেবীর ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের পবিত্র রক্ত। তার উপরে আমি পিতা-মাতাকে হারিয়েছি, একমাত্র ভ্রাতাকেও হারিয়েছি, পৃথিবীতে এখন দিদি ছাড়া আমার আর আপনজন নেই। আমার দিদির সঙ্গে একশত শশাঙ্ক তুল্যমূল্য নয়। আগে দিদিকে ফিরিয়ে আনি, তারপর অন্য কথা।'

—'আমার প্রতি আপনার কি আদেশ।'

…'আপনি এখন থেকেই নূতন সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা করুন। ইতিমধ্যে আমি এক হাজার লোক নিয়ে দিদির সন্ধানে যাত্রা করব। ফিরে এসে যেন সেনাদলকে প্রস্তুত অবস্থায় দেখতে পাই

হর্ষের কবি-বন্ধু বাণভট্ট সাবধান করে দিলেন, 'দেখবেন রাজপুত্র, রাজশ্রীদেবীকে উদ্ধার করতে যেন বিলম্ব না হয়! নিজের প্রতিজ্ঞার কথা সর্বদাই স্মরণ রাখবেন। বাঙালী-পাখী শশাঙ্ক যদি উড়ে পালায়, তা'হলে সারা জীবনই আপনাকে নোংরা বাম হাত দিয়ে অন্নগ্রহণ করতে হবে।'

সে কথার উত্তর না দিয়ে সিংহনাদের দিকে ফিরে হর্ষ বললেন,

'প্রধান সেনাপতি স্কন্দগুপ্ত এখন কোথায় ?'

সিংহনাদ বললেন, 'তাঁকে আমি যুদ্ধক্ষেত্রে দেখেছিলুম বটে, কিন্তু এখন তিনি জীবিত কি মৃত বলতে পারি না।'

বাণভট্ট বললেন, 'রাজপুত্র, আপনি কি সেই স্কন্দগুপ্তের কথা জিজ্ঞাসা করছেন, যাঁর মহা নাসিকা আপনার সম্ভ্রান্ত পূর্বপুরুষদের নামের তালিকার চেয়েও বেশি দীর্ঘ ?'

—'কবি, তোমার এই উপমাটি বেশ রুচিসম্মত হ'ল না। যাক্ সে কথা। হ্যাঁ, আমি সেই স্কন্দগুপ্তের কথাই জিজ্ঞাসা করছি। তুমি কি তাঁর সম্বন্ধে কিছু জানো ?'

—'জানি বৈ কি রাজপুত্র। শশাঙ্ক-পক্ষীর চঞ্চু-তাড়নায় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে লম্বা দিয়ে তিনি এমন ভীষণ লজ্জিত হয়ে পড়েছেন যে, নিজের বাড়ীর অন্দর-মহলে রমণীর মত ঘোমটায় বদন ঢেকে অবস্থান করছেন।'

—'এখন পরিহাস রাখো কবি। একবার প্রধান সেনাপতির কাছে যাও, তাঁকে ব'লে এস—যুদ্ধে জয়-পরাজয় দুই-ই থাকে, প্রকৃত বীরকে কোনদিন স্পর্শ করতে পারে না পরাজয়ের গ্লানি। তিনি যদি প্রতিশোধ নিতে চান তা'হলে শশাঙ্কের সঙ্গে আবার দেখা করবার জন্যে যেন প্রস্তুত হয়ে থাকেন। আমি চললুম।'

হর্ষ প্রস্থান করলে পর বাণভট্ট বললেন, 'ওহে বাপু সিংহনাদ, স্কন্দগুপ্তের কেবল অতিদীর্ঘ নাসা নয়, তাঁর কেশও অতিপক্ক। রাজপুত্র শ্রীহর্ষ তাঁকে যে কথাগুলি বলতে বললেন তা শুনলে তিনি কি মনে করবেন বল দেখি ?'

—'কি মনে করবেন ?'

—'মনে করবেন, ছেলেটি গোঁফ না গজাতেই জেঠা-মহাশয় হবার চেষ্টা করছে।'

সিংহনাদ কোন রকম নাদসৃষ্টি না ক'রে মুখ টিপে একটুখানি হাসবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু স্পষ্টাস্পষ্টি হাসলেন না।

বিন্ধ্য পর্বতমালার পাদদেশে জঙ্গলাকীর্ণ প্রদেশ! এমন ঘন জঙ্গল যে পাঁচ হাত অগ্রসর হ'লেই দৃষ্টি হয় বন্ধ। সেখানে বাঘ, ভাল্লুক, অজগর ও বিষাক্ত সর্পাদি তো আছেই, তার উপরে যে সময়ের কথা বলছি তখন সেখানে পশুরাজ সিংহেরও প্রতাপ বড় কম ছিল না।

সেখানে বাস করত মানুষও। কিন্তু তারা সভ্য মানুষ নয়, অসভ্য ভিল। এক সময়ে তাদেরই পূর্বপুরুষরা ছিল ভারতের আদিম বাসিন্দা। কিন্তু বিদেশী আর্য জাতির দ্বারা যখন উত্তরাপথ অধিকৃত হ'ল, তখন তারা এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল এমনি সব দুর্গম গহন বনে বা পর্বতের অন্তরালে। তাদের আত্মরক্ষার সম্বল ছিল কেবলমাত্র বল্লম বা তীর-ধনুক। তারই সাহায্যে তারা করত দুর্দান্ত সিংহ-ব্যাঘ্রদেরও প্রাণে ভীতির সঞ্চার। শিকারই ছিল তাদের প্রাণধারণের প্রধান উপায়, কিন্তু শিকার না জুটলেও তাদের খাদ্যের অভাব হ'ত না কোন দিন। অসংখ্য বৃক্ষদেবতা হাজার হাজার পত্রশ্যামল শাখা-বাহু বিস্তার ক'রে তাদের সামনে ধরত অফুরন্ত ও সুমিষ্ট অমৃত ফল এবং তাদের তৃষ্ণা নিবারণ করবার জন্যে নাচতে নাচতে ছুটে আসত সাগ্রহে সঙ্গীতমুখরা ও সুধাময়ী নির্ঝরিণী আর তটিনীরা। ছিল না কোন অভাব, ছিল না সংকীর্ণ সমাজের বাঁধন। নাগরিক এবং পরম শত্রু আর্যদের কার্য বা অকার্য নিয়ে তারা মাথা ঘামাতো না একটুও, বনে বনে বা পাহাড়ের শিখরে শিখরে আগলভাঙা উদ্দাম পুলকে স্বাধীনভাবে বিচরণ করত প্রকৃতির একান্ত প্রাণের দুলালের মত।

স্থানীয় ভিলদের এক সর্দার ছিল, নাম তার লট্না। বয়স পঞ্চাশের ওপারে, কিন্তু জোয়ান সে ত্রিশ বৎসরের যুবকের মত। তার সেই সাত ফুট লম্বা দেহ ও পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চি চওড়া বুকের পাটা দেখলে চম্‌কে ওঠে দুর্দান্ত সিংহদেরও চক্ষু!

সভ্য মানুষদের নির্দয় অসভ্যতার কবল থেকে নিস্তার পাবার জন্যে এই লট্না-সর্দারেরই কাছে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন স্থানেশ্বরের রাজকন্যা ও কান্যকুব্‌জের সিংহাসনচ্যুতা মহারাণী রাজশ্রীদেবী।

বয়স তাঁর চব্বিশ-পঁচিশের বেশি হবে না, কিন্তু এখনো তাঁকে দেখলে মনে হয় পনেরো-ষোলো বছরের বালিকার মত। বর্ণ তাঁর হস্তীদন্তশুভ্র নয়, পক্ক আপেলের মতন রঙিন। সুডৌল তনু, পরিপুষ্ট বাহু, কোমলতা-মাখানো মুখখানি দেখলে কঠোর পাথরও বুঝি তরল হয়ে যায়! আর সেই দু'টি আয়ত নয়ন, তাদের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে যেন আত্মসমাহিত দিব্যদৃষ্টি।

আলুলিত কেশ, বিধবার শুভ্র বেশ। দেখলেই মনে হয়, যেন মূর্তিধারণ করেছে সুপবিত্র এক অচঞ্চল হোমাগ্নিশিখা!

সেদিন সকালে স্তম্ভিত লট্‌না-সর্দার দাঁড়িয়েছিল চিত্রার্পিতের মত। তারই সামনে ভূমিতলে নতনেত্রে উপবিষ্টা রাজকন্যা, রাজমহিষী রাজশ্রী। কিছু দূরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সর্দারের অনুচররা।

অবশেষে মূক লট্‌না খুঁজে পেলে যেন তার আড়ষ্ট কণ্ঠস্বর। সসম্ভ্রমে হেঁট হয়ে বললে, 'লেড়কি, তাহলে সত্যিই কি তুই আমাদের ফাঁকি দিবি।'

রাজশ্রী ধীর কণ্ঠে বললেন, 'বাছা, এখনো কি তুমি আমার মনের ব্যথা বুঝতে পারছ না?'

লট্‌না অত্যন্ত দুঃখিতভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, 'বুঝতে পারছি বেটী, বুঝতে পারছি। যার সোয়ামী নেই, তার কেউ থাকে না বটে! কিন্তু মায়ী, আমরা—তোর বেটারা এখনো তো তোর সাম্‌নেই দাঁড়িয়ে! তুই আগে ছিলি শহরের রাণী, কিন্তু আমরা যে আজ তোকে বনের রাণী ক'রে রাখতে চাই! তোদের শহরের চেয়ে কি আমাদের বন ভালো ঠাঁই নয়?'

রাজশ্রী বললেন, 'বাবা, শহর ভালো কি বন ভালো, তা নিয়ে কোন কথা হচ্ছে না। কিন্তু আমার পক্ষে আর বেঁচে থাকবার কোন কারণ নেই! আমার স্বামী পরলোকে গিয়েছেন, আমি হিন্দু নারী—আমারও উচিত সহগমন করা। তুমি বোধহয় শুনেছ, আমার মা ছিলেন স্থানেশ্বরের মহারাণী। আমার মৃত্যুশয্যাশায়ী বাবা শেষ-নিঃশ্বাস

ফেলবার আগেই মা করেছিলেন জ্বলন্ত চিতায় আত্মদান। সেই পরম সতী জননীর কন্যা আমি, বিধবা হয়েও তবু এই তুচ্ছ জীবন আঁকড়ে আছি। কিন্তু কেন জানো? ভেবেছিলুম আমার স্বামীর হত্যাকারীর উপযুক্ত শাস্তি না দেখে মরব না। কিন্তু সে আশা আজ স্বপ্নে পরিণত হয়েছে। দেবগুপ্তের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে এখানে পালিয়ে এসেছি বটে, কিন্তু সেই দুরাচার হয়তো আজও আমার স্বামীর সিংহাসন অধিকার ক'রে আছে। এখানে আসবার আগে কেবল এইটুকু খবর পেয়েছিলুম যে, দেবগুপ্তকে আক্রমণ আর আমাকে উদ্ধার করবার জন্যে আমার ভাই মহারাজা রাজ্যবর্ধন করেছেন যুদ্ধযাত্রা। এখন আমার কি ধারণা জানো? যুদ্ধে নিশ্চয়ই আমার ভ্রাতার পরাজয় হয়েছে! কারণ তিনি জয়ী হ'লে এতদিনে নিশ্চয়ই আমার খোঁজ নেবার চেষ্টা করতেন। কে জানে, আমার ভাই জীবিত আছেন কি না? বাবা, দেবগুপ্ত যদি আবার আমার সন্ধান পায়, তাহ'লে আবার আমাকে বন্দী আর অপমান করতে পারে। আমার আর কোন আশাই নেই। এখন আমার বিধবা হয়েও বেঁচে থাকা হচ্ছে মহাপাপ। সর্দার, আমার প্রতি যদি তোমার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা থাকে, তাহ'লে আর আমাকে বাধা দিও না, আমার জন্যে এখনি চিতাশয্যা রচনা কর!'

লট্না সাশ্রু নেত্রে দুই হাত জোড় ক'রে বললে, 'কিন্তু মায়ী—'

এইবারে রাজশ্রীর কণ্ঠস্বর হয়ে উঠল বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ! তীক্ষ্ণ চক্ষে ও তীব্র কণ্ঠে বাধা দিয়ে তিনি ব'লে উঠলেন, 'এখনো 'কিন্তু'? সর্দার, সর্দার! এখনো তুমি যদি আমার অনুরোধ রক্ষা না কর, তাহ'লে আমি অন্য যে কোন উপায়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হব!'

—'মা, আমার একটি নিবেদন শোনো—'

—'না, না, আমি আর কোন কথাই শুনতে চাই না। এই পৃথিবীর প্রত্যেক মুহূর্ত আমার পক্ষে এখন বিষাক্ত। এখনি চিতার কাষ্ঠ আনাও, কর সেই কাষ্ঠে অগ্নিসংযোগ। যে নিজে মরতে চায়, তাকে তোমরা বাঁচাবে কেমন ক'রে?'

রাজশ্রীর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মূর্তি দেখে লট্‌না আর কোন কথাই বলতে সাহস করলে না। অত্যন্ত বিমর্ষের মত ধীরে ধীরে নিজের অনুচরদের কাছে গিয়ে অনুচ্চ স্বরে কি বললে, রাজশ্রী তা শুনতে পেলেন না।

দাউ-দাউ জ্বলন্ত চিতা! ঊর্ধ্বে উঠে শূন্যকে দংশন করবার চেষ্টা করছে শত শত রক্তাক্ত লক্‌লকে অগ্নিসর্প! আরো ঊর্ধ্বে তাদেরই দৃশ্যমান নিশ্বাসের মত উঠে যাচ্ছে পুঞ্জ-পুঞ্জ ধূম্রকুণ্ডলী!

রাজশ্রী প্রস্তুত। ভয়শূন্য মুখে দৃঢ়পদে এগিয়ে গেলেন চিতার দিকে।

আচম্বিতে খানিক দূরে জাগ্রত হ'ল ঘন ঘন আকাশ কাঁপানো দামামা ধ্বনি।

রাজশ্রী বেগে চিতার দিকে অগ্রসর হ'তে হ'তে সচকিত কণ্ঠে বললেন, 'সর্দার, সর্দার, দুরাত্মা দেবগুপ্ত নিশ্চয় আবার আমাকে বন্দী করতে আসছে!'

অধিকতর বেগে ছুটে গিয়ে লট্‌না দাঁড়ালো রাজশ্রীর পথরোধ ক'রে। বললে, 'একটু অপেক্ষা কর মা। এ নিশ্চয় শত্রুর দামামা নয়। কাউকে গোপনে বন্দী করতে হ'লে কেউ কখনো দামামা বাজিয়ে নিজের আগমন সংবাদ দেয় না।'

—'শত্রু নয়, বন্ধু? এই পৃথিবীতে আর আমার বন্ধু বলতে কে আছে সর্দার?'

উত্তর পেতে বিলম্ব হ'ল না। ঘন জঙ্গলের সবুজ প্রাচীর ভেদ ক'রে আবির্ভূত হ'ল এক অশ্বারোহী মূর্তি! উচ্চ স্বরে সে ব'লে উঠল, 'রাজপুত্র হর্ষবর্ধন! স্থানেশ্বরের রাজপুত্র হর্ষবর্ধন এসেছেন তাঁর সহোদরা রাজশ্রীদেবীকে সানন্দ সম্ভাষণ করতে!'

নবম

প্রত্যাদেশবাণী

চিতার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ালেন রাজশ্রী।

অরণ্যের অন্তরাল থেকে আত্মপ্রকাশ করছে দলে দলে অশ্বারোহী। অশ্বদের ধূলি-ধূসরিত দেহ এবং ফেনায়িত মুখ দেখলে বুঝতে বিলম্ব হয় না যে, বহু দূর থেকে অতি বেগে পথ অতিক্রম ক'রে তারা এসে উপস্থিত হয়েছে এখানে।

অশ্বারোহীদের পুরোভাগে দেখা গেল হর্ষবর্ধনকে। এক লাফে মাটির উপরে নেমে প'ড়ে তিনি ছুটে এলেন রাজশ্রীর কাছে। ব্যাকুল ভাবে নিজের দুই হাত দিয়ে ভগিনীর দুই হাত চেপে ধরে উচ্ছ্বসিত বিস্ময়ে ব'লে উঠলেন, 'দিদি, দিদি, এ কি দেখছি! তোমার সামনে জলন্ত চিতা কেন?'

বিষাদ-মাখা হাসি হেসে রাজশ্রী ধীরে ধীরে বললেন, 'ভাই, ঐ চিতাই যে এখন আমার একমাত্র শয্যা।'

—'তা হয় না, দিদি, তা অসম্ভব। তোমাকে হারালে এই পৃথিবীতে আমি যে হব একেবারে একলা।'

—'একবারে একলা? কেন, তোমার মাথার উপর তো আছেন রাজ্যবর্ধন।'

—'তিনি এখন স্বর্গে।'

রাজশ্রী বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলেন।

হর্ষ বললেন, 'মগধ-গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক তাঁকে হত্যা করেছে।'

খানিকক্ষণ স্তম্ভিতের মত থেকে রাজশ্রী বললেন, 'তুমি এ কি দুঃসংবাদ দিলে হর্ষ? এক বৎসরের মধ্যেই আমি মাতা, পিতা, ভ্রাতা আর স্বামীকে হারালুম? আর সেই পাষণ্ড দেবগুপ্ত এখন কোথায়?'

—'নরকে। তাকে পরাজিত আর নিহত করবার পরেই আমার দাদা মারা পড়েছেন দেবগুপ্তের বন্ধু শশাঙ্কের হাতে। সেই খবর পেয়েই আমি আগে তোমাকে উদ্ধার করতে ছুটে এসেছি। এরপর আমাকে যেতে হবে শশাঙ্কের পিছনে। সে না কি সমগ্র আর্যাবর্তে আবার গুপ্ত-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আগে কান্যকুব্জ অধিকার ক'রে সে না কি স্থানেশ্বরও আক্রমণ করবে। কিন্তু আমি তাকে সে সুযোগ দেব না।'

রাজশ্রী বললেন, 'হর্ষ, সম্ভ্রান্ত রাজবংশে তোমার জন্ম। তুমি যে রাজকর্তব্য পালন করতে পারবে, সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার স্বামীহন্তা শাস্তি পেয়েছে, আমি আর এ পৃথিবীতে থাকতে চাই না।'

—'কিন্তু দিদি, তোমার ভ্রাতৃহন্তা তো এখনো শাস্তি পায়নি।'

—'সে জন্যে তুমি রইলে হর্ষ।'

—'না দিদি, না! আমি যাব এখন শশাঙ্ককে শাসন করতে। আমার অবর্তমানে স্থানেশ্বরের শুভাশুভ দেখবে কে? যুদ্ধের পরিণাম অনিশ্চিত। রণক্ষেত্রে যদি আমারও মৃত্যু হয়? তখন তুমি ছাড়া পিতার বংশে রাজ্যচালনা করবার জন্যে তো আর কেউ থাকবে না।'

রাজশ্রী সবিস্ময়ে বললেন, 'তুমি কি বলতে চাও হর্ষ। আমি রাজ্যচালনা করব? তুমি কি ভুলে গিয়েছ, আমি নারী?'

হর্ষ আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'কিছুই ভুলিনি দিদি, কিছুই ভুলিনি! তুমি নারী বটে, কিন্তু তুমি কি যে-সে নারী? পিতা বলতেন, বিদ্যা-বুদ্ধিতে তোমার সঙ্গে তুলনীয় কোন পুরুষ তাঁর সমগ্র রাজ্যে নেই। আমার কথা রাখো দিদি! তুমি যদি স্থানেশ্বরের ভার গ্রহণ কর, আমি তাহ'লে নিশ্চিন্ত মনে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করতে পারি।

দ্বিধা-জড়িত কণ্ঠে রাজশ্রী বললেন, 'ভাই হর্ষ—'

হর্ষ বাধা দিয়ে বললেন, 'দিদি, এখনো তুমি সব কথা শোনোনি। রাজ্যে বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়েছে। বেশিরভাগ মন্ত্রীর ইচ্ছা নয়

যে, আমি সিংহাসনে আরোহণ করি। তাঁদের মতে আমি নাবালক, রাজ্যচালনা করবার মত বুদ্ধি বা শক্তি আমার নেই। কেবল আমার জ্ঞাতি-ভ্রাতা ভণ্ডী তাঁদের মুখ বন্ধ ক'রে রেখেছেন। তিনি আমার পক্ষে না থাকলে স্থানেশ্বরের সিংহাসন এর মধ্যেই হয়তো আমার হাতছাড়া হয়ে যেত। দিদি, তোমার বিদ্যাবুদ্ধির কথা জানে না, রাজ্যে এমন লোক নেই। আমি চিরদিনই তোমার কাছ থেকে পেয়ে এসেছি মায়ের স্নেহ। এই দুঃসময়ে তুমি যদি আমার মাথার উপরে থাকো, তাহ'লে পরম শত্রুরাও বাধ্য হয়ে আমার আনুগত্য স্বীকার করবে।'

এখনো রাজশ্রীর দ্বিধার ভাব কাটল না! বাধো-বাধো গলায় তিনি বললেন, 'ভাই হর্ষ, তোমার প্রস্তাব শুনে আমি ভীত হচ্ছি।'

হর্ষ দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'ভয়'? কোন ভয় নেই দিদি! তোমার কাছে আসবার আগেই আমি এক বৌদ্ধ মঠে গিয়েছিলুম নিজের ভবিষ্যৎ জানতে। দিদি, আমি কি প্রত্যাদেশ-বাণী পেয়েছি জানো। জম্বুদ্বীপে প্রথম সাম্রাজ্য ছিল মৌর্যরাজাদের। দ্বিতীয় সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্ত। তৃতীয় সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়েছিলেন হূণবিজেতা যশোধর্মদেব। প্রত্যাদেশ-বাণী যদি মানতে হয়, তা'হলে আমিই হব না কি এখানকার চতুর্থ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। এই বিচিত্র বাণী শুনে পর্যন্ত আমার আশা হয়ে উঠেছে অনন্ত—সমস্ত চিত্ত আমার বিচরণ করছে অসীম আকাশে। দিদি, আমি কি স্থির করেছি তাও বলি শোনো। নিন্দুকদের মুখ বন্ধ করবার জন্যে আমি আপাতত 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করব না। যত দিন না প্রাপ্তবয়স্ক হই, যত দিন না নিজের শক্তির পরিপূর্ণ পরিচয় দিতে পারি, তত দিন আমি রাজপুত্র শিলাদিত্য, এই নাম গ্রহণ ক'রে নিজের কর্তব্যপালন করব। দিদি, আসলে রাজ্যচালনার ভার থাকবে তোমার উপরে, কেবল অস্ত্রচালনা করব আমি। এই খণ্ড খণ্ড আর্যাবর্তকে আবার আমি অখণ্ড ক'রে তোলবার চেষ্টা করব। কিন্তু দিদি, তুমি সহায় না হ'লে আমার পক্ষে এই সুপবিত্র ব্রত উদ্‌যাপন করা

সম্ভবপর হবে না।'

রাজশ্রী পূর্ণকণ্ঠে বললেন, "হর্ষ, তোমার কথায় দেশের মঙ্গলের জন্যেই আমার জীবনকে উৎসর্গ করলুম। ভগবানের ইচ্ছায় সফল হোক তোমার স্বপ্ন। সর্দার, নিবিয়ে ফেলো চিতার আগুন।'

দশম

মরীচিকার অবসান

নিয়তি বড় নিষ্ঠুর, বহুবার নির্মূল করেছে সে মানুষের বহু উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

শশাঙ্ক ভেবেছিলেন, মালবরাজ দেবগুপ্তের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে পশ্চিম উত্তরাপথকে করতলগত করবেন। কিন্তু দেবগুপ্ত পড়লেন মৃত্যু-মুখে। রাজা ও নেতার পতনের সঙ্গে সঙ্গে মালব-সৈন্যরা হয়ে গেল ছত্রভঙ্গ এবং শশাঙ্কও হলেন তাদের মূল্যবান সাহায্য থেকে বঞ্চিত।

তার পর অভাবিত উপায়ে রাজ্যবর্ধনকে পথ থেকে সরিয়ে শশাঙ্ক আবার কিঞ্চিৎ আশান্বিত হয়ে উঠেছিলেন বটে। কিন্তু দৈবচক্রে আবার নিবু-নিবু হ'ল তাঁর আশার বাতি।

অকস্মাৎ সৈন্যদলের মধ্যে দেখা দিলে এমন মহামারী যে, শশাঙ্কের অগ্রগতি একেবারে রুদ্ধ হয়ে গেল। রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি যদি কান্যকুব্জ ও স্থানেশ্বর আক্রমণ করতে পারতেন, তাহ'লে তাঁর সাফল্য ছিল সুনিশ্চিত। কারণ অপ্রস্তুত শত্রু দমন করা কঠিন নয় কিছুমাত্র।

শশাঙ্কের সে সৌভাগ্য হ'ল না। একই স্থানে অচল হয়ে ব'সে ব'সে অসহায়ভাবে তিনি দিনের পর দিন চোখের সামনে দেখতে লাগলেন, বিনা যুদ্ধে কেবল মাত্র মহামারীর কবলগত হয়ে ক্রমেই ক্ষীণ

হয়ে পড়ছে তাঁর বিপুল বাহিনী। অবশেষে কয়েক মাস পরে মহামারী শান্ত হ'ল বটে, কিন্তু সৈন্যবলের দিক্ দিয়ে শশাঙ্ক হয়ে পড়েছেন তখন রীতিমত দুর্বল।

তার উপরে গুপ্তচরের মুখে শত্রুপক্ষের খবর শুনে শশাঙ্কের দুশ্চিন্তা ক্রমেই বেড়ে উঠতে লাগল। পরামর্শের জন্য তিনি সেনাপতি ও মন্ত্রিগণকে আহ্বান করলেন।

শশাঙ্ক বললেন, 'স্থানেশ্বরের রাজপুত্র হর্ষবর্ধন আমাকে আক্রমণ করবার জন্যে অসংখ্য সৈন্যসংগ্রহ করছেন। এখনো তাঁর সৈন্যসজ্জা সম্পূর্ণ হয়নি, এখনো যদি আমরা স্থানেশ্বর আক্রমণ করতে পারি, তাহ'লে হয় তো বিজয়লাভ করব আমরাই। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় আমাদের পক্ষে সেটা সম্ভবপর হবে কি?'

সেনাপতি বললেন, 'অসম্ভব মহারাজ, অসম্ভব। মড়ক আমাদের অর্ধেক সৈন্যকে হত্যা করেছে। যারা বেঁচে আছে তাদেরও অধিকাংশ দেহ আর মন এত দুর্বল যে মৃতপ্রায় বললেও চলে। এখন আমরা আক্রমণ করব কি, কোন রকমে আত্মরক্ষা করতে পারব কি না সন্দেহ।

শশাঙ্ক বললেন, 'জানি সেনাপতি, আমিও সে কথা জানি। কিন্তু আরো দুঃসংবাদ আছে। আপনারা সকলেই জানেন, কিছু কাল আগে কামরূপরাজকে যুদ্ধে আমরা পরাজিত করেছিলুম। আজ আমার বিপদ দেখে কামরূপ আবার সাহস সঞ্চয় করেছে। শুনলুম, আমার বিরুদ্ধে হর্ষবর্ধনের সঙ্গে যোগ দেবার জন্যে কামরূপের রাজপুত্র ভাস্করবর্মা প্রবল এক সৈন্যদলের সঙ্গে অগ্রসর হয়েছে। এখন আমার কি করা উচিত?'

মন্ত্রী বললেন, 'মহারাজ, এই উভয়-সঙ্কট থেকে মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে আবার বঙ্গদেশে ফিরে যাওয়া।'

শশাঙ্ক মাথা নেড়ে বললেন, 'বিনা যুদ্ধে পলায়ন? এ অঞ্চলের লোকেরা একে তো বাঙালীকে মানুষ ব'লে গণ্য করতে চায় না, তার উপরে বিনা যুদ্ধে শত্রুভয়ে পলায়ন করলে আর্যাবর্তে আমাদের আর

মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না। হারি আর জিতি, যুদ্ধ আমাদের করতেই হবে।'

নিরুত্তর হয়ে রইলেন মন্ত্রী ও সেনাপতি।

শশাঙ্ক অধীরভাবে এদিকে-ওদিকে পদচালনা করতে করতে বললেন, 'এক জায়গা থেকে আমি সাহায্য পেতে পারি। দাক্ষিণাত্যের মহাপ্রতাপশালী চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী আমার পরম বন্ধু। এই বিপদের সময়ে সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি নিশ্চয়ই আমাকে নিরাশ করবেন না। আপনারা কি বলেন?'

সেনাপতি বললেন, 'মহারাজ, এ উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে, চরম মুহূর্ত উত্তীর্ণ হয়ে যাবার আগে চালুক্যরাজ আমাদের সাহায্য করতে পারবেন না।'

শশাঙ্ক বললেন, 'তবু চেষ্টা ক'রে দেখব। ইতিমধ্যে হর্ষবর্ধন যদি আক্রমণ করেন, আমরা আত্মরক্ষার জন্যে যতটুকু দরকার কেবল ততটুকু বাধাই দেব, সাধ্যমত এড়িয়ে চলব সম্মুখ-যুদ্ধ। আমরা আক্রমণ করব চালুক্যরাজের সাহায্য আসবার পরেই।'

বিপক্ষের জন্যে বেশি দিন অপেক্ষা করতে হ'ল না—যথাসময়ে উত্তর-পশ্চিমের বিশাল প্রান্তরের উপরে দেখা দিলে হর্ষবর্ধনের বিপুল বাহিনী।'

শশাঙ্ক বুঝলেন, অবিলম্বে চালুক্যরাজের সাহায্য না পেলে এই বৃহৎ বাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখবার সাধ্য তাঁর হবে না।

গোড়ার দিকে হ'ল কয়েকটা খণ্ডযুদ্ধ। বোঝা গেল, নিপুণ সেনানায়কের মত হর্ষবর্ধন পরীক্ষা ক'রে দেখছেন, মগধ-বঙ্গের ব্যূহের দুর্বল অংশ কোথায়।

উভয় পক্ষই যখন বৃহত্তর শক্তিপরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে, এমন সময়ে শশাঙ্ক স্বদেশ থেকে পেলেন আর এক বিষম দুঃসংবাদ। বৌদ্ধধর্মানুরাগী হর্ষবর্ধন, শৈব শশাঙ্ককে আক্রমণ করেছেন শুনে বুদ্ধগয়া, পাটলিপুত্র ও কাশীনগরের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে

উঠেছেন এবং তাঁদের প্ররোচনায় মগধ-বঙ্গের দিকে দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে বিদ্রোহীরা। শশাঙ্কের নিজের সিংহাসন পর্যন্ত বিপদগ্রস্ত।

বিকৃত কণ্ঠে শশাঙ্ক বললেন, 'দৈব প্রতিকূল! এর পরও আর সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখা চলে না। সেনাপতি যত দিন পারেন শত্রুদের বাধা দিন, কিছু সৈন্য নিয়ে এখনি আমাকে ফিরে যেতে হবে বিদ্রোহ দমন করতে। গৃহশত্রুর চেয়ে বড় শত্রু আর নেই। বৌদ্ধরা মুখে করে অহিংসার জয়গান, অথচ আমার প্রজা হয়ে তারাই করতে চায় আমাকে পিছন থেকে দংশন! কিন্তু এই বকধার্মিকরা এখনো আমাকে ভালো ক'রে চিনতে পারেনি—আমি হচ্ছি ধ্বংসের দেবতা শ্মশানপতি শিবের শিষ্য! বৌদ্ধদের এমন শাস্তি দেব, যা তারা আর কোন দিনই ভুলতে পারবে না!'

একাদশ

দিগ্বিজয়

হর্ষ যদিও রাজ-উপাধি গ্রহণ ক'রে রাজপুত্র শিলাদিত্য নামে পরিচিত হলেন, তবু তাঁর রাজ্যকাল গণনা করা হয় রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর থেকেই (৬০৬ খ্রীঃ)।

রাজশ্রীদেবীর উপরে প্রতিনিধি-নৃপের কর্তব্যভার অর্পণ ক'রে হর্ষ হলেন অনেকটা নিশ্চিন্ত। রাজশ্রী ললিতকলার ও শাস্ত্রালোচনার যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন বৌদ্ধধর্মেও বিশেষরূপে শিক্ষিতা। তাঁর এই বৌদ্ধধর্মানুরাগ হর্ষকেও বড় কম প্রভাবান্বিত করেনি। তিনি নিজে শৈব ও সূর্যোপাসক ছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত না হয়েও তিনি হিন্দুর চেয়ে বেশি ভালবাসতেন বৌদ্ধদেরই।

দিদির হাতে রাজদণ্ড দিয়ে হর্ষ স্বহস্তে ধারণ করলেন শাণিত

তরবারি। কেবল শশাঙ্ককে পরাজিত ও বিতাড়িত ক'রেই তিনি তুষ্ট হ'তে পারলেন না, মুক্তকণ্ঠে চারিদিকে প্রচারিত ক'রে দিলেন, "সমগ্র আর্যাবর্তকে আমি আনব বিপুল একচ্ছত্রের ছায়ায়। আমার আদর্শ নেবেন মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত ও যশোবন্তদেব। বহু খণ্ডে খণ্ডিত উত্তরাপথ ধাপে ধাপে নেমে যাচ্ছে চরম অধঃপতনের দিকে, শিয়রে তার সর্বদা জাগ্রত হয়ে রয়েছে যবন ও হূণ দস্যুদের শনির দৃষ্টি। ছোট ছোট রাজারা পরস্পরের সঙ্গে আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধে নিযুক্ত হয়ে আর্যদের ক্ষাত্রবীর্যকে ক্রমেই ঠেলে দিচ্ছেন ধ্বংসের মুখে। আর্যাবর্তকে আবার অখণ্ড ক'রে তুলতে হ'লে তথাকথিত রাজাদের নির্মমভাবে সমূলে উৎপাটিত করতে হবে তুচ্ছ আগাছার মত। যত দিন না এই মহান্ ব্রত উদ্‌যাপন করতে পারি, তত দিন আমার তরবারিকে করব না কোষবদ্ধ। স্বদেশের জন্যে যাঁর এতটুকু প্রাণের টান আছে, তাঁকেই আমি সাদরে আমন্ত্রণ করছি আমার পতাকার তলায়।'

হর্ষবর্ধনের এই দৃপ্ত আহ্বান-বাণী শ্রবণ ক'রে আর্যবীরদের বুকের ভিতর আবার নতুন ক'রে জেগে উঠল দেশাত্মবোধের উত্তপ্ত মত্ততা। দেশ-দেশান্তর থেকে একে একে নয় - দলে দলে যোদ্ধারা এসে যোগ দিতে লাগল তাঁর বাহিনীতে! যশোধর্মদেবের বহুকাল পর আবার এক তরুণ আর্যবীর দিগ্বিজয়ের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন, তা তাঁর সঙ্গীর অভাব হ'ল না।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, কি রকম সৈন্য নিয়ে হর্ষবর্ধন যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তর অন্যত্র আর একবার দিয়েছি, এখানে তারই দ্বিরুক্তি না ক'রে উপায় নেই।

৩২৭ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে গ্রীক আলেকজাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেছিলেন, তখন থেকে ষষ্ঠ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতীয় রাজাদের ফৌজ গঠনের পদ্ধতি ছিল প্রায় অপরিবর্তিত।

মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত তাঁর বাহিনীকে ছয় ভাগে বিভক্ত করেছিলেন।

পরিচালনার জন্যে তিনি প্রধান কর্মচারী রেখেছিলেন ত্রিশ জন—অর্থাৎ প্রত্যেক বিভাগে পাঁচজন ক'রে। বিভাগগুলি এই ঃ—

১। নৌ-বিভাগ। ২। রসদ-বিভাগ (মাল চালান দেবার দামামা বাদক, সহিস, কারিগর ও ঘেসেড়া প্রভৃতিরও খোরাকের জন্য ভালো বন্দোবস্ত ছিল)। ৩। পদাতিক বিভাগ। ৪। অশ্বারোহী বিভাগ। ৫। গজারোহী বিভাগ। ৬। রথারোহী বিভাগ।

ভারতীয় ফৌজ চিরকালই পদাতিক, অশ্বারোহী, রথারোহী ও গজারোহী—এই চার অঙ্গ নিয়ে গঠিত হ'ত। চন্দ্রগুপ্তের প্রতিভা এই সঙ্গে অতিরিক্ত আরও দুইটি অঙ্গ জুড়ে দিয়েছিল—নৌ ও রসদ বিভাগ। হয়তো গ্রীক ফৌজ পর্যবেক্ষণ ক'রে এই দুইটি অঙ্গের প্রয়োজনীয়তা তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন।

গ্রীক ঐতিহাসিক প্লিনি বলেন, ভারতীয় ফৌজের প্রত্যেক রথে থাকত সারথি ও দু'জন ক'রে যোদ্ধা এবং প্রত্যেক হাতীর উপর থাকত মাহুত ও তিনজন ক'রে ধনুকধারী।

চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চাণক্যের মত ছিল, ফৌজের পক্ষে সব চেয়ে দরকারি হচ্ছে, রণহস্তীরা। কারণ, শত্রু-সৈন্য ধ্বংস করা তাদের দ্বারাই (মধ্যযুগের দিগ্বিজয়ী তৈমুর লং যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিলেন, ভারতীয় রাজা-বাদশাহরা তখনও রণহস্তী ব্যবহার করতেন। কিন্তু তিনি এক নূতন কৌশল অবলম্বন করে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন হাতীদের সার্থকতা। তার ফলে ভারতীয় ফৌজের রণহস্তীরা হয়ে উঠত ভারতীয়দের পক্ষেই অধিকতর বিপজ্জনক)।

চন্দ্রগুপ্তের প্রত্যেক অশ্বারোহীর কাছে থাকত একখানা ক'রে ঢাল ও দু'টি করে বল্লম। পদাতিকদের প্রধান অস্ত্র ছিল চওড়া ফলকওয়ালা তরবারি এবং অতিরিক্ত অস্ত্ররূপে তারা সঙ্গে নিত শূল বা ধনুকবাণ। আমরা এখন যে-ভাবে বাণ ছুঁড়ি, তারা সে-ভাবে ছুঁড়ত না। গ্রীক ঐতিহাসিক এরিয়্যান বলেন, ভারতীয় সৈনিকরা ধনুকের এক প্রান্ত মাটির উপরে রেখে, বাম পায়ের চাপ দিয়ে এমন ভয়ানক জোরে বাণ

ত্যাগ করত যে, শত্রুদের ঢাল ও লৌহবর্ম পর্যন্ত কোন কাজে লাগত না। বোঝা যাচ্ছে, সেকালের ভারতীয় ধনুক হ'ত আকারে রীতিমত বৃহৎ।

হর্ষবর্ধনের যুগেও ভারতীয় বাহিনী যে প্রায় ঐ ভাগেই গঠন করা হ'ত, এটুকু অনুমান করা যেতে পারে। কিন্তু তিনি ভারতীয় বাহিনীর চতুরঙ্গ থেকে বাদ দিয়েছিলেন প্রধান একটি অঙ্গ। যে কারণেই হোক, তিনি রথারোহী সৈন্য পছন্দ করতেন না, তাঁর সঙ্গে রথ থাকত না। তিনি যখন প্রথম দিগ্বিজয়ে যাত্রা করেন, তখন তাঁর সঙ্গে ছিল পাঁচ হাজার রণহস্তী, বিশ হাজার অশ্বারোহী ও পঞ্চাশ হাজার পদাতিক।

আরম্ভ হ'ল রাজপুত্র শিলাদিত্যের দিগ্বিজয়যাত্রা। পরিপূর্ণ হয়ে গেল আকাশ-বাতাস বিজয়ী বীরবৃন্দের জয়নাদ ও শত শত দামামার গম্ভীর মেঘ-গর্জনে, হাজার হাজার গজ ও অশ্বের পদভারে থরথর কাঁপতে লাগল পৃথিবীর বুক। চীনা পরিব্রাজক হিউ-এন সাঙের বর্ণনায় দেখি, সসৈন্য হর্ষবর্ধন ছুটে চলেছেন কখনো পশ্চিম দিকে এবং কখনো পূর্বাঞ্চলে, অবাধ্যদের দমন করতে করতে দিনের পর দিন যায়। হাতীদের পিঠে থেকে নামানো হয় না হাওদা, সৈনিকরা খোলবার অবকাশ পায় না শিরস্ত্রাণ।

দ্বাদশ

যুদ্ধের দুঃখ

এইভাবে কেটে গেল সাড়ে পাঁচ বৎসর।

ওদিকে আর্যাবর্তের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ এবং এদিকে বঙ্গদেশের অনেক অংশ হ'ল হর্ষবর্ধনের করতলগত। তিনি রীতিমত এক সাম্রাজ্যের অধিকারী।

তাঁর সামরিক শক্তিও হয়ে উঠেছে এখন অতুলনীয়। তিনি ইচ্ছা

করলেই যে কোন সময়ে ৬০ হাজার রণহস্তী, এক লক্ষ অশ্বারোহী ও তার চেয়ে বেশি পদাতিক নিয়ে অবতীর্ণ হ'তে পারেন রণক্ষেত্রে।

কিন্তু মগধ ও গৌড় থেকে আসছে দুঃসংবাদের পর দুঃসংবাদ। শৈব নরপতি শশাঙ্কের অত্যাচারে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা অত্যন্ত আর্ত ও বিপদগ্রস্ত হয়ে উঠেছেন।

মধ্য-ভারতে পরাজিত হয়েও শশাঙ্ক স্বরাজ্যে নিজের প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন। তিনি কেবল বুদ্ধগয়া, পাটলিপুত্র ও কুশীনগরের বৌদ্ধ বিদ্রোহীদের দমন ক'রেই ক্ষান্ত হননি, উপরন্তু পবিত্র বোধিদ্রুম উৎপাটিত এবং বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন ও বহু বৌদ্ধকীর্তিও নষ্ট ক'রে ফেলেছেন। বৌদ্ধরা পালিয়ে গিয়ে নেপালের পর্বতমালার মধ্যে আশ্রয় নিয়েও শশাঙ্কের কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে পারছেন না।

বৌদ্ধধর্মের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগ থাকলেও বুদ্ধিমান হর্ষের এটা বুঝতে বিশেষ বিলম্ব হ'ল না যে, অতঃপর তাঁর প্রথম কর্তব্য হচ্ছে স্বরাজ্যে ফিরে গিয়ে প্রকাশ্যে রাজা-উপাধি গ্রহণ ও রাজমুকুট ধারণ করা। এত দিন তাঁকে নাবালক ভেবে যারা বিরুদ্ধতা করে আসছিল, এইবারে তারা বিশেষভাবে অনুভব করতে পেরেছে তাঁর সবল বীরবাহুর শক্তি। তাঁর অঙ্গুলি-তাড়নায় বৃহত্তর আর্যাবর্ত আজ মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছে, বিনা বাধায় সিংহাসন অধিকার করবার এমন সুযোগ ত্যাগ করা উচিত নয়। শশাঙ্ক? সে তো হচ্ছে পলাতক সর্প, নিজের বিবর ত্যাগ ক'রে বাইরে আসবার সাহস আর তার হবে না। আগে নিজের সিংহাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় করি, তার পর তাকে শাসন করতে বেশি দিন লাগবে না।

প্রায় ছয় বৎসর পরে বিজয়ী বীর হর্ষবর্ধন আবার ফিরে এলেন স্থানেশ্বরে। প্রজারা তাঁর অভ্যর্থনার আয়োজন করলে মহাসমারোহে। রাজপথে বিপুল জনতা, প্রত্যেক ভবন পত্র-পুষ্প-পতাকায় অলঙ্কিত, পুরনারীরা অলিন্দে দাঁড়িয়ে শঙ্খধ্বনির সঙ্গে তরুণ রাজপুত্রের মাথার

উপরে ছড়িয়ে দিচ্ছেন লাজাঞ্জলি। সকলের চক্ষে উৎসাহ, মুখে হাসি ও কণ্ঠে জয়ধ্বনি। স্থানেশ্বর আজ শিলাদিত্যের অপূর্ব বীরত্বের জন্যে গর্বিত, শত্রুরাও গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে নিশ্চেষ্ট মৌনব্রত।

কবিবন্ধু বাণভট্ট এসে হাস্যমুখে বললেন, 'রাজপুত্র শিলাদিত্য, আমার অভিনন্দন গ্রহণ কর।'

হর্ষবর্ধন বললেন, 'কবি, তোমার অভিনন্দন লাভ ক'রে মহারাজাধিরাজ হর্ষবর্ধন যুদ্ধজয়ের চেয়ে বেশী গৌরব অনুভব করছেন।'

বাণভট্ট দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বললে, 'মহারাজাধিরাজ হর্ষবর্ধন'!

—'হ্যাঁ বন্ধু, রাজপুত্র শিলাদিত্য এর পর থেকে ঐ নামেই পৃথিবীতে পরিচিত হবেন।'

বাণভট্ট উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ব'লে উঠলেন, 'জয় মহারাজাধিরাজ হর্ষবর্ধনের জয়।'

হর্ষবর্ধন অগ্রসর হয়ে বাণভট্টের স্কন্ধে একখানি হাত রেখে স্নিগ্ধস্বরে বললেন, 'কিন্তু কবি, রাজ্যের চেয়ে কাব্য—আর রাজার চেয়ে কবি বড়। মহারাজা বিক্রমাদিত্য যত দিন বেঁচে ছিলেন, নিজের রাজ্যে নিজেদের প্রজাদের পূজা পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর সভাকবি কালিদাস সর্বযুগের সর্বদেশের পূজা থেকে বঞ্চিত হবেন না। এ রাজ্যের বাইরের লোকদের কাছে আমি মহারাজাধিরাজ বটে, কিন্তু তুমি যে আমার মনের মানুষ, তোমার কাছে আমি শ্রীহর্ষ ছাড়া আর কেউ নই।'

—'খালি শ্রীহর্ষ নয়, তুমি হচ্ছ মহাকবি শ্রীহর্ষ। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি, পৃথিবীর দেশে দেশে তুমি ঐ নামেই অমর হয়ে থাকবে।'

—দুঃখের কথা বন্ধু, বেঁচে থেকে কেউ নিজের অমরত্বের সঠিক প্রমাণ পায় না। তাকে অমর করে ভবিষ্যতের মানুষ।'

—'কিন্তু মহারাজ, তোমার অমরত্বের প্রমাণ পেয়েছি আমি বর্তমানেই। আমি কি তোমার রচনা পাঠ করিনি? তার ছত্রে ছত্রে আছে যে অমরত্বের নিশ্চিত নিদর্শন।'

হর্ষবর্ধন হাসতে হাসতে বললেন, 'তোমার মুখে এ কথা শুনলে

লোকে বলবে চাটুবাদ।'

—'লোকের কথায় আমি কান দিই না। কিন্তু তুমি বিশ্বাস কোরো মহারাজ, এ হচ্ছে আমার আন্তরিক কথা।'

—'উত্তম, তা'হলে তোমাকে পুরস্কৃত করবার জন্যে তোমার উদর-গহ্বর পরিপূর্ণ ক'রে দেব আমি মিষ্টান্নের স্তূপে। যাই বন্ধু, গুরুতর রাজকার্য আছে।'

হর্ষবর্ধনের প্রস্থান। সেনাপতি সিংহনাদের প্রবেশ। এসেই বললেন, 'মহারাজা মিষ্টান্নের কথা কি বলছিলেন না?'

—'হ্যাঁ। তিনি বলছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতি সিংহনাদকে মিষ্টান্ন জোগাতে জোগাতে তাঁর প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ হয়েছে।'

ঘন ঘন ঘাড় নেড়ে সিংহনাদ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ব'লে উঠলেন, 'না, মহারাজা এ কথা বলতে পারেন না, এ হচ্ছে তোমারই বানানো কথা। কলম নেড়ে কালি মেখে দিন কাটাও, তুমি কি বুঝবে হে যুদ্ধক্ষেত্রের কথা? সেখানকার অদ্বিতীয় নীতি হচ্ছে—হয় মারো, নয় মরো। সেখানে থাকে কেবল রক্ত আর মড়া, মিষ্ট বা তিক্ত কোন রকম অন্নই সেখানে পাওয়া যায় না—বুঝলে?'

—'না বুঝলুম না।'

—'এমন সোজা কথাটা বুঝলে না।'

—'উঁহু।'

—'মানে?'

—'বললে, যুদ্ধক্ষেত্রে অন্ন পাওয়া যায় না: তাহলে তোমরা ভক্ষণ করতে কি? বায়ু?'

—'যা ভক্ষণ করতুম তা বায়ু না হ'লেও মোটেই আহার্য ব'লে স্বীকার করা যায় না। তোমাদের ঘাসের রুটি খাওয়ার অভ্যাস আছে?'

—'থু, থু, রামচন্দ্র! তাও আবার মানুষ খায় না কি?'

—'সময়ে সময়ে তাও আমাদের অমৃত ব'লে গ্রহণ করতে হয়েছে।'

—'তাহ'লে যুদ্ধক্ষেত্রটা তো দেখছি ভারি খারাপ জায়গা।'

—'খারাপ ব'লে খারাপ, একেবারে জঘন্য।'

—'আহা, তোমার জন্য আমি দুঃখিত।'

—'ভায়া, সাড়ে পাঁচ বছর আগে আমার উদরদেশটি ছিল এমন প্রশস্ত যে গৃহস্থেরা আমাকে নিমন্ত্রণ করতে ভয় পেত। কিন্তু আজ তার অবস্থা দেখছ?'

—'কই, আমি তো উদরদেশের কিছুই নিরীক্ষণ করতে পারছি না।

—'তুমি ভাসা-ভাসা চোখে খালি উদরের উপরটাই লক্ষ্য করছ। কিন্তু কুখাদ্য আর অখাদ্য খেয়ে খেয়ে এর ভিতরটা হয়ে গেছে শুকিয়ে এতটুকু।'

—'তাই তো, তুমি আমাকে ভাবালে।'

—'কেন?'

—'মহারাজা এই মাত্র ব'লে গেলেন, আমার জন্যে প্রচুর মিষ্টান্ন পাঠিয়ে দেবেন। ভেবেছিলুম তোমাকে নিমন্ত্রণ করব। কিন্তু তোমার শুক্‌নো নাড়ীতে সুখাদ্য সহ্য হবে কি?'

—'কেন হবে না, আমি প্রাণপণে সহ্য করবার চেষ্টা করব। নিমন্ত্রণ থেকে আমাকে বাদ দিও না দাদা।'

—'বেশ তবে নিমন্ত্রণ রইল।'

—'ধন্যবাদ।'

ত্রয়োদশ

ভিখারী হর্ষবর্ধন

আর্যাবর্তে আবার ফিরে এল রাম রাজত্ব।

হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্ত ছিল আরব সাগর। জলন্ধর ও নেপাল ছিল উত্তর সীমান্ত এবং তার দক্ষিণ সীমান্ত দিয়ে প্রবাহিত

হত নর্মদা নদী। এমন প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য পাঁচ-সাত বৎসরে হর্ষবর্ধনের হস্তগত হয়নি। আর্যাবর্তকে একই ছত্রের ছায়ায় আনতে তাঁর কেটে গিয়েছিল সুদীর্ঘ সাঁইত্রিশ বৎসর কাল।

কিন্তু কেবল অসি নয়, মসীকেও করেননি তিনি অবহেলা। যখনই অবকাশ পেতেন বাণভট্টের সঙ্গে করতেন কাব্য আলোচনা এবং একান্ত সাহিত্য সাধনার ভিতর দিয়ে তাঁর কেটে যেত দিনের পর দিন। তাঁর বিচিত্র সাহিত্য সাধনার অমর নিদর্শন আছে তিনখানি সুবিখ্যাত নাটকের মধ্যে—'নাগানন্দ', 'রত্নাবলী' ও 'প্রিয়দর্শিকা'। তিনি কবি হ'লেও তাঁর ব্যাকরণ সম্পর্কীয় রচনাও আছে এবং সুন্দর হস্তাক্ষরের জন্যে তাঁর নাম খুব বিখ্যাত। তাঁর হস্তাক্ষরের নমুনা আজও বিদ্যমান আছে।

উপরন্তু তিনি কেবল নাট্যকার নন, অভিনেতাও ছিলেন। স্বরচিত নাটকে ভূমিকা গ্রহণ ক'রে অবতীর্ণ হ'তেন রঙ্গমঞ্চে। বোঝা যাচ্ছে, তাঁর প্রতিভা ছিল সর্বতোমুখী।

পরামর্শ দেবার জন্যে মন্ত্রীরা ছিলেন বটে, কিন্তু রাজ্যচালনা করতেন তিনি স্বয়ং। প্রজাদের ভালোমন্দ দেখতেন স্বচক্ষে এবং তাদের অভিযোগ শ্রবণ করতেন স্বকর্ণে।

স্থানেশ্বর থেকে তিনি রাজধানী তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন কান্যকুব্‌জে—সেখানকার মহারাণী ছিলেন তাঁর সহোদরা রাজশ্রীদেবী। কিন্তু রাজকার্যের জন্যে রাজধানীতে তিনি স্থির হয়ে ব'সে থাকতে পারতেন না। দেশে দেশে যুদ্ধক্ষেত্রে করতেন যোদ্ধার কর্তব্য পালন এবং অসি যখন কোষবদ্ধ হ'ত তখন তিনি করতেন রাজধর্ম পালন। বর্ষাকাল ছাড়া বৎসরের আর সব সময়েই সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে তিনি ভ্রমণ করতেন যাযাবরের মত। অসাধুকে দিতেন শাস্তি, সাধুকে দিতেন পুরস্কার।

দেশ থেকে দেশান্তরে যাবার ব্যবস্থা ছিল এই রকম। হর্ষবর্ধন ভ্রমণের জন্যে লতা-পাতা-শাখা দিয়ে তৈরি করিয়ে নিতেন একটি চলন্ত

প্রাসাদ। যখন যেখানে গিয়ে থামতেন, তখন সেইখানেই ঐ প্রাসাদ স্থাপন করা হ'ত এবং তিনি তা ত্যাগ করলে সেটিকে পুড়িয়ে ফেলা হ'ত।

তাঁর সঙ্গী হ'ত হাজার হাজার লোকজন। এবং কয়েক শত দামামা-বাদক। তারা রাজার প্রত্যেক পদক্ষেপের তালে তালে বাজিয়ে চলত শত শত সোনার দামামা। অর্থাৎ রাজা যদি একশো বার পা ফেলতেন, তাদের দামামা বাজাতে হ'ত একশো বার। আর্যাবর্তের আর কোন সামন্ত-রাজার এই অধিকার ছিল না।

হর্ষবর্ধনের যুগে অপরাধীদের শাস্তি দেবার পদ্ধতি ছিল যথেষ্ট নিষ্ঠুর। গুরুতর অপরাধের জন্য যারা ধরা পড়ত তাদের অবস্থা হ'ত রীতিমত শোচনীয়। তাদের মানুষ ব'লে গণ্য করা হ'ত না। কেউ তাদের সাহায্য করতে পারত না। মানুষের বসতির বাইরে নিয়ে গিয়ে তাদের ফেলে দিয়ে আসা হ'ত, তারা কেমন ক'রে বাঁচবে বা মরবে তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামানো দরকার মনে করত না।

কোন কোন অপরাধের জন্যে নাক, কান, হাত বা পা কেটে নেওয়া হ'ত। ছেলে পিতামাতার প্রতি কর্তব্য পালন না করলেও এই রকম শাস্তিলাভ করত কিংবা কখনো কখনো লাভ করত নির্বাসন দণ্ড। লঘু পাপের জন্যে দিতে হত জরিমানা।

জল বা অগ্নি পরীক্ষারও চলন ছিল। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গভীর জলে বা জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হ'ত। ডুবে গেলে বা পুড়ে মরলে ধ'রে নেওয়া হ'ত সত্য সত্যই তারা অপরাধী। কে জানে এইভাবে মারা পড়ত কত নিরপরাধ।

আগেই বলা হয়েছে, হর্ষবর্ধন শিবকেও পূজা করতেন, সূর্যকেও মানতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্মেরও প্রতি ছিল তাঁর অটল ভক্তি। তিনি তাই নিয়মিতভাবে মঠ ও মন্দিরের জন্যে করতেন অর্থব্যয়।

আধুনিক বিহার প্রদেশে নালন্দা নামে এক বিখ্যাত মঠ ছিল, সেখানে কেবল বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা বাস করতেন না। তার মধ্যে ছিল

প্রকাণ্ড এক বিশ্ববিদ্যালয়। হর্ষবর্ধনের যুগে সেখানে থেকে লেখাপড়া করত দশ হাজার ছাত্র। প্রতিদিন সেখানে একশত বেদী প্রতিষ্ঠিত হত এবং তার উপরে উপবিষ্ট হয়ে এক শত অধ্যাপক করতেন নানা শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা। জ্ঞানার্জনের জন্য ছাত্রদের আগ্রহ ছিল এমন গভীর যে অধ্যাপনার সময়ে তাদের কেউ এক মিনিটের জন্যও অনুপস্থিত থাকিত না।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য রাজা দান করেছিলেন একশত খানি গ্রাম। তারই আয় থেকে ছাত্রদের সমস্ত ব্যয় সঙ্কুলান হত, ফলে তারা শিক্ষাগ্রহণ করতে পারত পরম নিশ্চিন্তভাবে।

প্রতি চার বৎসর অন্তর হর্ষবর্ধন আর একটি এমন কর্তব্য পালন করতেন, পৃথিবীব আর কোন রাজা আজ পর্যন্ত তা করতে পারেন নি। আধুনিক এলাহাবাদে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে এখন যেখানে কুম্ভমেলার অনুষ্ঠান হয়, হর্ষবর্ধন সেখানে গিয়ে উপস্থিত হতেন সদলবলে। তার পরে গত চার বৎসর ধরে রাজভাণ্ডারে যত ঐশ্বর্য সংগৃহীত হত, তা নিঃশেষে দান করতেন সমাগত প্রার্থীগণকে।

হর্ষবর্ধন যখন নিজের সাম্রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত, সেই সময়ে (৬৪৩ খৃষ্টাব্দে) চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ-এর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। প্রয়াগের (বা এলাহাবাদের) সেই বিচিত্র দানোৎসবে হুয়েন সাঙ নিজে উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্বচক্ষে সমস্ত দেখে যা বলেছেন তার সারমর্ম হচ্ছে এই :

গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে এসে সমবেত হয়েছেন হর্ষবর্ধনের সঙ্গে অসংখ্য রাজকর্মচারী, অনুচর, সৈন্য ও সামন্ত-রাজার দল। নির্দিষ্ট দিনে সেখানে এসে উপস্থিত হ'ল বিরাট এক জনতা—তার মধ্যে ছিল বহু নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ ও নানা ধর্মাবলম্বী সাধু-সন্ন্যাসী এবং অনাহূত ও রবাহূত অনাথ ও ভিখারীর দল—সংখ্যায় তারা পাঁচ লক্ষের কম হবে না।

হুয়েন সাঙকে সম্বোধন ক'রে হর্ষবর্ধন বললেন, 'পরিব্রাজক,

আমাদের বংশে পুরুষানুক্রমে একটি রীতি পালন করা হয়। সেই রীতি অনুসারে প্রতি পঞ্চম বৎসরে আমি প্রয়াগের এই পুণ্যতীর্থে এসে, আমার সঞ্চিত সমস্ত ঐহিক সম্পত্তি জাতিধর্মনির্বিশেষে দান ক'রে যাই। আজ ত্রিশ বৎসর ধ'রে আমি এই কর্তব্য পালন ক'রে আসছি। এবারে আমার ষষ্ঠ দানযজ্ঞ।'

দুই মাস পনের দিন ধ'রে চলল সেই অসাধারণ দানোৎসব।

উৎসবের প্রারম্ভে দেখা গেল, সানুচর সামন্ত-রাজগণের সুদীর্ঘ শোভাযাত্রা। সে এক বর্ণবহুল ও ঐশ্বর্যময় অতুলনীয় দৃশ্য, কারণ আপন আপন রাজকীয় মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে কোন রাজাই প্রাণপণ চেষ্টার ত্রুটি করেননি।

পাঁচ লক্ষ দর্শকের মাঝখানে উচ্চাসনের উপরে ব'সে আছেন মহারাজাধিরাজ হর্ষবর্ধন। তাঁর দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্টা রাজশ্রীদেবী। তার পর যথাযোগ্য নির্দিষ্ট স্থানে আসন গ্রহণ করেছেন অমাত্য ও পদস্থ রাজকর্মচারিগণ, সভাকবি বাণভট্ট ও অন্যান্য পণ্ডিতগণ।

প্রথম দিনে বুদ্ধদেবকে স্মরণ ক'রে দান-কার্য আরম্ভ হ'ল। নদীর তটে একটি পর্ণকুটীরের মধ্যে স্থাপন করা হ'ল বুদ্ধদেবের মূর্তি। তারপর দুই হাতে বিলি করা হ'ল মূল্যবান সাজ-পোশাক ও অন্যান্য উপহার।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন হচ্ছে যথাক্রমে সূর্য ও শিবের দিন। কিন্তু বুদ্ধদেবের দিনে যত জিনিস দান করা হয়েছিল, এই দুই দিনের দানের পরিমাণ তার আধা-আধির বেশি হ'ল না।

চতুর্থ দিবসে দান গ্রহণ করতে এলেন দশ হাজার নির্বাচিত বৌদ্ধ ধার্মিক। তাঁরা প্রত্যেকে লাভ করলেন এক শত স্বর্ণমুদ্রা, একটি মুক্তা, একটি তুলার পোশাক এবং বাছা বাছা খাদ্যসামগ্রী, পানীয়, ফুল ও গন্ধদ্রব্য।

তারপর বিশ দিন ধ'রে কাতারে কাতারে ব্রাহ্মণদের দল এল দান গ্রহণ করতে। ব্রাহ্মণদের পর জৈন এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের পালা। তাঁদের তুষ্ট করতে লাগল পুরো দশটি দিন। বহু দূরদেশ থেকে

যেসব শ্রমণ এখানে এসে জুটেছিলেন মধুলোভী ভ্রমরের মত, তাঁরাও আরো দশ দিনের আগে খুশি হলেন না। তারপর গোটা এক মাস ধ'রে দান নিয়ে গেল লক্ষ লক্ষ দরিদ্র, অনাথ, পঙ্গু ও ভিক্ষুকের দল।

এইভাবে অকাতরে দান করতে করতে রাজভাণ্ডারে পাঁচ বৎসরের সঞ্চিত অর্থ একেবারে ফুরিয়ে গেল। হস্তী, অশ্ব ও সামরিক সাজসজ্জা ছাড়া রাজার নিজস্ব সম্পত্তি আর কিছুই রইল না। কিন্তু ও-গুলিকে দানসামগ্রী ব'লে গণ্য করা চলে না, কারণ রাজ্যচালনা অসম্ভব হয়ে উঠবে তাদের অভাবে।

হর্ষবর্ধন তখন সিংহাসন ছেড়ে নেমে এসে নিজের গা থেকে মণিমাণিক্যখচিত মুকুট, জড়োয়ার কণ্ঠহার, মৌলিমালা, কর্ণের কুণ্ডল ও বাহুর বলয় প্রভৃতি—এমন কি রাজপরিচ্ছদ পর্যন্ত খুলে বিলিয়ে দিলেন হাসিমুখে।

তারপর রাজশ্রীদেবীর দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'দিদি, আজ আমি সর্বহারা। আমার লজ্জা রক্ষা হয়, তোমার কাছে এমন বস্ত্র ভিক্ষা করি।'

রাজশ্রী তখন সেই আশ্চর্য রাজভিখারীর দিকে এগিয়ে দিলেন একটি আটপৌরে পুরাতন পোশাক।

সেই পোশাক প'রে হর্ষবর্ধন প্রশান্ত মুখে প্রথমে দশ দিকের বুদ্ধদেবের উদ্দেশে বন্দনা ও প্রণাম করলেন। তারপর পবিত্র আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে জোড়হস্তে বললেন, 'এই বিপুল ঐশ্বর্য সুরক্ষিত স্থানে পুঞ্জীভূত ক'রেও আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারতুম না কিন্তু আজ আমি পরম নিশ্চিন্ত। ধর্মের নামে যা দান করলুম, তা রক্ষিত হ'ল যথাযোগ্য স্থানেই। আহা, ভবিষ্যতে আমি যেন জন্মে জন্মে এইভাবে দান ক'রে বুদ্ধদেবের কৃপালাভ ক'রে ধন্য হ'তে পারি।'

ঐতিহাসিক হর্ষবর্ধনের এই কল্পনাতীত দানশীলতার দৃষ্টান্ত দেখে বেশ বোঝা যায়, পৌরাণিক দাতাকর্ণের কাহিনী অবিশ্বাস্য নয়। সম্রাট অশোকও যাপন ক'রে গিয়েছেন সর্বহারা ভিক্ষুর জীবন। তাঁর

পিতামহ সম্রাট চন্দ্রগুপ্তও নিজের পূর্ণ গৌরবের সময়ে স্বেচ্ছায় সিংহাসন ছেড়ে সন্ন্যাস নিয়ে প্রাণত্যাগ করেছিলেন প্রয়োপবেশনে। অদ্ভুত দেশ

এই ভারতবর্ষ। এখানকার মাটিতে যা জন্মায়, অন্য কোন দেশ তা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে না।

কিন্তু রাজর্ষি হর্ষবর্ধন বারে বারে এইভাবে সর্বহারা হয়েও সকলকে খুশি করতে পারেননি। বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ দেখে বৌদ্ধরা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলত, 'জয়, রাজাধিরাজ হর্ষবর্ধনের জয়। রাজর্ষি অশোকই আবার হর্ষবর্ধনের মূর্তি ধারণ ক'রে অবতীর্ণ হয়েছেন ধরাধামে।'

কিন্তু ব্রাহ্মণরা হাসিমুখে তাঁর দান গ্রহণ ক'রেও তাঁকে দুই চক্ষে দেখতে পারত না। হিন্দু রাজার এই বৌদ্ধপ্রীতি তাদের কাছে অস্বাভাবিক ও অন্যায় ব'লেই মনে হ'ত। হর্ষবর্ধনের বিরুদ্ধে তারা চক্রান্ত করতে লাগল। এবং আর্যাবর্তে বিদ্রোহের আগুন জ্বালবার জন্যে গোপনে ইন্ধন যোগাতে লাগল হর্ষেরই এক মন্ত্রী, অর্জুনাশ্ব।

ইতিমধ্যে ঘটেছে কয়েকটি প্রধান ঘটনা।

মগধ-গৌড়ের মহারাজা শশাঙ্কের মৃত্যু হয়েছে (সম্ভবত ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দের পরে)। তাঁর রাজ্য এসেছে হর্ষবর্ধনের অধিকারে।

শশাঙ্কের বন্ধু চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীকে আক্রমণ করতে গিয়ে হর্ষবর্ধন নিজেই পরাজিত হয়েছেন (৬২০ খ্রীষ্টাব্দে)। তারপর তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর দাক্ষিণাত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করেনি।

৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে হর্ষবর্ধন গঞ্জামে গিয়ে শেষ যুদ্ধ ক'রে তরবারি ত্যাগ করেছেন। তিনি হয়েছেন অহিংসার উপাসক।

গঞ্জামে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন চীনা পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ।

চতুর্দশ

ভগ্নপ্রাণ সম্রাট

পুষ্পিত বকুল গাছের স্নিগ্ধ ছায়ায় একটি মর্মর বেদী, তারই উপরে বসে রাজকবি বাণভট্ট একমনে 'হর্ষচরিত' রচনায় নিযুক্ত হয়ে আছেন।

এমন সময়ে সেনাপতি সিংহনাদ সেখানে এসে উচ্চকণ্ঠে ডাকলেন, 'ওহে বাণভট্ট!'

বাণভট্ট মুখ তুলে বললেন, 'ব্যাপার কি? কাব্যকুঞ্জবনে মত্তহস্তীর প্রবেশ কেন?'

সিংহনাদ বললেন, 'একে তো তোমাদের মত মেয়েলি কবিদের পাল্লায় প'ড়ে মহারাজা অসি ছেড়ে মসীর ভক্ত হয়েছেন, তার উপরে ঐ চীনা পরিব্রাজকটা এসে আমাদের অন্ন যে একেবারে মারবার চেষ্টা করছে, সে খবর রাখো কি?'

—'তুমি পরিব্রাজক হুয়েন সাঙয়ের কথা বলছ?'

—'হ্যাঁ গো, হ্যাঁ! সে যে মহারাজকে নিজের হাতের মুঠোর ভিতরে পুরে ফেলেছে!'

—'পরিব্রাজকের হাতের মুঠো এমন প্রকাণ্ড যে তার মধ্যে আমাদের এত বড় মহারাজার স্থান সংকুলান হয়েছে?'

—'তা ছাড়া আর কি বলি বল? ঐ চীনা পরিব্রাজক যাদু জানে হে, যাদু জানে! মহারাজা এত দিন হীনযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাতেন, প্রজারা তা পছন্দ না করলেও কোন রকমে সহ্য ক'রে থাকত। কিন্তু ঐ চীনা পরিব্রাজকের পরামর্শে মহারাজা এখন মহাযান সম্প্রদায়কেও মাথায় তুলতে চান। আহার নেই, নিদ্রা নেই,—দিন-রাত তিনি 'বুদ্ধ বুদ্ধ' ক'রে পাগল। হিন্দু হয়েও তিনি

বুদ্ধের পায়ে দাসখৎ লিখে দিয়েছেন। তাঁর কড়া হুকুম হয়েছে, সাম্রাজ্যের কোথাও আর জীবহিংসা করা চলবে না। যে আমিষ খাবে তার প্রাণদণ্ড অনিবার্য।'

বাণভট্ট হেসে বললেন, 'এ জন্যে তুমি উত্তেজিত হচ্ছ কেন বন্ধু? মহারাজা তোমার বেতন বন্ধ ক'রে দেবার আদেশ তো দেননি?'

—'বাণভট্ট, তুমি হচ্ছ একটি আস্ত পণ্ডিত-মূর্খ! বেতন এখনো পাচ্ছি বটে, কিন্তু তার পর? আমরা তোমাদের মত শাস্ত্রজীবী নই, আমরা হচ্ছি অস্ত্রজীবী। কিন্তু রাজ্যের সকলকেই যদি অহিংসার সাধনা করতে হয়, তাহ'লে তো সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রই হবে ব্যর্থ! সে ক্ষেত্রে, অস্ত্রজীবীদের অকারণে বসিয়ে বসিয়ে মাহিনা দিয়ে পুষে রাখবেন, আমাদের মহারাজা এতটা নির্বোধ নন।'

বাণভট্ট বললেন, 'সিংহনাদ ভায়া, তোমার আর্তনাদ থামাও। তুমি কি বলতে চাও, অহিংসা বলতে বোঝায়, সাপ কামড়াতে এলেও আমরা তাকে মারতে পারব না? কোন শত্রু দেশ আক্রমণ করতে এলেও আমাদের মহারাজা হাত গুটিয়ে বুক পেতে দেবেন?'
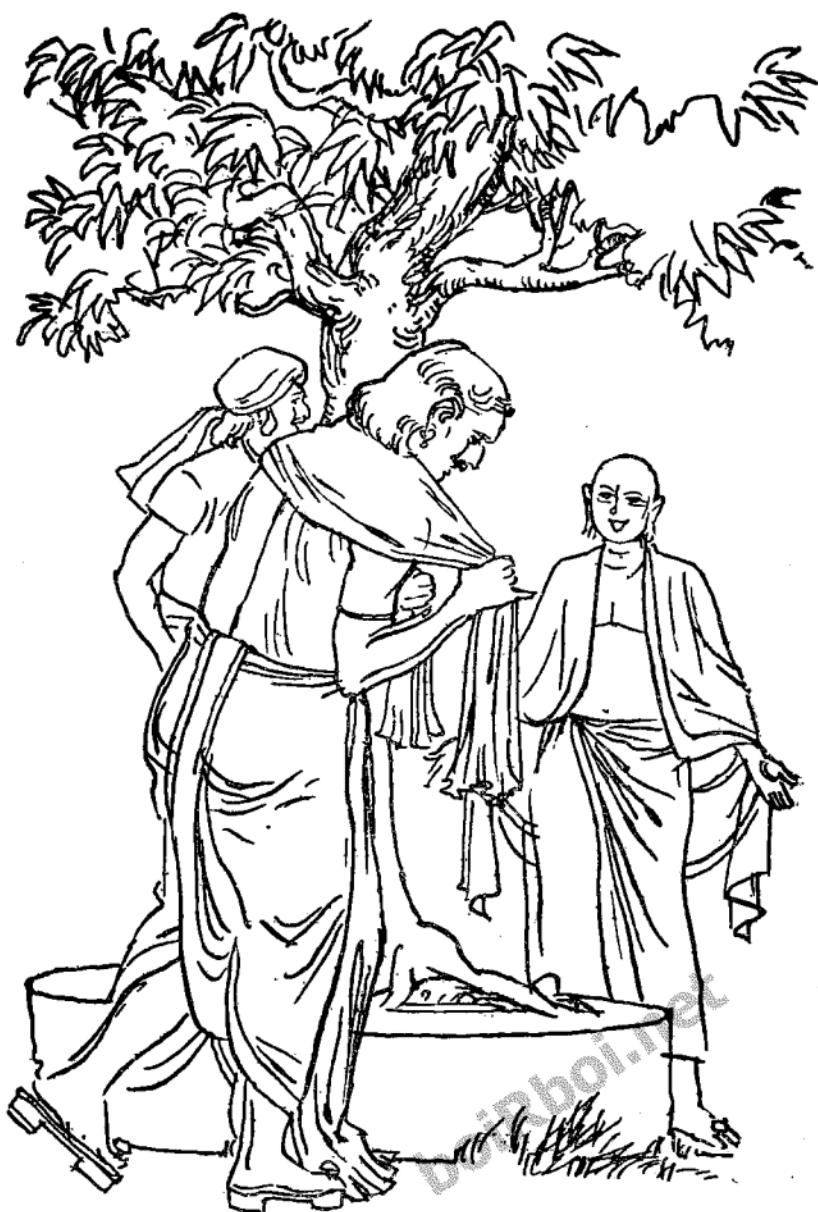
সিংহনাদ মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন, 'কি জানি ভাই, আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে!'

বাণভট্ট সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান ক'রে বললেন, 'তাহ'লে তোমার সন্দেহ-ভঞ্জন কর; ঐ দেখ, মহারাজা নিজেই এই দিকে আসছেন।'

হর্ষবর্ধন আসতে আসতে হাসতে হাসতে বললেন, 'এক আসরে অসি আর মসীর সেবক! লক্ষণ তো ভালো নয়! কিন্তু মনকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে কিছুক্ষণ কাব্যগুঞ্জনে যোগ দিতে এলুম, কিন্তু এখানেও নতুন কোন ষড়যন্ত্রের আয়োজন হচ্ছে না কি?'

—'ষড়যন্ত্র মহারাজ?'

—'হ্যাঁ বন্ধু ষড়যন্ত্র—ষড়যন্ত্র—আমার বিরুদ্ধে চারিদিকেই চলছে বিষম ষড়যন্ত্র! তুমি কি এরই মধ্যে সব কথা ভুলে গেলে? রাজধানীর পরিব্রাজক হুয়েন সাঙয়ের ধর্মোপদেশ শোনবার জন্যে আহ্বান

করেছিলুম বিরাট সভা। আমার আমন্ত্রণ রক্ষা করেছিল চার হাজার বৌদ্ধ শ্রমণ, তিন হাজার জৈন আর ব্রাহ্মণ। পবিত্র গঙ্গা-তটে বিপুল এক মঠ স্থাপন ক'রে আকাশচুম্বী দেউলের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলুম আমার দেহের সমান উঁচু বুদ্ধদেবকে। কয় দিন ধ'রে চলল মহোৎসব। আমন্ত্রিতদের আদর-আপ্যায়নের কোনই ত্রুটি হয় নি। বুদ্ধ, ধর্ম আর সংঘের সম্মান রক্ষার জন্যে চারিদিকে মুক্ত হস্তে ছড়িয়ে দিয়েছিলুম মণি-মুক্তা, স্বর্ণ-রৌপ্য। কিন্তু তার ফল হ'ল কি? আমি বৌদ্ধ-ধর্মের অনুরাগী ব'লে ব্রাহ্মণরা চক্রান্ত ক'রে মঠে আগুন ধরিয়ে দিলে। অনেক কষ্টে কোনক্রমে মঠের কতক অংশ রক্ষা পেল বটে, কিন্তু আমি নিজে হলুম এক নির্বোধ ব্রাহ্মণের দ্বারা আক্রান্ত। ভগবান বুদ্ধের কৃপায় সে যাত্রা রক্ষা পেলুম। তার পর জানা গেল, পাঁচ শত ব্রাহ্মণ লিপ্ত ছিল সেই হীন ষড়যন্ত্রে।'

বাণভট্ট বললেন, 'জানি মহারাজ, এত শীঘ্র সে ভীষণ ষড়যন্ত্রের কাহিনী ভুলিনি। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণের দল তো আজ নির্বাসিত?'

—'হ্যাঁ, কিন্তু রাজ্যে এখনো অসংখ্য দুরাত্মার অভাব নেই। নির-পরাধ, নির্বিরোধী পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ! ব্রাহ্মণরা তাঁকেও হত্যা করতে চায়, কেবল আমার জন্যেই তাদের সেই দুরভিসন্ধি সিদ্ধ হচ্ছে না। বোধ করি, এই সব দেখে-শুনেই পরিব্রাজক তাঁর স্বদেশে ফেরবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। আমিও সম্মতি না দিয়ে পারিনি। আগামী সপ্তাহেই পরিব্রাজক তাঁর স্বদেশের দিকে যাত্রা করবেন।'

বাণভট্ট বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ, পরিব্রাজকের উপরে দেশের লোক—বিশেষ ক'রে ব্রাহ্মণরা মোটেই খুশি নয় বটে।'

হর্ষবর্ধন বললেন, 'বন্ধু, তুমিও তো ব্রাহ্মণ?'

বাণভট্ট সহাস্যে বললেন, 'হ্যাঁ মহারাজ, আমি ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম-গ্রহণ করেছি বটে। কিন্তু কবি হয়ে আমি নিজের জাত খুইয়েছি।'

—'কি—রকম?'

—'কবির জাত নেই। কবির মানসী জন্মদান করে সর্ব জাতির

সর্বশ্রেণীর মানুষদের। কিবা রাজা, কিবা কাঙাল, কিবা ব্রাহ্মণ, কিবা চণ্ডাল—কবির আত্মীয়তা সকলের সঙ্গেই, কবির সহানুভূতি সকলেরই উপরে।'

হর্ষবর্ধন সানন্দে বললেন, 'সাধু কবি, সাধু! বন্ধু, রাজাও হচ্ছেন কবির মত—তাঁরও উচিত নয় জাত-বিচার করা। ব্রাহ্মণ থেকে চণ্ডাল পর্যন্ত সবাই তাঁর পুত্রস্থানীয়। প্রত্যেক ধর্মকেই সম্মান করা হচ্ছে রাজার কর্তব্য। কিন্তু সেই কর্তব্যই পালন করেছি ব'লে আজ আমার বিরুদ্ধে হচ্ছে এত ষড়যন্ত্র।'

সিংহনাদ বললেন, 'না মহারাজ, চীনা পরিব্রাজক দেশত্যাগ করলেই ব্রাহ্মণদের আপত্তির আর কোন কারণ থাকবে না।'

হর্ষবর্ধন তিক্ত স্বরে বললেন, 'তাই না কি? রাজ্যে এখন যুদ্ধবিগ্রহ নেই ব'লে নিশ্চয়ই আপনি দিবারাত্রব্যাপী নিদ্রাদেবীর সাধনা করছেন?'

সিংহনাদ আমতা আমতা ক'রে বললেন, 'না মহারাজ, না মহারাজ! যুদ্ধও নেই, পরিশ্রমও নেই। তাই আমি আজকাল অনিদ্রা রোগে ভুগছি।'

—'তবে এ-কথা শোনেননি কেন যে আমাকে হত্যা করবার জন্যে ব্রাহ্মণদের উত্তেজিত করেছিল আমারই অন্যতম অমাত্য অর্জুনাশ্ব?'

সিংহনাদ সচমকে বললেন, 'বলেন কি মহারাজ? কোথায় সেই পাষণ্ড? মহারাজের আদেশ পেলে আমি তাকে চুলের মুঠি ধ'রে এখানে টেনে আনতে পারি।'

—'পারবেন না সেনাপতি। অর্জুনাশ্ব আপনার চেয়ে নির্বোধ নয়। সে এখন পলাতক। তবে এইটুকু খবরও পেয়েছি, নির্বাসিত সেই পাঁচ শত ব্রাহ্মণের সঙ্গে মিলে অর্জুনাশ্ব আমার বিরুদ্ধে অসভ্য জাতিদের উত্তেজিত করবার চেষ্টা করছে। বন্ধু বাণভট্ট, আমার মন ভেঙে গিয়েছে।'

—'কেন মহারাজ?'

—'বৃদ্ধ হয়েছি, পরলোকের দরজা চোখের সামনেই খোলা রয়েছে।

সারা জীবন ধ'রে যাদের জন্যে এই বিশাল সাম্রাজ্য গঠন ক'রে গেলুম, আমার দানের অধিকারী হবার মত যোগ্যতা তাদের কোথায়? আমি অপুত্রক। আমার অবর্তমানে এই সাম্রাজ্যের কর্ণধার হবার মত কেউ নেই। অদূর ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি—অরাজকতা, রক্তপাত, অত্যাচার! আমার এত সাধের সার্থক স্বপ্ন, কোথায় মিলিয়ে যাবে শরতের লঘু মেঘের মত!'

পঞ্চদশ

তৈলহীন দীপ

মহারাজাধিরাজ শ্রীহর্ষবর্ধনের দুঃস্বপ্ন সত্যে পরিণত হ'তে বেশী দিন লাগল না।

চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন স্বদেশ যাত্রা করলেন, হাঁপ ছেড়ে বাঁচল আর্যাবর্তের বাসিন্দারা। এই বৌদ্ধ পরিব্রাজকের অন্ধ ভক্ত হয়ে হর্ষবর্ধন ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছিলেন গোঁড়া বৌদ্ধের মত। সেই জন্যে হুয়েন সাঙ হয়ে উঠেছিলেন দেশের লোকের চোখের বালির মত।

বুদ্ধভক্ত অহিংসাবাদী সম্রাট প্রিয়দর্শী অশোকের মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই বিশাল মৌর্য-সাম্রাজ্যের ভাঙন আরম্ভ হয় এবং তার পর অর্ধ শতাব্দী যেতে না যেতেই তা একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় (খ্রীঃ পূঃ ১৮৫)। আর্যাবর্তে হয় হিন্দু সাম্রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা।

ভারতে তখন হীনযান বৌদ্ধমত প্রচলিত ছিল। মৌর্য-সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয় বৌদ্ধ-ধর্মের অধঃপতন। শক বা কুশান সম্রাট কনিষ্কের (১২০—১৬০ খ্রীষ্টাব্দ) যুগে তা আবার মাথা তোলবার চেষ্টা করেছিল বটে, কিন্তু কনিষ্কের মৃত্যুর পরে বৌদ্ধ-ধর্মের উপরে ক্রমেই বেশী প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে হিন্দু-ধর্ম।

হর্ষবর্ধনের যুগে (৬০৬—৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দ) বৌদ্ধধর্মের যথেষ্ট অবনতি হ'লেও হুয়েন সাংয়ের বর্ণনায় দেখা যায়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন মঠ বা সঙ্ঘারামে তখনও বাস করতেন প্রায় তুই লক্ষ ভিক্ষু বা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। সুতরাং সে সময়ে গৃহী-বৌদ্ধের সংখ্যা যে অগুন্তি ছিল এটুকু অনুমান করা যেতে পারে অনায়াসেই।

বলা বাহুল্য, ওদের অধিকাংশই ছিল হীনযান সম্প্রদায়ের লোক। চৈনিক পরিব্রাজকের প্রভাবে প'ড়ে হর্ষবর্ধন গ্রহণ করলেন মহাযান সম্প্রদায়ের মত—যার প্রতি হীনযানীদের এতটুকু শ্রদ্ধা তো ছিলই না, উপরন্তু আক্রোশ ছিল যথেষ্ট। হিন্দুদের শাক্ত ও বৈষ্ণব এবং মুসলমানদের সিয়া ও সুন্নীদের মত তখনকার হীনযানী ও মহাযানী বৌদ্ধদেরও মধ্যে দলাদলি ও হানাহানির অন্ত ছিল না। কাজেই বৌদ্ধ ধর্মের অনুরাগী হয়েও হর্ষবর্ধন হীনযানীদের তুষ্ট করতে পারলেন না।

একই অহিংসার মন্ত্র গ্রহণ ক'রেও জৈনরা এখনকার মতন তখনও ছিলেন বৌদ্ধবিরোধী। হর্ষবর্ধনের বৌদ্ধ-প্রীতি তাঁরাও সহ্য করতে পারতেন না।

হিন্দুদের তো কথাই নেই। হর্ষবর্ধন পৈতৃক হিন্দুধর্ম ত্যাগ করেননি বটে, কিন্তু শিব ও সূর্যদেবের উপরে প্রাধান্য দিতেন বুদ্ধদেবকে। ব্রাহ্মণদের কাছে এটা ছিল অমার্জনীয় অপরাধ।

হর্ষবর্ধন সর্বধর্ম-সমন্বয়ের জন্যে চেষ্টা করেছিলেন কিনা এতদিন পরে তা জোর ক'রে বলা যায় না বটে, কিন্তু কি জৈন, কি হিন্দু—এমন কি বৌদ্ধ ধর্মেরও বৃহত্তর সম্প্রদায় পর্যন্ত তাঁর উপরে হয়ে উঠেছিল রীতিমত খড়গহস্ত।

হুয়েন সাঙ দেশে ফিরে গেলেন। লোকে কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে ভাবলে, হর্ষবর্ধন বোধ হয় বৌদ্ধদের নিয়ে আর বেশী বাড়াবাড়ি করবেন না।

সত্য কথা বলতে কি, হর্ষবর্ধন অল্পবিস্তর বাড়াবাড়ি করতেও বাকি রাখেন নি। বড় বড় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা হুয়েন সাঙয়ের মত অসার ও

ভ্রান্ত ব'লে প্রমাণিত করবার জন্যে প্রায়ই তাঁকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করতেন। সে সময়েও (এখনকার মত) তর্কের সময়ে হাতাহাতি হ'ত যথেষ্ট।

কিন্তু হর্ষবর্ধন তাঁর প্রিয়পাত্রের প্রতিযোগীকে জয়লাভ করবার সুযোগ দেবার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না।

তিনি ঘোষণা ক'রে দিয়েছিলেনঃ 'যে কোন ব্যক্তি চৈনিক গুরুর গায়ে হাত দেবে বা তাঁকে আহত করবে, তার প্রাণদণ্ড হবে। যে কোন ব্যক্তি তাঁর বিরুদ্ধে কথা কইবে, তার জিভ কেটে ফেলা হবে। আর যারা তাঁর উপদেশ-বাণী শুনে লাভবান হ'তে চায় তাদের কোন ভয় নেই।'

বলা বাহুল্য, এই ঘোষণার পর আর কোন সাহসী পণ্ডিত হুয়েন সাঙয়ের সঙ্গে তর্ক করতে অগ্রসর হননি। তর্কের খাতিরে জিহ্বাকে বলি দেবার জন্য কারুরই লোভ হ'তে পারে না।

কিছুদিন যায়। সাম্রাজ্যের কোথাও বহিঃশত্রু নেই। সিংহাসন নিষ্কণ্টক। বাণভট্টের সঙ্গে নিরুদ্বেগে কাব্যচর্চা করেন রাজকবি শ্রীহর্ষবর্ধন। এ-জীবনের মতন তিনি কোষবদ্ধ করেছেন তরবারিকে। তাঁর কাছে রাঙা রক্তের চেয়ে প্রিয় হয়ে উঠেছে কালো কালি।

বৌদ্ধ চীন সম্রাট হর্ষবর্ধনের সভায় এক রাজদূত পাঠালেন, নাম তাঁর ওয়াং-হিউএন-সি। দূতের সঙ্গে এল ত্রিশ জন অশ্বারোহী দেহরক্ষী।

আবার এক চীনা দূত! জনসাধারণের মনে নতুন ক'রে জেগে উঠল সন্দেহ ও অসন্তোষ। কে জানে, এই নবাগত কি গূঢ় উদ্দেশ্য নিয়ে পদার্পণ করেছে ভারতবর্ষে! এর কুমন্ত্রণা শুনে এবারে হিন্দুদের মুখে ভালো ক'রে কালি মাখাবার জন্যে মহারাজা হয়তো প্রকাশ্যেই গ্রহণ করবেন বৌদ্ধধর্ম!

পলাতক মন্ত্রী অর্জুনাশ্ব গোপনে কোথায় ব'সে দিন গুণছিল। এতদিন পরে এসেছে তার আত্মপ্রকাশের লগ্ন! সে রাজ্যের চারিদিকে

গুপ্তচর পাঠিয়ে দিলে। তারা চুপি-চুপি প্রচার ক'রে বেড়াতে লাগল, 'অতি বার্ধক্যে রাজার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, তিনি বৌদ্ধধর্ম

অবলম্বন ক'রে সনাতন হিন্দুধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করতে চান। প্রত্যেক হিন্দুর উচিত, এমন স্বধর্মবিদ্বেষী রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা।'

তারপর ভারতের দুর্ভাগ্য নিয়ে এল এক দুর্দিন।

এক সঙ্ঘারামে বুদ্ধদেবের সন্ধ্যারতি দেখে হর্ষবর্ধন প্রাসাদে ফিরে আসছিলেন।

অন্ধকার ফুঁড়ে যমদূতের মত বেরিয়ে এল এক দল অস্ত্রধারী লোক। তারা হর্ষবর্ধনকে আক্রমণ করলে একসঙ্গে।

রক্ষীরা প্রাণপণে বাধা দিলে, কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারলে না। দলে তারা হালকা।

মহারাজাধিরাজ শ্রীহর্ষবর্ধনের রক্তাক্ত দেহ পৃথিবীর কোলে শুয়ে ত্যাগ করলেন অন্তিম নিঃশ্বাস।

মহাভারতের শেষ মহাবীর! আর্যাবর্তের শেষ হিন্দু সম্রাট!

ষোড়শ

যোদ্ধা এবং কবি

কবি শ্রীহর্ষ, যোদ্ধা শ্রীহর্ষ, রাজর্ষি শ্রীহর্ষ। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ভাগ্যলক্ষ্মী হলেন আর্যাবর্তের নাট্যশালা থেকে অদৃশ্য।

বিশাল সাম্রাজ্য হয়ে গেল খণ্ড-বিখণ্ড। মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত, বিন্দুসার, অশোক, গুপ্তবংশীয় সমুদ্রগুপ্ত, চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্য, কুমারগুপ্ত, দেবগুপ্ত, মালবরাজ যশোধর্মদেব এবং সর্বশেষে স্থানেশ্বরের হর্ষবর্ধন। তারপর আর্যাবর্তে এমন কোন শক্তিধর মহাবীর আত্মপ্রকাশ করেন নি, যিনি সম্রাট উপাধি ধারণ করতে পারেন। প্রায় দুই শতাব্দী পরে (৮৪০—৮১০ খ্রীঃ) মিহির ভোজ কান্যকুব্জের সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন, উত্তরাপথের অধিকাংশই ছিল যাঁর করতলগত। কিন্তু ভাগ্যক্রমে তাঁর

যুগে মেগাস্থেনিস, ফাহিয়েন বা হুয়েন সাঙয়ের মতন বিদেশী রাজদূত বা পরিব্রাজক আর্যাবর্তে আসেননি এবং হরিষেণ বা বাণভট্টের মতন কবিও রাজসভা অলঙ্কৃত করেননি, কাজেই মহারাজাধিরাজ মিহির ভোজের কীর্তিকাহিনীর সঙ্গে ইতিহাস কোন পরিচয়ই স্থাপন করতে পারেনি। কথায় বলে 'কৃপাণের ঘরে শক্তিশালী হচ্ছে লেখনী'। ভুল কথা নয়; গ্রীক রাজদূত মেগাস্থেনিস না থাকলে মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের, কবি হরিষেণ না থাকলে সমুদ্রগুপ্তের, চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়েন না থাকলে চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যের এবং পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ ও কবি বাণভট্ট না থাকলে হর্ষবর্ধনের প্রকৃত পরিচয় ইতিহাস আজ জানতেই পারত না।

প্রামাণিক ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখি, হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর উত্তরাপথের দিকে দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন ক্ষুদে ক্ষুদে রাজার দল, পরস্পরের সঙ্গে মারামারি, কাটাকাটি ক'রেই তৃপ্ত হ'ত তাঁদের রাজধর্ম। একাধিক অপেক্ষাকৃত বৃহৎ রাজ্য ছিল বটে, কিন্তু সেগুলিকে সাম্রাজ্য ব'লে সন্দেহ করা চলে না। বড় বড় সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতবর্ষের বরাবরই হয়েছে এই একই দুরবস্থা এবং বরাবরই ঐ একতাহীনতা ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ভারতবর্ষের মধ্যে প্রবেশ করেছে পারসী, গ্রীক, শক, হূণ, মোগল ও ইংরেজ প্রভৃতি বিদেশী শত্রুরা। খৃষ্ট জন্মাবার তিন শত সাতাশ বৎসর আগে দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষে এসে দেখেছিলেন ঠিক এই বিসদৃশ দৃশ্যই। তারপর হর্ষবর্ধনের কয়েক শত বৎসর পরে মুসলমানরাও ভারতের মাটিতে পা দিয়ে দেখেছিল ঐরকম দৃশ্যেরই পুনরাভিনয়।

হর্ষবর্ধনের ধর্মমত ছিল সে যুগের পক্ষে যথেষ্ট উদার। বুদ্ধদেবের প্রতি তাঁর অচলা ভক্তি থাকলেও তিনি নিজে বৌদ্ধ ছিলেন না, শিব ও সূর্যও লাভ করতেন তাঁর শ্রদ্ধা। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর আর্যাবর্তের মধ্যে আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল ধর্মে ধর্মে সংঘর্ষ। হিন্দু মাত্রই নির্বিচারে ঘৃণা করত বৌদ্ধদের। কিন্তু বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হিন্দুদেরও মধ্যে ছিল দস্তুরমত অহি-নকুল সম্পর্ক। তারা কেউ ছিল শিবের, কেউ ছিল বিষ্ণুর এবং

কেউ ছিল অগ্নির বা গণেশের বা সূর্যের বা ভৈরবের বা কার্তিকের বা যমের বা বরুণের উপাসক। তা ছাড়া অনেকের পূজ্য ছিল আকাশ বা জল বা বায়ু বা বৃক্ষ বা সর্প—এমন কি ভূতপ্রেত পর্যন্ত।

কিন্তু সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল বৌদ্ধরা। সম্রাট অশোক, কণিষ্ক ও হর্ষবর্ধন এবং তারপর পালরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ ক'রে সব দিক দিয়েই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম। ওঁদের সাহায্যেই বৌদ্ধধর্ম ভারতের বাইরেও সুদূর দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়বার সুযোগ পেয়েছিল। সম্রাট অশোক বুদ্ধধর্ম প্রচার করবার ফলে ভারতের বাইরে এশিয়ার নানা দেশে—এমন কি য়ুরোপ ও আফ্রিকাতেও প্রচারকদের প্রেরণ করেছিলেন। হর্ষবর্ধনও চীন দেশের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কীয় যোগস্থাপন করতে ত্রুটি করেননি।

এই রাজ-সাহায্য হারিয়ে বৌদ্ধদের দুরবস্থার সীমা রইল না। ওদিকে উদয়ন বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা ক'রে শঙ্করাচার্যের জন্যে পথ তৈরি ক'রে দিলেন। সেই পথ দিয়ে অগ্রসর হলেন যখন (৭৮৮—৮২০ খ্রীঃ) অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য, বৌদ্ধদের অবস্থা হয়ে উঠলো তখন একান্ত অসহায়।

হর্ষবর্ধনের চিতা প্রায় শীতল হ'তে-না-হ'তেই প্রতিক্রিয়া শুরু হ'ল। হর্ষবর্ধন নিঃসন্তান ছিলেন। হত্যাকারী অর্জুনাশ্ব যখন কান্যকুব্জের সিংহাসন অধিকার করলে, তখন তাকে বাধা দিতে পারে রাজবংশে এমন কেউ ছিল না।

অর্জুনাশ্বের পক্ষে ছিল দলে দলে অসভ্যজাতীয় যোদ্ধা। অর্থ দিয়ে এবং বেপরোয়া লুণ্ঠনের লোভ দেখিয়ে অর্জুনাশ্ব তাদের বশীভূত করেছিল। দেশের দিকে দিকে বৌদ্ধ মঠ-মন্দিরের অভাব ছিল না এবং রাজানুগ্রহে সেগুলির মধ্যে সঞ্চিত হয়েছিল প্রচুর ধন-রত্ন ও বহু মূল্যবান দ্রব্য। প্রথমেই সেই সব মঠ-মন্দিরের ভিতরে আরম্ভ হ'ল আবার লুণ্ঠন-লীলা।

অধিকাংশ ব্রাহ্মণই ছিল বৌদ্ধদের পরম শত্রু। হর্ষবর্ধনের

দোর্দণ্ডপ্রতাপে এত দিন এই ব্রাহ্মণের দল কুঞ্চিতফণা ফণীর মত মনে মনেই পুষে আসছিল মনের যত রাগ ও আক্রোশ, এইবার সুযোগ পেয়ে তারাও অর্জুনাশ্বের সঙ্গে যোগ দিয়ে বৌদ্ধদের আক্রমণ করলে পৈশাচিক উল্লাসে।

কবি বাণভট্ট বললেন, 'ওহে সেনাপতি সিংহনাদ!'

সিংহনাদ ম্রিয়মান কণ্ঠে বললেন, 'আমাকে আর সেনাপতি ব'লে ডেকে ব্যঙ্গ কোরো না বাণভট্ট।'

—'ব্যঙ্গ ?'

—'তা নয় তো কি ? আমাকে যে সেনাপতি ব'লে ডাকছ, আমার সৈন্য কোথায় ?'

—'মানে ?'

—'স্বর্গীয় মহারাজের বৌদ্ধ-প্রীতির জন্যে সেনাদলের অনেকেই খুশি ছিল না। তাদের বেশীরভাগ লোকই দুষ্ট অর্জুনাশ্বকে রাজা ব'লে মেনে নিয়েছে। চক্ষুলজ্জার খাতিরে যারা অতটা নীচে নামতে পারেনি, তারাও চুপ ক'রে আছে নিরপেক্ষর মত।'

—'তুমি কি বলতে চাও, সেনাদলের মধ্যে মহারাজের বিশ্বাসী লোক ছিল না ?'

'ছিল বৈ কি! কিন্তু তারা দলে হাল্‌কা। তারা হতাশ হয়ে দেশ ত্যাগ করেছে।'

—'অতএব ?'

—'অতএব আমি এখন হয়ে পড়েছি সোনার পাথরবাটির মত—অর্থাৎ সৈন্যহীন সেনাপতি।'

—'তা'হলে এখন কি করা উচিত ?'

'উচিত. কান্যকুব্জের বাইরের দিকে দ্রুতবেগে পদচালনা করা।'

—'আরে নির্বোধ, বিদেশ বিভুঁয়ে গিয়ে খাব কি ?'

—'বায়ু কিংবা ঘাস কিংবা ভুষি। এখানে থাকলে খাবি ভক্ষণ করতে বিলম্ব হবে না। সেটা অধিকতর ভয়াবহ। ঐ শোনো, বিদ্রোহীদের

জয়-কোলাহল। ইচ্ছা হয়তো তুমি এখানে অবস্থান কর, এই আমি সবেগে প্রস্থান করলুম।'

—'তিষ্ঠ ভায়া, কিছুক্ষণ তিষ্ঠ! এখনো তুমি নিরস্ত্র নও, পথে-বিপথে বিপদ ঘটলে তোমার তরবারি আমাকে রক্ষা করতে পারবে।'

—'এস তাহ'লে দেরি করছ কেন?'

—'ব্রাহ্মণী যথাসময়ে মরে বেঁচে গিয়েছেন। এখন তোমার তরবারির মত আমারও প্রধান সম্বল কাব্যপুঁথিগুলি। দাঁড়াও, চটপট সেগুলি গুছিয়ে নিয়ে বগলদাবা করি। হা মহারাজ হর্ষবর্ধন, হা আমার কাব্যকুঞ্জ, হা আমার এত সাধের 'হর্ষচরিত'।'

সপ্তদশ

বিশ্বাসঘাতকের পরিণাম

অর্জুনাশ্ব সকলকে সম্বোধন ক'রে বললে, 'বন্ধুগণ, চীন-সম্রাট উত্তরাপথে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করার জন্যে আবার একদল লোক পাঠিয়েছে, এ কথা তোমরা সকলেই জানো। কিছুদিন আগে এইরকম এক প্রতারক প্রচারক এসে কেবল হর্ষবর্ধনের ধর্মনাশই করেনি, রাজার যোগ্য উপঢৌকন হস্তগত ক'রে আবার স্বদেশে পলায়ন করেছে। এবারের চৈনিক প্রচারকও যথেষ্ট মূল্যবান সামগ্রী উপহার পেয়েছে। তারাও পলায়ন করতে চায়। কিন্তু এবারে আমরা তাদের বাধা দেব, তাদের হত্যা করব আর তাদের সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠন না ক'রে ছাড়ব না। হিন্দুর সম্পত্তি অহিন্দুর হস্তগত হবে, এ অন্যায় আমি প্রাণ থাকতে সহ্য করতে পারব না। বন্ধুগণ, সৈন্যগণ, অগ্রসর হও। জয় দেবাদিদেব মহাদেবের জয়!'

চৈনিক দূত ওয়াং-হিউয়েন-সি ও তাঁর সঙ্গীগণ তখন ত্রিশ জন দেহরক্ষী নিয়ে তিরহুতের কাছে গিয়ে পড়েছেন। এত শীঘ্র দেশে

ফেরবার ইচ্ছা তাঁদের ছিল না, কিন্তু এই সুদূর বিদেশে প্রবীণ পৃষ্ঠপোষক হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর আর তাঁদের ভারতে থাকবার ভরসা হয়নি।

আচম্বিতে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত অর্জুনাশ্ব তার দলবল নিয়ে চৈনিক দূতমণ্ডলীর উপরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিদেশীর এই অতর্কিত আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না, তাঁরা একেবারে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলেন। দেহরক্ষীরা মারা পড়ল এবং সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠিত হ'ল বটে, কিন্তু ওয়াং-হিউয়েন-সি তাঁর জন কয় সঙ্গী নিয়ে কোন রকমে পলায়ন ক'রে নেপালে গিয়ে উপস্থিত হ'লেন।

নেপাল তখন তিব্বতের বিখ্যাত বৌদ্ধ-রাজা স্রং-স্যান্ গ্যাম্পোর অধীন। তিনি লাসা নগরের প্রতিষ্ঠাতা এবং তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা হয় তাঁরই চেষ্টায়। রাজা গ্যাম্পো বিবাহ করেছিলেন চীন-সম্রাটের এক কন্যাকে।

তাঁর শ্বশুরের প্রেরিত দূতমণ্ডলীর উপরে বিশ্বাসঘাতক অর্জুনাশ্বের অত্যাচারের কথা শুনে রাজা গ্যাম্পো অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন, বললেন, 'রাজদূত, আমি যদি আপনাকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করি তা'হলে আপনি কি নিজের অপমানের প্রতিশোধ নিতে পারবেন?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ, আমার হস্ত অস্ত্রধারণ করতেও সক্ষম।'

—'উত্তম। আপনার সঙ্গে যাবে আমার বাছা-বাছা বারোশত সেরা সৈনিক! তার উপরে থাকবে সাত হাজার নেপালী অশ্বারোহী। হিমালয় ছেড়ে নেমে যান আবার সমতল ক্ষেত্রে, চীন-সম্রাটের মানরক্ষা আর ধার্মিক হর্ষবর্ধনের হত্যাকারীর শাস্তি বিধান করুন।'

অর্জুনাশ্ব তখনও তিরহুত পরিত্যাগ করেনি। গুপ্তচর মুখে সে ওয়াং-হিউয়েন-সি'র পুনরাগমনের সংবাদ পেয়ে রীতিমত ভীত হয়ে উঠল, কারণ সে বেশ বুঝল যে, তার অধীনে যারা অস্ত্র ধরবে তারা সংখ্যায় বেশী থাকলেও যুদ্ধে দক্ষ সুশিক্ষিত তিব্বতী, নেপালী সৈন্যদের সমকক্ষ নয়। সে তাড়াতাড়ি বাগমতী নদীর তীরবর্তী দুর্গের ভিতর গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

কিন্তু পূর্ণ হয়ে উঠেছে তখন অর্জুনাশ্বর বিষের পাত্র। মাত্র তিন দিনের চেষ্টার পর ওয়াং-হিউয়েন-সি তুর্গের মধ্যে প্রবেশ করল সদলবলে। অসভ্য জাতের অশিক্ষিত সৈন্যদের নিয়ে অর্জুনাশ্ব তুর্গ ছেড়ে পলায়নের চেষ্টা করলে। কিন্তু তার দশ হাজার সৈন্য বাগমতী নদীর গর্ভে লাভ করল সলিলসমাধি এবং তিব্বতীদের তরবারির মুখে উড়ে গেল তিন হাজারের মুণ্ড।

অর্জুনাশ্ব পালিয়ে গেল, কিন্তু তখনও পরিতৃপ্ত হ'ল না তার রাজ্যলিপ্সা। তাড়াতাড়ি নূতন সৈন্য সংগ্রহ ক'রে আবার সে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'ল। কিন্তু ভগবান মুখ তুলে তাকালেন না তার মত প্রভুহন্তা বিশ্বাসঘাতকের প্রতি। এবারেও সে হেরে গেল। যুদ্ধে তার কত লোক মারা পড়েছিল সে হিসাব জানবার তো উপায় নেই। কিন্তু তিব্বতী ও নেপালীরা এক হাজার শত্রুর মুণ্ডচ্ছেদ করেছিল এবং বন্দী করেছিল বারো হাজার লোক। অর্জুনাশ্বও ধরা পড়ল সপরিবারে। বিজয়ী তিব্বতীদের হস্তে আত্মসমর্পণ করলে ভারতের পাঁচশত আশিটি প্রাকার-বেষ্টিত নগর।

ওয়াং-হিউয়েন-সি এবারে অর্জুনাশ্বকেও ছাড়লেন না, তাকে বন্দী ক'রে নিয়ে গেলেন সুদূর চীন দেশে। ছুটে গেল তার সাম্রাজ্যের লিপ্সা।

হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মগধ-বঙ্গের অধিপতি শশাঙ্কর উত্তরাধিকারী (মাধবগুপ্ত বা আদিত্যসেন) আবার স্বাধীনতা অর্জন করেছিলেন। তার পর কেবল মগধ-বঙ্গ নয়, উত্তরে পশ্চিমে দক্ষিণেও রাজ্যের পর রাজ্য করল আপন আপন স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা। আর্যাবর্ত আবার ডুবে গেল অন্ধযুগের বিস্মৃতির মধ্যে। তাকে সূর্যের আলোকে আমন্ত্রণ করবার জন্যে আর কোন চন্দ্রগুপ্ত, আর কোন সমুদ্রগুপ্ত, আর কোন হর্ষবর্ধন এসে দাঁড়াননি 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।'

প্রেতাত্মার প্রতিশোধ

প্রথম

রক্তলোভীর গর্জন

নাচতে-নাচতে ভেসে যাচ্ছিল নৌকো। কেবল নৌকো নয়, নাচছিল মহানদীর স্রোতে আলো আর ছায়া, চাঁদ আর তারা।

নদীতীরের বনভূমি থেকে বাতাস বহন ক'রে আনছিল অশ্রান্ত পত্রমর্মর। অনেক দূর থেকে তান ধরেছিল কোন্ এক গানের পাখী চঞ্চল হয়ে আনন্দের ছন্দে।

অরণ্যের মাঝখানে দেখা যাচ্ছে একটা মস্ত পাহাড়কে ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা। যেন ওখানে কৌতূহলী পৃথিবী তৃণশয্যায় উঁচু হ'য়ে শূন্যে মাথা তুলে দেখে নেবার চেষ্টা করছে প্রকৃতির সাজঘর।

নৌকোচালনা করছিল দুই বন্ধু প্রমোদ এবং প্রফুল্ল। কারুর বয়সই পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশি নয়। মাঝে-মাঝে তারা সখ ক'রে এমনি নৌকো নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

সন্ধ্যা ক্রমে হারিয়ে গেল রাত্রির মাঝখানে। কোনদিকে আর কোন জীবের সাড়া নেই। শোনা যায় কেবল অরণ্যের শ্যামল ভাষা আর নদীর জল-রাগিণী।

নৌকোচালনা ছেড়ে দুজনেই হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ নীরবে তাকিয়ে রইল নীলাকাশ-জোড়া তারকা-সভার সভাপতি চাঁদের দিকে।

প্রফুল্ল বললে, 'প্রমোদ, একটা গান শোনাও।'

প্রমোদ জবাব দিলে না।

প্রফুল্ল আবার বললে, 'আজকের রাত ভালো লাগছে। তুমি একটি গান গেয়ে তাকে আরো সুন্দর ক'রে তোলো।'

প্রমোদ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'গান গাইতে ভালো লাগছে না।'

—'কেন?'

—'মনে হ'চ্ছে যেন কী এক চরম অমঙ্গল আমার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করছে।'

সকৌতুকে হেসে উঠল প্রফুল্ল।

প্রমোদ বললে, 'হাসলে যে?'

—'এমন সুন্দর রাত, এমন চাঁদের আলো, এমন নদীর গান, এর ভিতরে তুমি অমঙ্গলকে সন্ধান করছ?'

—'আমি সন্ধান করছি না প্রফুল্ল, অমঙ্গলই করছে আমাকে সন্ধান। আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি পরলোকের সিংহদ্বার।'

প্রফুল্ল একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বললে, 'ভাই প্রমোদ, তোমার মুখে প্রায়ই এমনি সব কথা শুনতে পাই। এর কারণ কি বল তো?'

—'বন্ধু, বিনা কারণে কেউ অমঙ্গলকে ধ্যান করে না!'

—'অমঙ্গলকে ধ্যান?'

—'হ্যাঁ, এখন অমঙ্গলই হ'চ্ছে আমার একমাত্র ধ্যান-ধারণা!'

—'তুমি পাগল।'

—'যদি তুমি আমার জীবনের কথা জানতে, তাহ'লে আমাকে পাগল বলতে তোমার বাধ্‌ত।'

—'এ কথা তোমার মুখে সাজে না।'

—'কেন?'

—'নিজের জীবনকে তুমি তো নিজেই রহস্যের এক ঘেরাটোপ দিয়ে ঢেকে রেখেছ। কতবার তোমার জীবনের কথা শুনতে চেয়েছি, কিন্তু তুমি কি কোনদিনই আমার প্রার্থনা পূর্ণ করেছ।'

প্রমোদ উঠে বসল ধীরে ধীরে। তারপর আস্তে-আস্তে বললে, 'কেন যে তোমাকে আমার জীবনের কথা বলিনি তা কি তুমি জানো?'

—'কেমন ক'রে জানব বল? আমি গণৎকার নই।'

—'আমার জীবনের কথা হচ্ছে অলৌকিক।'

—'অলৌকিক ?'

—'হ্যাঁ। অলৌকিক বা অপার্থিব। শুনলে তুমি বিশ্বাস করবে না।'

—'তোমার চেয়ে বড় বন্ধু আমার আর কেউ নেই। তোমার কথায় আমি করব অবিশ্বাস!'

—'কেবল অলৌকিক নয়, আমার জীবনের কথা হ'চ্ছে ভয়ঙ্কর! তোমার সর্বাঙ্গ হবে রোমাঞ্চিত! শেষ পর্যন্ত হয়তো সহ্য করতে পারবে না!'

প্রফুল্ল সবিস্ময়ে প্রমোদের মুখের পানে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল বোবার মত। তারপর সেও উঠে ব'সে হাসতে হাসতে বললে, 'বন্ধু, জীবন বড় একঘেঁয়ে। কিন্তু তোমার কথায় পাচ্ছি 'অ্যাড্ভেঞ্চারে'র গন্ধ। রোমাঞ্চিত হ'তে আমি ভালোবাসি। পৃথিবীতে ব'সেই যদি অপার্থিবের সন্ধান পাওয়া যায়, তাও মন্দ লাগবে ব'লে মনে হ'চ্ছে না! বেশ, ব্যক্ত কর তোমার জীবন-কাহিনী!'

চাঁদের দুধের-ধারা-মাখা নদীর স্রোতের সঙ্গে নৌকো ভেসে যাচ্ছিল আপনা-আপনি। হঠাৎ থেমে গেল বাতাসের উচ্ছ্বসিত গতি, স্তব্ধ হয়ে গেল বনমর্মর। ক্ষীণ হয়ে এল নদীর কলতান। এবং সেই স্তব্ধতার মধ্যে আচম্বিতে জাগ্রত হ'ল কোথায় রক্তলোভী ব্যাঘ্রের ভয়াবহ গর্জন।

শিউরে উঠে প্রমোদ বললে, 'শুনলে?'

—'কি?'

—'কোথায় বাঘ ডাকছে?'

—'ডাকুক্-গে! তাতে আমাদের কি?'

—'কিছু না। বিশ্বাস করো আর না-করো, শোনো তবে আমার কথা?'

দ্বিতীয়

প্রেতপর্ব্ত

আমরা যখন আসামের এক জঙ্গলে বাস করতুম, তখনকার কথাই আমি ভালো ক'রে বলব। কিন্তু আমাদের আদি বাস ছিল বাংলাদেশে, চব্বিশ পরগণা জেলায়। যে কারণে আমাদের নিজের দেশ ছাড়তে হয়েছিল, আগে সেই কথাই বলি।

ভাই-বোনে আমরা ছিলুম তিনটি। দাদা, আমি আর মায়া। বাবা খুব ধনী না হ'লেও লাখ-খানেক টাকার মালিক ছিলেন। তারই সুদে স্বাধীনভাবে চলত আমাদের সংসার।

মায়াকে প্রসব করবার পরেই আমার মা মারা পড়েন। বাবা ছিলেন পরম হিন্দু, মাকে বাঁচাবার জন্যে তিনি অনেক ঠাকুর-দেবতার কাছে গিয়ে ধর্না দিয়েছিলেন। কিন্তু ঠাকুর-দেবতারা মোটা টাকার প্রসাদ খেয়েও মাকে বাঁচাবার জন্যে যৎসামান্য চেষ্টাও করেন নি।

তার ফলে বাবা হিন্দু-দেবতাদের নাম শুনলেই রেগে আগুন হয়ে উঠতেন। এবং মায়ের শোকে বাবার মস্তিষ্ক বোধহয় কিঞ্চিৎ বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। যে কারণেই হোক বাবা হঠাৎ খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করলেন।

এ-সব ব্যাপারে বাংলার পল্লীসমাজে কি-রকম বিশ্রী আন্দোলন জাগে, সেটা বোধহয় তোমাকে বর্ণনা ক'রে বুঝিয়ে দিতে হবে না। কেবল প্রতিবেশীরা নয়, গ্রামের জমিদার পর্যন্ত গেলেন ক্ষেপে। চারি-দিকে রক্তচক্ষু, চারিদিকে গালাগালি।

একদিন জমিদার-বাড়ীতে বাবার ডাক পড়ল। সেখানে কোন্ দৃশ্যের অভিনয় হবে সেটা আন্দাজ করতে পেরে বাবা নিজের বাড়ীতেই ব'সে রইলেন।

ক্রুদ্ধ জমিদারবাবু সেইদিনের সন্ধ্যাতেই পাঠিয়ে দিলেন এক যষ্টিধারী দরোয়ান।

বাবা বাইরের ঘরে বসেছিলেন। দরোয়ান সোজা ঘরের ভিতর ঢুকে জানালে, তার উপরে হুকুম হয়েছে বাবাকে কান ধ'রে টেনে নিয়ে যাবার জন্যে।

বাবা অল্প-কথার মানুষ ছিলেন। সংক্ষেপেই বললেন, 'একবার সেই চেষ্টা করেই দেখ না।'

দরোয়ান চেষ্টা করতে ভয় পেলে না। হাত বাড়ালে বাবার কর্ণধারণ করবার জন্যে। কিন্তু বাবা হাত বাড়ালেন তারও চেয়ে তাড়াতাড়ি। দরোয়ানের লাঠি কেড়ে নিয়ে তার মাথায় বসিয়ে দিলেন এক ঘা।

বিনাবাক্যব্যয়ে দরোয়ান হ'ল একেবারে কুপোকাৎ। মুহূর্তে তার আত্মা হ'ল দেহহীন।

এমন অঘটন যে ঘটবে বাবা কল্পনাও করতে পারেন নি। দরোয়ানকে হত্যা করবার ইচ্ছা তাঁর মোটেই ছিল না।

কিন্তু বিপদে প'ড়েও বাবা বুদ্ধি হারালেন না। তাড়াতাড়ি নিতান্ত দরকারি জিনিস-পত্র গুছিয়ে ফেললেন। তারপর কেউ কিছু টের পাবার আগেই রাত্রের অন্ধকারে তিনি আমাদের নিয়ে দেশত্যাগ করলেন।

তারপর কেমন ক'রে পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে বাবা সুদূর আসামের জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে বাসা বাঁধলেন, তা রোমাঞ্চকর হলেও এখানে সে-সব সবিস্তারে বলবার দরকার নেই।

ভারতবর্ষের সর্বত্রই বনে-বনে এমন অনেক লোক বাস করে যারা শিকারী ব'লে আত্মপরিচয় দেয়। শিকার করাই তাদের পেশা। বাবা কি ব'লে আত্মপরিচয় দিতেন তা আমি জানি না, তবে আমার বিশ্বাস তিনি শিকারী ব'লেই নিজেকে পরিচিত করেছিলেন।

যখন আসামের জঙ্গলে আসি তখন আমি খুব ছোট, সব কথা ভালো ক'রে মনে পড়ে না।

খান-চারেক কুটির তুলে বাবা বাঁধলেন বনের বাসা। সেখান থেকে মানুষের বসতি ছিল মাইল-কয়েক দূরে। বিশেষ দরকার না থাকলে বাবা লোকালয়ের দিকে পা বাড়াতেন না। আমাদের গরু ছিল, ছাগল ছিল আর ছিল হাঁস আর মুরগী। এবং বাসার পিছনে খানিকটা ঘেরা-জমির ভিতরে ছিল শাক-সবজির বাগান। চাল-ডাল

প্রভৃতি আসত মাঝে-মাঝে দূরের লোকালয় থেকে। বাবাও প্রত্যহ বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন বনে-বনে শিকারের সন্ধানে। প্রায়ই পাখী বা হরিণ মেরে আনতেন। সুতরাং বুঝতেই পারছ, জঙ্গলের ভিতরেও আমাদের মোটামুটি খোরাকের অভাব হয়নি।

সে বনের ছবি উজ্জ্বল হয়ে আছে আমার মনের ভিতরে। একাধারে তা অপূর্ব, বিচিত্র, ভয়াবহ। সুন্দরের সঙ্গে ভীষণের তেমন সম্মিলন আমি আর কোথাও দেখিনি।

আমাদের বাসার পরেই ছিল খানিকটা ঘাস ও আগাছা-ভরা জমি এবং তারপরেই একটি ছোট নদী। বৎসরের অন্য সময়ে নদীটি বালির বিছানার উপর দিয়ে শীর্ণ জল-রেখা এঁকে ঝির্-ঝির্ ক'রে বয়ে যেত এবং তখন তার গান শোনাতো মৃদু গুঞ্জনের মত। কিন্তু বর্ষার সময়ে সে হয়ে উঠত সত্যসত্যই ভয়ঙ্করী। দুই তটের আগল ভেঙে ছড়িয়ে পড়ত অনেকদূর পর্যন্ত এবং প্রচণ্ড জলধারা ফুলতে-ফুলতে, ফেনার শুভ্রতা ছড়াতে-ছড়াতে এবং উন্মাদিনী বন্যার মতন গর্জন করতে করতে চমকিত ক'রে তুলত শ্রবণ-মন-নয়নকে। তার ছোট্ট ও শান্ত মূর্তি তখন কল্পনাও করা যেত না।

নদীটির জন্ম তার উত্তরদিককার বিশাল পর্বতপুরীর মধ্যে। সেখানে পাহাড়ের পর পাহাড়ের প্রস্তর-স্তূপ ক্রমেই উঁচু হয়ে উপর-পানে উঠে গিয়ে নীলাকাশের অনেকখানি ঢেকে ফেলেছে একেবারে। শিখরের পর শিখর, শিখরের পর শিখর—যেন অজানা, রহস্যময় ও বিভীষণ-দেবতাদের পূজার জন্যে যে-সব মন্দির গড়া হয়েছে ওগুলো হ'চ্ছে তাদেরই চূড়ো!

এ-অঞ্চলের কোন লোকই একলা ঐ পর্বতপুরীর মধ্যে ঢুকতে সাহস করত না, দিনের বেলাতেও। সন্ধ্যা নামলে দলে ভারি হ'লেও সকলে ওখান থেকে পালিয়ে আসত। তাদের বিশ্বাস, সূর্য অস্ত গেলেই ওখানে যাদের আসর বসে তারা কেউ জন্তুও নয়, মানুষও নয়। ওখানে যাওয়া আর যমালয়ে যাওয়া নাকি একই কথা। বিশেষ ক'রে একটি

পাহাড় নাকি এমনি ভয়ানক যে, লোকে তার নাম রেখেছে, 'প্রেত-পর্বত'। বাবা আগে এই-সব জনরব অলস জল্পনা-কল্পনা ব'লে উড়িয়ে দিতেন বটে, কিন্তু পরে তাঁকেও করতে হয়েছিল মত-পরিবর্তন।

নদীর পূর্ব-পারে আমাদের কুটির। এদিকেও জঙ্গল আছে বটে, কিন্তু তা খুব ঘন বা দুর্গম নয়। এদিকে কাঠ-কাটা বা মধুসংগ্রহ প্রভৃতির জন্যে মানুষের চলাচলও আছে।

কিন্তু নদীর পশ্চিম দিক থেকে আরম্ভ হয়েছে যে বিরাট ও গভীর অরণ্য মনুষ্যের পক্ষেও তা অগম্য স্থান বললেও অত্যুক্তি হবে না! সে অরণ্যের অনেক জায়গাই দিবালোকের স্পর্শও পায়নি কখনো। সেখানকার অধিকাংশ বৃক্ষই পরস্পরের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে সর্বদাই করে যেন মর্মর-ভাষায় আর্তনাদ। তাদের তলায় এবং আশেপাশে বাস করে যে নিবিড় অন্ধকার, মানুষের দৃষ্টি যেন তার গায়ে ধাক্কা খেয়ে আহত হয়ে আবার বাইরে পালিয়ে আসে সভয়ে।

ঐ অরণ্যের বাসিন্দা হ'চ্ছে হাতী, বাঘ, ভাল্লুক, বন্য বরাহ, মহিষ, নেক্ড়ে, অজগর এবং অন্যান্য সর্প প্রভৃতি। তাদের অনেকেই নদী পার হয়ে আমাদের এদিকেও মাঝে-মাঝে বেড়াতে আসত। তাই বাবার হুকুম ছিল, তিনি বাইরে গেলে আমরা যেন ঘরের ভিতরে দরজা বন্ধ করে বসে থাকি। ছেলেমানুষী খেয়ালে হয়তো বাবার অনুপস্থিতির সময়ে এক-আধ দিন বাইরে বেরিয়ে পড়তে পারতুম, কিন্তু দিনের বেলাতেও অরণ্যের ভিতর থেকে যে-সব হিংস্র জীবের হুঙ্কার ভেসে আসত তা শুনে কোনদিন আমরা কেউ পিতার অবাধ্য হ'তে ভরসা করিনি। আর রাত্রে তো সে অরণ্য হয়ে উঠত রোমাঞ্চকর শব্দময়! কত বৃহৎ জন্তু করত গর্জনের পর গর্জন, আবার কত জন্তুর কণ্ঠে ফুটত কাতর মৃত্যু-ক্রন্দন! মাঝে মাঝে মাতঙ্গের দল আমাদের কুটিরের চারিদিকে ভূমিকম্প জাগিয়ে ছুটে চ'লে যেত আর কুটিরের ভিতরের পরস্পরকে জড়াজড়ি ক'রে ব'সে আমরা তিনটি ভাই-বোন ভয়ে কেঁপে-কেঁপেই সারা হতুম, কারণ ওদের কোন-একটি জীবের শুণ্ডের আঘাতে বা

দেহের ধাক্কায় আমাদের কুটির তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়তে পারত যখন-তখন!

বাবা আমাদের দুই ভাইকে যে খুব ভালোবাসতেন এটা আমরা বেশ বুঝতে পারতুম। কিন্তু আমাদের বোন মায়ার সম্বন্ধে তিনি ছিলেন বেশ খানিকটা উদাসীন। মায়াকে প্রসব করতে গিয়েই যে আমাদের জননীকে ইহলোক ত্যাগ করতে হয়েছে, এই চিন্তাই বোধকরি তাঁকে ক'রে তুলেছিল মায়ার প্রতি বিমুখ। মায়ার সম্বন্ধে তিনি নিজের কর্তব্য-পালন করতেন মাত্র, কিন্তু তাঁর প্রাণের স্নেহ পায়নি সে কোনদিন।

বেচারা মায়া! সে হ'চ্ছে জন্মদুঃখিনী। জ্ঞান হবার আগেই মাতৃহারা, পিতার স্নেহ থেকেও বঞ্চিত। জন্ম এবং মৃত্যুর মধ্যে থাকে ভগবানের হাত, মা যে বেঁচে নেই এজন্যে তাকে দায়ী করলে চলবে কেন? মায়ের প্রতি বাবার ছিল অন্ধ ভালোবাসা, তাই বোধহয় তিনি বুঝেও বোঝেন নি এই সত্য কথাটা।

মায়া কিন্তু বাবাকে কী ভালোই বাসত! যদিও আমরা তার মুখ দেখেই বুঝতুম, তার প্রতি যে বাবার দরদ নেই এটা সে সর্বদাই অনুভব করতে পারত। তার শিশু-মন কি ভাবত জানি না, কিন্তু অধিকাংশ সময়েই তার মুখ হয়ে থাকত বিমর্ষ।

আমরা দুই ভাই মিলে প্রাণপণে চেষ্টা করতুম পিতার এই স্নেহের অভাব পূরণ করবার জন্যে। মায়া ছিল আমাদের প্রাণের পুতলী।

আর মায়া ছিল পরমা সুন্দরী—তার সর্বাঙ্গে ছিল গোলাপ-পাপড়ির রং আর কোমলতা। তার সেই ঢল-ঢল মুখের পানে তাকালে অতি-পাষণ্ডেরও মন বিগলিত না হয়ে পারত না। নিজের বোন ব'লে বলছি না, কিন্তু এমন রূপের ডালি পৃথিবীর মাটিতে আর আমি দেখিনি। প্রফুল্ল, আজ যদি তোমার সামনে মায়াকে এনে দেখাতে পারতুম তাহলে তুমি বুঝতে যে আমি অত্যুক্তি করছি না একটুও। কিন্তু হায়, মায়াকে আর কেউ দেখতে পাবে না!

কি জিজ্ঞাসা করছ? মায়া বেঁচে আছে কি না? না, সে অভাগিনী

আর বেঁচে নেই। কেমন ক'রে সে মারা পড়ল? এখনি সেই কথাই বলব।

বনবাসে এসে বাবাকেও কোনদিন সুখী দেখিনি। হাসতে তিনি যেন ভুলেই গিয়েছিলেন এবং তাঁর মুখের কথা হ'ত প্রায়ই বিরক্তি-ভরা। হয়তো এই সমাজ-পরিত্যক্ত জীবন তাঁর পক্ষে ছিল অসহনীয়। হয়তো মায়ের অভাব তিনি অনুভব করতেন পদে পদে। হয়তো একটা মানুষের প্রাণ গিয়েছে তাঁরই হাতে, এই দুশ্চিন্তা তাঁকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখত সর্বক্ষণ।

দায়ে পড়লে মানুষ প্রবীণ হয় অল্প-বয়সেই। সকালের আহারাদি সেরে বাবা প্রত্যহই বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে যেতেন বাইরে। তারপর প্রায়ই ফিরে আসতেন রাত্রিবেলায় অত্যন্ত ক্ষুধার্ত অবস্থায়। কোন জীব শিকার ক'রে আন্‌লেও সেদিন আর রান্নাবান্নার সময় থাকত না। সেইজন্যে দুপুরের পর থেকেই আমরা তিন ভাই-বোনে মিলে রাত্রের আহার্য প্রস্তুত করবার জন্যে নিযুক্ত হয়ে থাকতুম। আমরা কি-রকম রান্না করতুম জানি না; বাবা কিন্তু আমাদের তৈরি-করা খাবার গ্রহণ করতেন পরম পরিতুষ্টের মত।

এইভাবেই কিছুকাল ধ'রে আমরা জীবন যাপন করলুম। তার-পরেই আরম্ভ হ'ল যে-সব ঘটনার ধারা, বললেও তুমি হয়তো তা ধারণা করতে পারবে না।

দাদার বয়স তখন নয়, আমার সাত আর মায়ার পাঁচ বৎসর।

তৃতীয়

প্রেতপর্বতের অন্তঃপুরে

শীত পড়ল! পাহাড়ে-দেশের আসল বন্য-শীত। এখানে ব'সে ওদেশী শীতের মর্ম কিছুতেই তোমরা আন্দাজ করতে পারবে না!

রাত হয়েছে, গহন বনের শীতার্ত রাত্রি। দরজা-জান্‌লা বন্ধ ক'রে আমরা তিনজনে উনুন ঘিরে ব'সে আগুন পোয়াচ্ছিলুম। বাবা সারা দিনের পর ফিরে শ্রান্ত দেহে শয্যায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

বাইরে হিমকাতর ঝোড়ো-হাওয়া হু-হু-হু-হু ক'রে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে বনে-বনে ঘুরে কাঁদিয়ে তুলছিল সবুজ পাতাদের।

দাদা বললেন, 'কী রাত! এ-সময়ে যারা বাইরে আছে তাদের কি অবস্থা!'

মায়া কচি মুখখানি তুলে বললে, 'হাতী আর বাঘ বেচারীদের তো ঘর-বাড়ী নেই। আহা, না জানি তাদের কত কষ্ট হ'চ্ছে।'

ঠিক সেই সময়ে আমাদের দরজার ওপাশে জাগ্‌ল একটা গর্জন।

বাবা ধড়মড়িয়ে বিছানার উপরে উঠে ব'সে বললেন, 'নেকড়ে!'

মায়া আমাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধ'রে সভয়ে ব'লে উঠল, 'মাগো!'

আমি বললুম, 'এখন ভয় পাচ্ছিস্ কেন? এই তো শীতে ওদের কষ্ট হ'চ্ছে ব'লে দুঃখ করছিলি। যা, উঠে গিয়ে ওকে দরজা খুলে দে!'

নেকড়েটা আবার গর্জন করলে—এবারে আরো জোরে। সে কি ক্ষুধার্ত চীৎকার, যেন হিম ক'রে দেয় বুকের রক্ত।

বাবা বললেন, 'এ তো ভালো কথা নয়। দেখ্‌তে হ'ল।'

তিনি বিছানা থেকে নেমে পড়লেন। তারপর বন্দুকটা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। আমি দরজাটা আবার ভিতর থেকে বন্ধ ক'রে দিলুম।

আধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা, তুই ঘণ্টা কেটে গেল। তবু বাবা ফিরলেন না। বন্দুকের শব্দ বা নেক্‌ড়ের গর্জনও শুনলুম না। ঘুমের কথা ভুলে আমরা তিনজনে ব'সে-ব'সে ভাবতে লাগলুম, এমন কন্‌কনে ঠাণ্ডা রাতে বাবা এতক্ষণ ধ'রে বনের ভিতরে কি করছেন? কোন বিপদে পড়েন নি তো?

ছোট্ট খুকী মায়া, তন্দ্রার ঝোঁকে থেকে-থেকে তার মাথা নুয়ে পড়ছে, তবু সেও ঘুমোতে পারলে না।

ব্যাপারটা যা হয়েছিল, পরে বাবার মুখে শুনেছি।

সে রাতে আকাশে ছিল চাঁদ। জ্যোৎস্নার ধব্‌ধবে আঁচলে চাপা পড়েছিল অন্ধকার।

দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে বাবা দেখলেন, প্রায় ত্রিশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা প্রকাণ্ড দীপ্তচক্ষু নেক্‌ড়ে বাঘ। বাবাকে দেখেই সে গজ্‌রাতে গজ্‌রাতে আরো খানিক তফাতে গিয়ে দাঁড়াল।

জানোয়ারটাকে অত দূর থেকে গুলি করলে লক্ষ্য ব্যর্থ হবে, এই ভেবে বাবা বন্দুক তুলে তাড়াতাড়ি তার দিকে অগ্রসর হ'লেন।

একই অভিনয় চলল খানিকক্ষণ ধ'রে। বাবা যত এগিয়ে যান, নেক্‌ড়েটাও তত এগিয়ে যায়। বাবা যেই দাঁড়ান, সেও দাঁড়িয়ে প'ড়ে তুই চক্ষে অগ্নিবৃষ্টি ক'রে গজ্‌রাতে থাকে। বাবা ছুটলে সেও ছোটে, বাবা ধীরে ধীরে চললে সেও চলে ধীরে ধীরে।

বাবা ভারি একরোখা ছিলেন। তাঁরও গোঁ হ'ল যেমন ক'রে হোক্ আজ ঐ নেক্‌ড়েটাকে বধ করবেনই। তিনি ছুটলেন পশুটার পিছনে-পিছনে, মাইলের পর মাইল পার হয়েও থামলেন না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল তবু হুঁস্ নেই।

তারপরেই নেক্‌ড়ের সঙ্গে-সঙ্গে বাবা এসে পড়লেন প্রেতপর্বতের তলদেশে। তার সম্বন্ধে জনরব কি বলে সেটা তাঁর অজানা ছিল না। কিন্তু তিনি সে-সব কথাকে কুসংস্কার ব'লেই উড়িয়ে দিয়েছেন বরাবর।

প্রেতপর্বতের বুকের ভিতরে লক্‌লক্ ক'রে খেলা করছিল

অগ্নিশিখা। বাবা স্থির করলেন, দাবানল। বনে যাদের বাস প্রায়ই তাদের পরিচয় হয় দাবানলের সঙ্গে। কিন্তু এমন প্রচণ্ড শীতকালে হিমে-ভেজা বনে কি দাবানল জ্বলে? শিকারের উত্তেজনায় বাবার মনে এ-প্রশ্ন জাগল না।

দাবানল জ্বলছে দাউ দাউ দাউ। কে যেন অপবিত্র নরকাগ্নির খানিকটা নিক্ষেপ করেছে প্রেতপর্বতের মধ্যে। তারই শিখাগুলোকে নিয়ে কারা যেন দুরন্ত আহ্লাদে লাফালাফি দাপাদাপি ক'রে বেড়াচ্ছে পাহাড়পুরের বনে-বনে—গাছে-গাছে।

একে জ্যোৎস্না, তার উপরে দাবানল। চারিদিক আলোয় আলো! নেকড়েটাকে আরো স্পষ্ট ক'রে দেখা যেতে লাগল। সে তখন পাহাড়ের উপরে উঠছে। বাবাও তার পিছু নিলেন।

খানিকটা উপরে উঠেই নেকড়েটা হঠাৎ একখানা বড় পাথরের উপরে ব'সে পড়ল।

সে হাঁপিয়ে পড়েছে বুঝে বাবা এগিয়ে গেলেন দ্রুতপদে। নেকড়ে নড়ল না। বাবা দাঁড়ালেন, বন্দুক তুললেন, তবু সে পালাবার চেষ্টা করলে না।

লক্ষ্য স্থির ক'রে বাবা বন্দুক ছোঁড়েন আর কি—আচম্বিতে নেকড়ে হ'ল অদৃশ্য।

বাবা বিপুল বিস্ময়ে হতভম্ব! জ্যোৎস্না আর দাবানল সেখানটা স্পষ্ট ক'রে তুলেছে দিবালোকের মত, চোখের ভ্রম হবার কোন সম্ভাবনাই নেই, অথচ হাড় এবং মাংস দিয়ে গড়া একটা নিরেট মূর্তি কি কখনো এমনভাবে মিলিয়ে যেতে পারে বাতাসের মত বাতাসে?

বাবা শেষটা অবশ্য দোষ দিলেন নিজের চোখকেই, কারণ এক্ষেত্রে তাঁর পক্ষে তা ছাড়া আর উপায়ই ছিল না।

নিজের দৃষ্টির অক্ষমতাকে বার-বার ধিক্কার দিতে-দিতে বাবা যেই ফিরে দাঁড়িয়েছেন, অমনি রাত্রির স্তব্ধ আকাশকে বিদীর্ণ ক'রে জাগল একটা উচ্চ ও তীক্ষ্ণ চীৎকার—"কে কোথায় আছ, সাড়া দাও, আমি পথহারা বিপন্ন পথিক, আমাকে সাহায্য কর।"

এ আবার নতুন বিস্ময়!

কুবিখ্যাত প্রেতপর্বত, দিনের বেলাতেও লোকে যার কাছে আসতে আতঙ্কে শিউরে ওঠে, এই গভীর নিশীথে সেখানে মানুষ-পথিক। সে

আবার এমন স্থষ্টিছাড়া স্থানে অন্য মানুষের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছে! ও কি উন্মত্ত?

তারপরেই দেখা গেল, উপত্যকার পাশের পথ দিয়ে এগিয়ে আসছে দুটি মূর্তি।

বাবার বুকটা ছাঁৎ ক'রে উঠল। তাহ'লে কি প্রেতপর্বত সম্বন্ধে জনরব মিথ্যা নয়?

মূর্তিদুটি ক্রমেই কাছে এসে পড়ল, তাদের একজন পুরুষ আর একজন নারী। না, এরা যে পৃথিবীর মানুষ, সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

বাবা সুধোলেন, 'কে আপনারা?'

পুরুষটি বললে, 'বিদেশী।'

—'এখানে কেন?'

—'শত্রুদের কবল থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে বনের ভিতরে পালিয়ে এসেছিলুম। তারপর পথ হারিয়ে এখানে এসে পড়েছি।'

—'আপনি দেখছি বাঙালী।'

—'হ্যাঁ, বাংলা আমার দেশ বটে, তবে এখন থাকি আসামে।'

—'কেন?'

—'এখানে চাকরি করি।'

—'শত্রুর কথা বলছিলেন না?'

—'হ্যাঁ।'

—'কে আপনার শত্রু?'

—'জমিদার।'

—'জমিদার!'

—'জমিদার জোর ক'রে আমার মেয়েকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চায়?'

—'সে কি!'

—'সে জোর ক'রে আমার মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। তার চরিত্র নরপিশাচের মত। তার কবল থেকে উদ্ধার পাবার জন্যেই মেয়েকে নিয়ে আমি পালিয়ে এসেছি।'

—'কিন্তু আপনি কোথায় এসেছেন জানেন?'

—'কোথায়?'

—'প্রেতপর্বতে।'

—'এ কি-রকম নাম!'

—'লোকে বলে, রাত্রে এ-পাহাড়ে বসে ভৌতিক-সভা।'

—'আপনি এ-সব বিশ্বাস করেন?'

—'করলে এত রাত্রে এখানে আসতুম না।'

—'মশাই, এইটি আমার মেয়ে। লীলা, তুমি কি ভূত মানো?'

প্রশ্ন শুনে লীলা চমকে উঠল। তারপর তাকালে প্রেতপর্বতের শিখরের দিকে। সেখানে তখনো নৃত্য করছিল দাবানলের শিখা।

বাবা বললেন, 'এ আলোচনার স্থান নয়। আপনার নামটি জানতে পারি কি?'

—'শ্রীগিরীন্দ্রশেখর চৌধুরী। আপনার?'

—'প্রবোধকুমার বসু।'

—'পরিচয় তো হ'ল, এখন আমাদের কি করতে বলেন?'

—'গিরীন্দ্রবাবু, আপনি জানেন না আপনার সঙ্গে আমারও জীবনের কতকটা সাদৃশ্য আছে। আমিও জমিদারের অত্যাচারে দেশছাড়া। আমরা দুজনেই দুজনের ব্যথার ব্যথী হ'তে পারি। আসুন আমার সঙ্গে।'

চতুর্থ

জ্বলন্ত প্রমাণ দাবানল

মায়া তখনো ঢুলছিল, আমরা তখনো ব'সে ভাবছিলুম।

হঠাৎ দরজায় করাঘাত হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে শুনলুম বাবার কণ্ঠস্বর। আমরা আস্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুলে দিলুম।

বাবার সঙ্গীদের দেখে আমার দৃষ্টি হয়ে উঠল সচকিত। মায়া অস্ফুটকণ্ঠে কেঁদে উঠে এক ছুটে পালিয়ে গেল।

বাবা আগন্তুকদের দিকে ফিরে বললেন, 'আমার ছেলে-মেয়েরা এখানে অতিথি দেখেনি কোনদিন। ওরা তাই বিস্মিত হয়েছে।'

গিরীন্দ্র বললে, 'হবারই কথা! ওগো খোকাখুকুরা, ভয় নেই! আমরা বাঘও নই, ভাল্লুকও নই। বনে আমরা পথ হারিয়েছিলুম, তোমাদের বাবা দয়া ক'রে আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন।'

বাবা বললেন, 'আসুন গিরীন্দ্রবাবু, আসুন লীলা দেবী, উনুনে এখনো আগুন আছে দেখছি। এতক্ষণ ধ'রে বাইরে শীতের যে ধাক্কা সামলাতে হয়েছে, দেহগুলো একটু তাতিয়ে না নিলে চলবে না।' তারপর দাদার দিকে ফিরে বললেন, 'প্রকাশ, এঁরা নিশ্চয়ই ক্ষুধার্ত। এত রাত্রে ভালো ক'রে খাওয়াবার সময় তো হবে না, এখন কি করা যায় বল তো?'

দাদা বললেন, 'চাল আছে, ডাল আছে, আলু আছে। আর আছে তাজা মুর্গীর ডিম। বল তো এক ঘণ্টার মধ্যে খাবার তৈরি ক'রে দিতে পারি।'

গিরীন্দ্র বিপুল উৎসাহে ব'লে উঠল, 'সাধু, সাধু! খোকাবাবুজী, তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। এ যে মরুভূমিতে বৃষ্টিধারা! গহন বনে রাজভোগ!'

ইতিমধ্যে মায়ার খোঁজে পাশের ঘরে ঢুকে আমি দেখলুম, বিছানার উপরে উপুড় হয়ে শুয়ে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

বিস্মিত হয়ে বললুম, 'কি রে মায়া, কাঁদছিস্ কেন?'

—'ভয় করছে, আমার বড্ড ভয় করছে!'

—'ভয় করছে? কেন রে?'

—'ঐ মেয়েটাকে দেখে!'

—'কোন্ মেয়েটা? বাবার সঙ্গে যে এসেছে?'

—'হ্যাঁ ছোট্‌দা!'

—'সে কি রে? ও-যে পরীর মতন সুন্দরী। অমন সুন্দরী আমি কখনো দেখিনি!'

—'কিন্তু তুমি ওর চোখ দেখেছ ?'

—'চোখ ?'

—'হ্যাঁ। ওর চোখ দেখেই আমার ভয় করছে !'

—'যত সব বাজে কথা ! চোখ দেখে আবার ভয় কি-রে ?'

—'জানি না। আমি ওর কাছে যাব না—কখ্খনো না।' মায়া আবার ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল, কিছুতেই আর শয্যাত্যাগ করতে চাইলে না।

অতিথিরা বেশ-কিছুকাল ধ'রে বাস করলে আমাদেরই সঙ্গে।

বাবা ও গিরীন্দ্রবাবু প্রতিদিনই নির্দিষ্ট সময়ে বেরিয়ে যেতেন শিকারের সন্ধানে। লীলা থাকত কুটিরেই।

দেখলুম, ঘরকন্নার কাজে সে একেবারেই পাকা। সারাদিনই সংসার নিয়ে নিযুক্ত থাকত, যা করবার সবই নিজের হাতে করত, আমাদের কারুকে কিছুই করতে দিত না। এমন কাজের মেয়ে খুবই কম দেখা যায়।

দাদাকে আর আমাকে ভারি যত্ন আর আদর করত লীলা। সর্বদাই চেষ্টা করত কিসে আমাদের মন খুশি থাকে। মায়াকেও সে বশ করবার জন্যে কম চেষ্টা-করেনি, কিন্তু তাকে বাগে আনতে পারেনি কিছুতেই। মায়া তার কাছ থেকে সর্বক্ষণই তফাতে-তফাতে থাকবার চেষ্টা করত এবং তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও লীলা যদি তাকে আদর করবার চেষ্টা করত, তাহ'লে সে কেঁদে ফেলত তখনি। শেষটা লীলাকেও বাধ্য হয়ে মায়ার সঙ্গে ভাব করবার চেষ্টা ছেড়ে দিতে হ'ল। সেও মায়ার কাছে যেত না, মায়াও তার কাছে আসত না।

অথচ লীলা ছিল অতি-আমুদে মেয়ে। প্রতিদিনই সে আমাদের আনন্দ দেবার জন্যে শোনাতো নতুন নতুন হাসির গান! তার অধিকাংশ গানেই থাকত বনের জীবজন্তুদের কথা। গোটা-তিন গানের কথা এখনো আমার মনে আছে। প্রথমটি হ'চ্ছে প্যাঁচা-পেঁচীর কথা :

পঁ্যাচা বলে, 'পেঁচী রে আজ
পাইনি ইঁদুর-ছানা।'
পেঁচী বলে, 'কর্তামশাই,
হবে কিসে খানা?'
পঁ্যাচা বলে, 'খা' না খাবি,
শ্রীমুখেতে দিয়ে চাবি
পরম সুখে স্বর্গে যাবি,
—গাইব তা-না-না-না।,

আর-একটিতে আছে, বাঘ-বাঘিনীর কথা ঃ

এক যে ছিল বনের বাঘা,
ধর্‌তে গিয়ে হরিণ সেদিন
পেয়েছিল বিষম দাগা।
ব্যাধ ছিল এক লুকিয়ে ঝোপে,
ছাড়্‌লে কী বাণ বাঘার গোঁপে,
জাঁদ্‌রেলি গোঁপ্‌ কচু-কাটা—
পালালো বাঘ চেঁচিয়ে গাঁ-গাঁ!
হায় বেচারা গোঁপ্‌ হারিয়ে ফির্‌ল যখন গর্তে,
বাঘিনী কয়—'আ ম'রে যাই! হেথায় কেন মরতে?
জল্‌দি ভাগো গোঁফ-কাটা বাঘ!
মুখ দেখে তোর হ'চ্ছে যে রাগ!'
ব্যাপার দেখে কা-কা ক'রে
ধরলে হাসি যত কাগা!

তৃতীয় গানটিতে আছে কাক-শালিক-সংবাদ ঃ

শালিক-পাখী আজ গিয়েছে শাল্‌কে!
বিয়ে ক'রে আনবে সে বউ কাল্‌কে!
কাক ছিল—যার মনটা বাঁকা, বললে—'আমি সবার কাকা,
নিমন্ত্রণে কাকাকে বাদ? করব আমি জোর-প্রতিবাদ!

ঠুক্‌রে যে তার ভাঙব ঘরের চাল্‌কে।'

শালিক শুনে উঠল রেগে কাকের বাসায় ছুট্‌ল বেগে—
কয় সে—'কে কয় তোরে কাকা? নিজেই ডাকিস্‌ ক'রে কা-কা!
সাগর বলে কেউ কি কাটা-খাল্‌কে?'

'হাম কাকা হ্যায়!'—যেই বলে কাক, জোর্‌সে শালিক
খুব দিলে হাঁক—

'আজ ধরে-গা ধ্রুপদ-ধামার, লে আও নতুন গিন্নী হামার!
জলদি লে আও আমার খাঁড়া-ঢাল্‌কে!

দেখছি যে তোর বিপুল বড়াই, হোক্‌ তবে আজ তুমুল লড়াই!'
যেই দেখে কাক—শক্ত মাটি, পড়্‌ল স'রে পার্শ্ব কাটি—
বাঁচাতে তার কালো গায়ের ছালকে।

কবি বলে—'এরও পরে গল্প আছে আমার ঘরে,
ভাব করে মোর কিল্‌-বিল্‌-বিল্‌, কিন্তু দাদা, নেই ভালো মিল!
শুনো শুনো আমার ভক্ত! পদ্যে গল্প বলাই শক্ত—
মিথ্যে কেবল ঘা হ'ল হায়—চুল্‌কে!
'চুল্‌কে'র সাথে মিল্‌বে না যে 'শাল্‌কে'—
মিষ্টি কভু লাগ্‌বে না ভাই, ঝাল্‌কে!

কেবল আমরা কেন, বাবার মন রাখবার জন্যেও লীলার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। প্রায়ই সে নতুন নতুন খাবার তৈরি করত—বিশেষ ক'রে বাবার জন্যেই। বাবা খেতে বসলে সে সামনে গিয়ে বসত, পাখা নেড়ে মাছি তাড়াবে ব'লে। এত যত্নাদর পেয়ে বাবাও হয়ে উঠলেন তার প্রতি অত্যন্ত সদয়। ক্রমে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে, লীলা ছাড়া বাবার একদণ্ড চলত না।

একদিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা তিনজনে শয্যায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছি, বাবা আর গিরীন্দ্রবাবু ব'সে ব'সে কইছেন কথাবার্তা।

গিরীন্দ্রবাবু হঠাৎ বললেন, 'প্রবোধবাবু, কাল থেকে আর আপনার আতিথ্য স্বীকার করতে পারব না!'

—'সে কি!'

—'কাল আমাকে কলকাতায় যেতেই হবে। বিশেষ জরুরি দরকার।'

—'তারপর আবার ফিরবেন তো?'

—'আবার ফিরব কেন? আসামে আর তো আমার চাকরি নেই!'

বাবা একটু দুঃখিত-স্বরে বললেন, 'এতদিন ঘনিষ্ঠতার ফলে আপনারা আমাদের আত্মীয়ের মতন হয়ে গিয়েছিলেন। এই মায়ার বাঁধন ছিঁড়তে আমার কষ্ট হবে।'

—মায়ার বাঁধন ছিঁড়বেন কেন? আপনি ইচ্ছা করলে আমরা আরো ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হ'তে পারি।'

—'কেমন ক'রে?'

—'আপনার হাতে আমি আমার কন্যা সম্প্রদান করতে রাজি আছি।'

বাবা কথাটা যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না। বললেন, "তার মানে?'

—'আমার জামাই হ'তে আপনার আপত্তি আছে কি?'

অল্পক্ষণ স্তব্ধ হয়ে চিন্তা ক'রে বাবা বললেন, 'না।'

—'বেশ, তাহলে এখনি বিবাহ হ'য়ে যাক্!'

বাবা সবিস্ময়ে বললেন, 'অসম্ভব!'

—'অসম্ভবকেই সম্ভব করতে হবে। কারণ কাল খুব ভোরেই আমি কলকাতার দিকে যাত্রা করব।'

—'কিন্তু এই বনে, এত রাত্রে—'

বাধা দিয়ে গিরীন্দ্রবাবু বললেন, 'প্রবোধ, তুমি কি বলবে বুঝতে পেরেছি। তুমি বলতে চাও, এতরাত্রে এখানে পুরুত খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু কি দরকার পুরুতের? তুমি ক্রীশ্চান, আমিও কোন ধর্ম মানি না, তবে আর সামাজিক অনুষ্ঠান নিয়ে মাথা ঘামানো কেন? তুমি লোকালয় ত্যাগ করেছ, যাপন করছ বন্য-জীবন, সুতরাং

বন্য-রীতি অনুসারেই তোমাদের বিবাহ হ'লে কোনই ক্ষতি নেই।'

—'কিন্তু'—

—'আর কোন কিন্তু-টিন্তু নয়, আমি আমার মেয়ের বিয়ে দেব নিজের সর্তে।' গিরীন্দ্রবাবু উঠে দাঁড়িয়ে ডাকলেন, 'লীলা, এদিকে এস।'

লীলা এগিয়ে এল।

—'প্রবোধ, উঠে দাঁড়াও। লীলার হাত ধর। আচ্ছা, এইবার প্রতিজ্ঞা কর।'

—'কি প্রতিজ্ঞা?'

—'বল, প্রেতপর্বতের আত্মাদের নামে আমি শপথ করছি যে—'

বাবা বাধা দিয়ে বললেন, 'শপথ যদি করতে হয়, ভগবানের নামেই করা উচিত।'

—'না প্রবোধ, আমি ভগবান মানি না! তুমি বাস করছ—প্রেত-পর্বতের ছায়ায়। তোমার শপথ শুনতে পাবে এখানকার আত্মারাই।'

বাবা নাচারের মতন বললেন, 'তবে তাই-ই হোক্।'

—'শপথ কর।'

—'প্রেতপর্বতের আত্মাদের নামে শপথ করছি যে, আজ থেকে লীলাকে আমার বৈধ-পত্নীরূপে গ্রহণ করলুম। তার ভালো-মন্দের জন্যে দায়ী থাকব আমিই।'

গম্ভীর-স্বরে গিরীন্দ্রবাবু বললেন, 'ঐসঙ্গে বল যে, 'যদি আমার দ্বারা লীলার কোন অনিষ্ট হয়, তাহ'লে প্রেতপর্বতের আত্মাদের অভিশাপ যেন আমার আর আমার সন্তানদের মাথার উপরে এসে পড়ে। যেন তাদের মাংস হয় শকুনি, গৃধিনী, নেকড়ে আর বনের অন্যান্য হিংস্র জন্তুদের খাদ্য! কর শপথ!'

একটু ইতস্তত ক'রে বাবা গিরীন্দ্রবাবুর কথাগুলো আর-একবার আউড়ে গেলেন।

গিরীন্দ্রবাবুকে দেখাচ্ছিল তখন কী ভয়ঙ্কর! মনে হচ্ছিল মাথায় তিনি যেন আরো একফুট উঁচু হয়ে উঠেছেন এবং তাঁর দুই চক্ষু দিয়ে

ঠিক্‌রে পড়ছে তুবড়ীর আগুনের ফিন্‌কি।

দাদা বিছানার উপরে আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে রইলেন, আমার বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করতে লাগল, মায়া চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠল!

লীলা অসন্তুষ্ট-স্বরে বললে, 'অমঙ্গল ডেকে এনো না মায়া। বিয়ের সময়ে কাঁদতে নেই।'

হঠাৎ আমাদের ঘরের ভিতরটা যেন বদলে গেল একেবারে! এ যেন আমাদের সেই পরিচিত ঘর নয়, যেন আমরা কোন অজানা ও অচেনা ঘরের ভিতরে ব'সে চোখের সামনে দেখছি এক অলৌকিক ও অস্বাভাবিক দৃশ্যের অভিনয়!

ঘরের ভিতরে এসে পড়েছে একটা আগুনের আভা। সচমকে মুখ তুলে দেখি, প্রেতপর্বতের উপরে দাউ-দাউ ক'রে জ্বলছে দাবানল— তার শিখরে-শিখরে উৎকট আনন্দে নৃত্য করছে যেন প্রচণ্ড অগ্নিসাগরের রক্তাক্ত তরঙ্গের পর তরঙ্গ।

বাবা বললেন, 'প্রেতপর্বতে আবার দাবানল!'

হো-হো ক'রে কঠিন-হাসি হেসে গিরীন্দ্রবাবু বললেন, 'প্রেত-পর্বতের আত্মারা যে তোমার শপথ শুনতে পেয়েছে, ঐ দাবানলই হ'চ্ছে তার জ্বলন্ত প্রমাণ!'

পঞ্চম

নিশাচরী

গিরীন্দ্রবাবু চ'লে গিয়েছেন। বাবা হুকুম দিয়েছেন, লীলাকে মা ব'লে ডাকতে। কিন্তু কেবল বাবা ও লীলার সামনেই আমরা মা শব্দটি উচ্চারণ করতুম, নিজেদের মধ্যে ব্যবহার করতুম লীলার ডাক-নামই! কেন জানি না, তাকে মা বলতে গেলে যেন বদ্ধ হয়ে আসত আমাদের কণ্ঠস্বর। লীলার যত গুণই থাক্ তার মধ্যে মাতৃত্বের ভাব

ছিল না একটুও।

কিছুদিন কেটে গেল। তারপরই ঘটনার ধারা বইতে লাগল সিনেমার ছবির মত দ্রুত তালে।

আমাদের শোবার ঘরে ছিল দুটি বিছানা। একটিতে শুতেন বাবা আর লীলা, আর-একটিতে আমরা তিনজন।

এক রাত্রে মায়া হঠাৎ ঠেলে-ঠেলে দাদাকে আর আমাকে জাগিয়ে দিলে।

দাদা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে মায়া ?'

মায়া চুপি-চুপি বললে, 'লীলা বাইরে বেরিয়ে গিয়েছে।'

—'বাইরে মানে ?'

—'বনের ভেতরে!'

—'এত রাত্রে ? দূর, কী যে বলিস্!'

—'সত্যি বলছি দাদা! লীলা আস্তে-আস্তে বিছানা থেকে উঠল। একবার ফিরে চেয়ে দেখলে বাবা ঘুমোচ্ছেন কিনা। তারপর পা টিপে-টিপে এগিয়ে দরজা খুলে বাড়ীর বাইরে চ'লে গেল। ঐ দেখনা, বিছানায় সে নেই।'

এই হাড়কাঁপানো শীতের নিঝুম রাতে, পদে পদে বিপদ্‌জনক অরণ্যের মধ্যে গিয়ে লীলা একলা কি করছে ? আমাদের বিস্ময়ের আর সীমা রইল না! তিনজনেই না ঘুমিয়ে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলুম।

ঘণ্টাখানেক পরে ঘরের খুব কাছেই শুনলুম একটা গর্জন। আমি বললুম, 'নেক্‌ড়ে!'

দাদা বললেন, 'কি সর্বনাশ, লীলাকে দেখতে পেলে নেক্‌ড়ে যে ছিঁড়ে কুচি-কুচি ক'রে ফেলবে ?'

মায়া মাথা নেড়ে বললে, 'কখ্‌খনো না, কখ্‌খনো না!'

মিনিট-কয় কাটল। তারপর লীলা আবার ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল। ওদিককার জানলার সামনে ছিল জলভরা বাল্‌তি। সেখানে গিয়ে সে হাত-মুখ ধুয়ে ফেললে। তারপর বিছানায় গিয়ে বাবার

পাশে শুয়ে পড়ল।

আমরা ভয়ে কাঁপতে লাগলুম, কেন জানি না।

পরদিন থেকে আমরা লীলার উপরে পাহারা দিতে সুরু করলুম। কিন্তু পরদিনেও সেই ব্যাপার! তার পরদিন এবং তার পরদিনেও! এমনি উপর-উপরি আরো কয়েক রাত্রি ধ'রে দেখলুম একই দৃশ্য! ঠিক যেই রাত বারোটা বাজে, লীলা বিছানা ছেড়ে উঠে বাড়ীর বাইরে বেরিয়ে যায়। তারপরেই বাইরে থেকে গর্জন ক'রে ওঠে একটা নেক্‌ড়ে! অনেকক্ষণ পরে লীলা আবার ফিরে আসে এবং প্রতিদিনই আবার বিছানায় গিয়ে শোবার আগে হাত-মুখ ধুয়ে ফেলে। বাবার ঘুম খুব প্রগাঢ়। তিনি কিছুই জানতে পারেন না।

একদিন বললুম, 'দাদা, বাবাকে এ-সব কথা জানানো উচিত।'

দাদা বললেন, 'হ্যাঁ, উচিত। কিন্তু তার আগে আমাদের জানা উচিত, লীলা বাইরে গিয়ে কি করে।'

—'তা কি ক'রে সম্ভব হবে?'

—'আজ লীলার পিছনে-পিছনে আমিও বাইরে যাব।'

—'না দাদা, তা হয়না।'

মায়াও ব্যস্ত-স্বরে বললে, 'ও দাদা, অমন কথা মুখেও এনো না! তাহ'লে ভয়েই আমি ম'রে যাব।'

দাদা ভারি সাহসী ছেলে। দৃঢ়স্বরে বললেন, 'আজ আমি বাইরে যাবই।'

সেদিন দাদা লেপের ভিতরে ঢুকলেন বাইরে যাবার জামা-কাপড় প'রেই।

যথাসময়ে লীলা বাড়ীর বাইরে চ'লে গেল। দাদাও তখনি নীচে নেমে বাবার বন্দুকটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

আমি আর মায়া মহা উৎকণ্ঠায় প্রায় শ্বাস বন্ধ ক'রে দাদার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলুম। তারপরেই শুনলুম একটা বন্দুকের শব্দ! এবং তারই মিনিট-খানেক পরে দেখলুম লীলা ঘরের ভিতরে এসে ঢুকল

খোঁড়াতে-খোঁড়াতে। তাড়াতাড়ি বালতির কাছে গেল। উঁকি মেরে দেখলুম, একখণ্ড কাপড় নিয়ে সে নিজের পায়ে হাঁটুর কাছে 'ব্যাণ্ডেজ' বাঁধছে! খানিকক্ষণ পরে সে আবার শুয়ে পড়ল বাবার পাশে গিয়ে।

কিন্তু দাদা কোথায়? দাদা এখনো বাইরে কেন? দাদাই কি বন্দুক ছুঁড়ে লীলাকে জখম করেছেন? তাই কি তিনি বাবার ভয়ে বাড়ীতে ফিরতে পারছেন না?

সারারাত কেটে গেল দুশ্চিন্তার ভিতর দিয়ে।

বাবার ঘুম ভাঙল সকালে।

আমি ভয়ে-ভয়ে বললুম, 'বাবা, দাদা কোথায়?'

বাবা বিস্মিতকণ্ঠে বললেন, 'দাদা? কেন, সে কি বিছানায় নেই?'

—'না।'

লীলা বললে, 'দেখ, কাল রাতে আমি ঘুমের ঘোরে শুনেছিলুম, কে যেন দরজা খুলে বাইরে গেল! আচ্ছা, ঘরের কোণে তোমার বন্দুকটা দেখতে পাচ্ছিনা কেন বল দেখি?'

সেইদিকে হতভম্বের মত তাকিয়ে বাবা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইলেন। তারপর একলাফে শয্যার উপর থেকে নেমে প'ড়ে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন দ্রুতপদে।

অল্পক্ষণ পরেই তিনি আবার ফিরে এলেন, দুইহাতে দাদার রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ বহন ক'রে। দেহটা নামিয়ে রেখে তিনি তার উপরে বিছিয়ে দিলেন একখানা কাপড়।

আমি ও মায়া মাটির উপরে আছড়ে প'ড়ে কাঁদতে লাগলুম।

লীলা দুঃখিত-স্বরে বললে, 'প্রকাশ নিশ্চয় তোমার বন্দুক নিয়ে নেকড়ে মারতে গিয়েছিল। বাচ্চা ছেলে, পারবে কেন? বেচারা বুদ্ধির দোষেই নেকড়ের হাতে প্রাণ দিলে।'

বাবা জবাব দিলেন না। তাঁর দেহ মূর্তির মত স্থির।

আমি কথা কইতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু মায়া আমার দুইহাত চেপে ধ'রে এমন মিনতি ভরা চোখে আমার মুখের পানে তাকিয়ে রইল যে

কোন কথাই বলতে পারলুম না।

সেইদিনই বাবা আমাদের বাসার অনতিদূরে দাদার মৃতদেহ নিয়ে মাটি খুঁড়ে কবরস্থ করলেন। বন্য জন্তুদের কবল থেকে রক্ষা করবার জন্যে কবরের উপরে চাপিয়ে দিলেন মস্ত মস্ত পাথর।

বাবা কয়েকদিন আর শিকারে গেলেন না। সারাক্ষণ জড়ের মতন ব'সে থাকেন, বিমর্ষ মুখে কি ভাবেন এবং মাঝে-মাঝে গর্জন ক'রে ব'লে ওঠেন, 'ধ্বংস করব, আমি নেক্‌ড়ে-বংশ ধ্বংস করব।'

ইতিমধ্যে একদিনও কিন্তু নিশাচরী লীলার বাইরে যাওয়া বন্ধ হয়নি। তখনও যদি সব কথা বাবাকে বলতুম! কি এক ছেলেমানুষি ভয় আমার মুখকে রেখেছিল বোবা ক'রে।

শেষটা শোকের প্রথম ধাক্কাটা সামলে বাবা আবার শিকার করতে বেরুলেন। কিন্তু প্রথম দিনেই ফিরে এসে বললেন, 'লীলা, তুমি বললে হয়তো বিশ্বাস করবে না, কিন্তু নেক্‌ড়েরা কবরের পাথর সরিয়ে আমার অভাগা ছেলের দেহটার সব খেয়ে ফেলেছে! কবরের ভিতরে প'ড়ে আছে কেবল খানকয়েক হাড়।'

লীলা সভয়ে ও সবিস্ময়ে বললে, 'ওমা, তাই নাকি গো?'

বাবা বললেন, 'নেক্‌ড়ে-বংশ জাহান্নামে যাক্!'

মায়া ব'লে ফেললে, 'বাবা একটা নেকড়ে রোজ আমাদের দরজার কাছে এসে চীৎকার করে!'

বাবা বললেন, 'তাই নাকি? একথা আমাকে বলনি কেন? এবারে নেক্‌ড়ের ডাক শুনলেই আমাকে জাগিয়ে দিও—আমি তার রক্তদর্শন না করে ছাড়ব না।'

মায়ার মুখের দিকে একটা হিংস্র ও জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে লীলা সেখান থেকে হন্‌হন্ ক'রে চ'লে গেল।

ষষ্ঠ

প্রেতপর্বতের প্রেতাত্মা

কয়েকদিন পরে।

আমাদের শাক-সব্‌জির বাগান। মায়া এক জায়গায় ব'সে-ব'সে ধুলো-মাটি দিয়ে খেলাঘর বাঁধবার চেষ্টা করছে। আমি দিচ্ছি গাছের গোড়ায় জল! বাবা কোদাল নিয়ে কোপাচ্ছেন মাটি!

এমন সময়ে লীলা এসে বললে, "মায়া, ভাতের হাঁড়ি চড়িয়ে এসেছি, তুমি কিছুক্ষণ উনুনের কাছে গিয়ে বোসো গে, আমি ততক্ষণে বন থেকে জ্বালানি কাঠ নিয়ে আসি।'

মায়া খেলা ছেড়ে কুটিরের দিকে গেল। লীলা চ'লে গেল বনের দিকে।

আন্দাজ আধঘন্টা পরে কুটিরের ভিতর থেকে ভেসে এল আর্তনাদের পর আর্তনাদ। মায়ার আর্তনাদ! বাবা আর আমি দুজনেই বাগান থেকে বেগে ছুটে এলুম—কিন্তু আস্‌তে আস্‌তেই আর্তনাদ হ'ল নীরব।

আমরা কুটিরে ঢোকবার আগেই ভিতর থেকে উল্কার মত ছুটে বেরিয়ে এল মস্তবড় এক নেক্‌ড়ে! চোখের পলক ফেলবার আগেই সে বনের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঘরময় বইছে রক্তের ধারা! তারই মধ্যে প'ড়ে রয়েছে মায়ার ছিন্ন-ভিন্ন দেহ। কিন্তু তার মুখে-চোখে তখনও জীবনের আভাস!

বাবা চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠে ব'সে পড়লেন। আমাদের পানে তাকিয়ে একটু ম্লান-হাসি হাসলে মায়া, তারপরেই সে আমাদের মায়া কাটালে।

এমন সময়ে লীলা ঘরের ভিতরে ঢুকে দৃশ্য দেখে থ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ক্রন্দনভরা কণ্ঠে বললে, 'ওগো, এ কি দেখছি গো! কে এমন সর্বনাশ করলে গো!'

বাবা খালি বললেন, 'নেক্‌ড়ে।'

—'হায়রে অভাগী! একটু আগেই একটা নেক্‌ড়ে আমার পাশ দিয়ে ছুটে গিয়েছিল! মাগো, আমার যা ভয় হয়েছিল! এ নিশ্চয় তারই কাজ!'

আমার আর বাবার শোকের কথা বর্ণনা ক'রে তোমাকেও আর কষ্ট দিতে চাই না। শুভ্র পূজার ফুলের মত সুন্দর, কোমল ও পবিত্র মায়া—সে ছিল আমাদের প্রাণের দুলালীর মত। তাকে হারিয়ে জীবন হয়ে গেল অন্ধকার।

দাদার কবরের পাশে বাবা মায়ার দেহকেও সমাধিস্থ করলেন।

রাত্রি। যে বিছানা ছিল আগে তিন ভাই-বোনের জন্যে, আজ আমি সেই বিছানায় একলা। চোখে ঘুম নেই। শুয়ে-শুয়ে ভাবছি। মায়ার মৃত্যুর সঙ্গে লীলার কোন সম্পর্ক আছে বোধহয়। কিন্তু কি-রকম সম্পর্ক?

হঠাৎ দেখলুম, লীলা শয্যা ছেড়ে নামল। তারপর ঘরের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল পা টিপে-টিপে অতি সন্তর্পণে।

সাংঘাতিক নারী! এখনো সে নিজের অদ্ভুত অভ্যাস ছাড়তে পারলে না?

দুর্দান্ত কৌতূহল হ'ল। উঠলুম। দরজা একটু ফাঁক ক'রে বাইরে উঁকি মারলুম।

জ্বল্‌জ্বলে চাঁদের আলো—চারিদিক স্পষ্ট।

প্রথমেই চোখ গেল যেখানে আছে দাদার ও মায়ার সমাধি। আঁৎকে উঠলুম সভয়ে। মায়ার কবরের পাশে ব'সে কে ঐ স্ত্রীলোক পাথরের পর পাথর সরাচ্ছে? লীলা!

খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইলুম। কিন্তু তারপর যখন দেখলুম, লীলা কবরের ভিতর থেকে মায়ার মৃত দেহকে দুই হস্তে টেনে বার করছে, তখন আর আমি স্থির হয়ে থাকতে পারলুম না। বেগে দৌড়ে গিয়ে বাবাকে জাগিয়ে দিয়ে বললুম, 'বাবা

বাবা! শীগ্‌গির ওঠ! তোমার বন্দুক নাও!'

—'কী! আবার নেকড়ে এসেছে? বটে, বটে!' বাবা খাট

থেকে লাফিয়ে পড়লেন, বন্দুকটা তুলে নিলেন, তারপর ছুটে চ'লে গেলেন ঘরের বাইরে। আমিও রইলুম পিছনে-পিছনে।

দাদার আর মায়ার কবরের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল। একটা অস্ফুষ্ট শব্দ ক'রে চম্‌কে ও থম্‌কে তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর দুই চক্ষু যেন ঠিক্‌রে পড়তে চাইছে।

কিন্তু তাঁর এই আড়ষ্টতা মুহূর্তের জন্যে। তারপরেই হঠাৎ তিনি বন্দুক তুলে ঘোড়া টিপে দিলেন।

তীব্র চীৎকারে রাত্রির স্তব্ধতাকে যেন ফাটিয়ে দিয়ে লীলার দেহ পড়ল শূন্যে দুই বাহু বিস্তার ক'রে মাটির উপরে লুটিয়ে।

বাবাও চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ভগবান, রক্ষা কর।' তারপরেই অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে গেলেন।

খানিকক্ষণ পরে বাবার জ্ঞান হ'ল। ধীরে ধীরে উঠে ব'সে কপালের উপরে ডানহাত বুলোতে-বুলোতে তিনি বললেন, 'আমি কোথায়? আমার কি হয়েছে বল দেখি?...ও, মনে পড়েছে—মনে পড়েছে! উঃ, কী দৃশ্য!'

তাঁর সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল একবার! তারপরেই নিজেকে সামলে নিয়ে গাত্রোত্থান ক'রে তিনি কবরের দিকে চললেন। আমিও করলুম অনুসরণ।

কিন্তু কবরের পাশে কোথায় লীলার দেহ? সেখানে প'ড়ে রয়েছে প্রকাণ্ড একটা মৃত নেক্‌ড়ে!

বাবা অভিভূত-কণ্ঠে হাঁপাতে-হাঁপাতে বললেন, 'লীলা নেই, আছে সেই নেক্‌ড়েটা! এটাকে আমি চিনতে পারছি—এইবার সব বুঝতেও পারছি! এই নেক্‌ড়েটাই আমাকে ভুলিয়ে পাহাড়ের দিকে নিয়ে গিয়েছিল! হা ভগবান, আমি পড়েছিলুম প্রেতপর্বতের প্রেতাত্মাদের পাল্লায়!'

পরদিনের প্রভাত। এখনো ভালো ক'রে সূর্যোদয় হয়নি। ঘরের ভিতরে আলো-আঁধারি।

বিষম শব্দে দরজা ঠেলে ঘরের ভিতরে বেগে প্রবেশ করল এক উদ্‌ভ্রান্ত মূর্তি। অগ্নিরক্ত চক্ষু, মাথার লম্বা চুলগুলো করছে ক্রুদ্ধ সর্পের মত লটপট, থর্‌-থর্‌ ক'রে কাঁপছে সর্বশরীর। গিরীন্দ্র!

কান-ফাটানো চীৎকার ক'রে, সামনের দিকে তুই বাহু বাড়িয়ে সক্রোধোন্মত্ত গিরীন্দ্র বললে, 'দে আমার মেয়ে দে! দে আমার মেয়ে দে! আমার মেয়ে, আমার মেয়ে,—কোথায় আমার মেয়ে?'

বাবা তার স্নমুখে গিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে তেমনি জোরে চীৎকার ক'রে বললেন, 'কোথায় তোর মেয়ে? তোর মেয়ের যেখানে থাকা উচিত, সেইখানে! নরকে! দূর হ শয়তান, দূর হ! নইলে তোকেও আমি পাঠিয়ে দেব নরকে!'

গিরীন্দ্র অট্টহাস্য ক'রে বললে, 'হা-হা-হা-হা! তুচ্ছ, নশ্বর জীব! তুই ভয় দেখাচ্ছিস্‌ প্রেতপর্বতের প্রেতাত্মাকে? হা-হা-হা-হা-হা-হা।'

—'বেরিয়ে যা শয়তান! আমি তোকে থোড়াই কেয়ার করি!'

—'তোর শপথের কথা ভুলে যাচ্ছিস্‌ বুঝি? আমার মেয়ের ভালোমন্দের জন্যে দায়ী থাক্‌বি তুই-ই?'

—'প্রেতাত্মার কাছে শপথ? তার কোনই মূল্য নেই।'

—'মূল্য নেই? বেশ, বুঝতে পারবি মূল্য আছে কি না! তোর সন্তানদের মাংস ভক্ষণ করবে অরণ্যের শকুনী, গৃধিনী, নেকৃড়ে আর অন্যান্য হিংস্র পশুরা। তারা—'

—'এখনো বলছি শয়তান, বিদেয় হ!'

—'হা হা হা হা! তোর বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না।'

ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ছিল একখানা রাম-দা। বাবা চোখের নিমিষে হাত বাড়িয়ে সেই রামদা'খানা টেনে নিয়ে মাথার উপরে তুললেন। বাবার হাত এবং রাম-দা তীব্র বেগে নিচে নামল, গিরীন্দ্রের শরীর ভেদ ক'রে সেখানা সাঁৎ ক'রে চ'লে গেল—টাল্‌ সামলাতে না পেরে বাবা মাটির উপরে প'ড়ে গেলেন সশব্দে!

গিরীন্দ্রের দেহ অক্ষত—তার দেহ যেন বাতাস দিয়ে, ধোঁয়া দিয়ে

গড়া, শাণিত অস্ত্র তার কোনই ক্ষতি করতে পারে না! সে আবার বিকট স্বরে হা হা হা হা ক'রে হেসে বললে, 'ওরে নশ্বর জীব! কেবল তাদের উপরেই আমরা প্রভুত্ব করতে পারি যারা করেছে নরহত্যা! মানুষ খুন ক'রে তুই পালিয়ে এসেছিলি প্রেতপর্বতের কোলে? কর্ এইবারে শাস্তিভোগ! তোর দুই সন্তান গিয়েছে, তোর তৃতীয় সন্তানকেও রক্ষা করতে পারবি না—মর্বে, মর্বে, সেও মর্বে! তারও মাংসহীন হাড়গুলো প'ড়ে-প'ড়ে শুকোবে গভীর অরণ্যের মধ্যে! তোকেও আমি হত্যা করতে পারতুম অনায়াসেই—কিন্তু তা আমি করব না! তুই বেঁচে থাক্—সেইটেই তোর সব-চেয়ে-বড় শাস্তি। হা হা হা হা হা হা! তোকে হত্যা করাও তোর প্রতি দয়া করা—হা হা হা হা।'

পর-মুহূর্তে গিরীন্দ্রের মূর্তি মিলিয়ে গেল আমাদের চোখের সুমুখেই!

এর পর আর বিশেষ কিছু বলবার নেই। আগেই বলেছি বাবা গরিব ছিলেন না, পরদিনই তিনি সেই অভিশপ্ত অরণ্য ছেড়ে আমাকে নিয়ে চ'লে গেলেন একেবারে কাশীধামে। কিন্তু সেখানে গিয়েও তাঁর পরিণাম হ'ল না আনন্দজনক। কিছুদিন পরেই তিনি পাগলের মত হয়ে গেলেন এবং সেই অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হ'ল ভয়াবহ প্রলাপ বক্তে-বক্তে।

তারপর থেকে একাকী আমি দেশে-দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি স্রোতের শৈবালের মত। জীবনের আকর্ষণই আমার নেই—চেয়ে আছি কেবল মৃত্যুর দিকে।

বন্ধু, আমার কথা বিশ্বাস কর। যা স্বচক্ষে দেখেছি তাই বললুম। কখনো কি শুনেছ এমন জীবন-কাহিনী?

অবশিষ্ট

প্রমোদ বললে, 'শুনলে আমার সব কথা? এ-রকম অদ্ভুত জীবন-কাহিনী তুমি আর কখনো শুনেছ? এখন বল আমার কি করা উচিত?'

প্রফুল্ল জবাব না দিয়ে ভাবতে লাগল।

পৃথিবীর উপরে ঝরছে পূর্ণিমার ঝরণা। মহানদীর আলোকিত স্রোতের সঙ্গে নৌকো তখনো আপনি ভেসে যাচ্ছে লক্ষ্যহীনের মত।

প্রমোদ আবার বললে, 'আমারও জীবন হ'চ্ছে এই নৌকোর মত লক্ষ্যহীন! প্রফুল্ল, তুমিও তো বলতে পারলে না, আমার কি করা উচিত?'

—'প্রমোদ, বিবাহ কর, সংসারী হও। জীবন আর লক্ষ্যহীন ব'লে মনে হবে না।'

—'বিবাহ!'

—'বিবাহের নাম শুনেই অমন চম্‌কে উঠলে কেন?'

—'আমি করব বিবাহ! প্রফুল্ল, তুমি কি ভুলে যাচ্ছ প্রেতপর্বতের প্রেতাত্মা কি ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে গিয়েছে? আমার অকালমৃত্যু নিশ্চিত!

—'প্রমোদ, তুমি তো আর প্রেতপর্বতের এলাকায় বাস করছ না! এখানে কে তোমার উপরে প্রভুত্ব করতে পারবে?'

—'তুমি কি তাই মনে কর?'

—'নিশ্চয়ই করি!'

—'তবে আজ মনের ভিতরে আসন্ন-মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি কেন?'

—'ও তোমার মনের ভুল।'

—'ভুল নয় বন্ধু, ভুল নয়। চোখের সামনে দেখছি, আমার আর পৃথিবীর মাঝখানে একখানা কালো পর্দা নেমে আসছে ধীরে ধীরে।'

—'এমন পূর্ণিমার ভিতরেও তুমি আবিষ্কার করলে কালো পর্দা। তোমার কল্পনাশক্তি আছে বটে।'

—'আমার মাথা ঘুরছে, দম বন্ধ হয়ে আসছে।'

—'প্রমোদ, এখন বুঝছি তোমার জীবনকাহিনী শুনতে চেয়ে আমি বুদ্ধিমানের কাজ করিনি। তুমি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছ, অতীতের তুঃস্বপ্নের কথা বর্ণনা করতে-করতে তোমার মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। ওঠ, ধর হাল, নৌকো তীরে নিয়ে যাই।'

—'কেন ?'

—'তীরে নৌকো ভিড়িয়ে আমার সঙ্গে তুমিও নদীর ঠাণ্ডা জলে স্নান করবে। তোমার অলৌকিক কাহিনী শুনে আমারও মন যেন কেমন-কেমন করছে। স্নান করলে আমরা তুজনেই হয়তো কতকটা প্রকৃতিস্থ হ'তে পারব।'

—'জলে দেহ স্নিগ্ধ হ'তে পারে, কিন্তু মন কি ভিজবে প্রফুল্ল ?'

—'মনের উপরেও দেহের প্রভাব আছে বৈকি। ব্যাধি যখন দেহকে জীর্ণ করে মন তখন সুস্থ থাকে না।'

—'যখন এত ক'রে বলছ, তোমার আদেশই পালন করব।' এই ব'লে প্রমোদ উঠে হালের কাছে গিয়ে বসল।

তুই হাতের তুই দাঁড়ের দ্বারা নদীর জলে হীরক-চূর্ণ ছড়াতে ছড়াতে প্রফুল্ল নৌকো নিয়ে চলল তীরের দিকে।

যেখানে নৌকো ভিড়ল সেখানে দাঁড়িয়ে নীল অরণ্য স্নান করছিল চন্দ্রকিরণধারায়—সবুজপত্রের ছন্দে তাল রেখে গান গাইছিল রাতের গায়ক-পাখী। চারিদিকে ছড়িয়ে আছে একটি নিবিড় শান্তির মাধুর্য।

প্রমোদ নৌকো থেকে নেমে চারিদিকে চোখ বুলিয়ে গাঢ়স্বরে বললে, 'এই বিশ্বে আছে কত সৌন্দর্য, কত ঐশ্বর্য। কিন্তু আমি কিছুই গ্রহণ করতে পারলুম না।'

প্রফুল্ল জবাব দিলে না, সে তখন পিছন ফিরে নৌকোর দড়ীগাছা একটা গাছের গুড়ির সঙ্গে বাঁধতে ব্যস্ত ছিল।

আচম্বিতে একটা গুরু দেহপতনের শব্দ হ'ল—সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ ও ব্যাঘ্রের ভৈরব গর্জন।

অত্যন্ত চমকে ফিরে প্রফুল্ল কেবলমাত্র দেখতে পেলে, প্রকাণ্ড একটা ব্যাঘ্র প্রমোদের দেহ মুখে ক'রে বিদ্যুতের মত তীব্র-গতিতে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

খানিকক্ষণ আচ্ছন্নের মতন সে দাঁড়িয়ে রইল, নিজের চক্ষুকেই বিশ্বাস করতে পারলে না। তারপর শিশুর মতন কেঁদে উঠে যন্ত্রণা-বিকৃত-স্বরে বললে, 'প্রমোদ, প্রমোদ! তোমাকে তীরে এনে শেষটা আমিই তোমাকে হত্যা করলুম—উঃ!' জ্ঞান হারিয়ে সে প'ড়ে গেল নদীর বালুকাতটের উপরে।'

এই কাহিনী রচনায় ফ্রেডারিক মারিয়াটের একটি গল্পকে কঙ্কালের বা কাঠামোর মত ব্যবহার করেছি। আসল গল্পটি এদেশের তরুণদের বা আধুনিক-যুগের উপযোগী নয়—(মারিয়াটের মৃত্যু হয়েছে প্রায় এক শতাব্দী আগে)। এই বাংলা-গল্পটির সর্বত্রই আমি যে-সব ভাব, ভাষা, ঘটনা, বর্ণনা, ব্যবহার করেছি, মারিয়াটের কাহিনীর মধ্যে তা নেই।—লেখক।

এখন যাঁদের দেখছি

ঘরোয়া গানের সভা

নিজের স্মৃতি-মঞ্জুষার সঞ্চয়ই আমার অবলম্বন। কাজেই মাঝে মাঝে নিজের কথা না ব'লেও উপায় নেই। এবারেও নিজের প্রসঙ্গ নিয়েই লেখা শুরু করব।

আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব রাধিকানাথ রায় নিজেকে পণ্ডিতজন মনে না করলেও ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যে ছিলেন লব্ধপ্রবেশ। তাঁর রচনাশক্তিও ছিল। কখনো প্রকাশ করতেন না বটে, কিন্তু দার্শনিক প্রবন্ধ রচনা করতেন এবং সেগুলি সুলিখিত। তাঁর খুব একটি ভালো অভ্যাস ছিল। তিনি ধার ক'রে বই পড়তেন না, কিনে পড়তেন। ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত লেখকগণের গ্রন্থাবলী ছিল তাঁর সংগ্রহশালায়। সাহিত্য সাধনার প্রেরণা লাভ করেছি আমি আমার পিতৃদেবের কাছ থেকেই।

পিতৃদেবই আমার মনে বপন করেছেন সঙ্গীতের বীজ। তিনি নিজে যন্ত্রসঙ্গীতে ছিলেন বিশেষ পারদর্শী। অনেকরকম বাজনা বাজাতে পারতেন—বিশেষ ক'রে ফ্লুট ও এসরাজ বাদনে তাঁর নামডাক ছিল যথেষ্ট। এখনো চোখের সামনে দেখি, বাবা এসরাজ বাজাচ্ছেন, আর তাঁর দুই পাশে দাঁড়িয়ে আমার দুই ভগ্নী সমস্বরে গান গাইছে। এ ছিল প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। আমার জ্যেষ্ঠতাতপুত্র স্বর্গত সতীশচন্দ্র রায় ছিলেন গতযুগের একজন বিখ্যাত গায়ক। গ্রামোফোনের রেকর্ডেও তাঁর কয়েকটি গান তোলা আছে। সতীশদাদাকে নিয়ে বাবা প্রায়ই গান-বাজনার আয়োজন করতেন এবং নিজে বাজাতেন কোনদিন তবলা ও কোনদিন এসরাজ। গভীর রাত্রি পর্যন্ত গান-বাজনা চলত এবং আসরে থাকত না তিলধারণের ঠাঁই।

সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে অন্যান্য গায়করাও আসরের শোভাবর্ধন করতেন। বাল্যকাল থেকে এই পরিবেশের মধ্যে মানুষ হয়ে আমারও মনের ভিতরে গেঁথে গিয়েছিল গানের শিকড়।

আমার বয়স যখন বছর পনেরো, তখন গ্রামোফোনের মাধ্যমে স্বর্গীয় গায়ক লালচাঁদ বড়ালের নাম ফিরছে বাংলার ঘরে-বাইরে লোকের মুখে মুখে। তাঁর বসতবাড়ি ছিল প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীটে। একদিন সাহস সঞ্চয় ক'রে তাঁর কাছে গিয়ে ধরনা দিলুম। সিঁড়ি দিয়ে দ্বিতলে উঠে দেখলুম, একটি ঘরের দরজার সামনে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। সৌম্য মুখ, দোহারা চেহারা, সাজ-পোশাক বেশ ফিটফাট।

তিনি সুধোলেন, "কি দরকার বাবা?"

বললুম, "আজ্ঞে, আপনার কাছে গান শিখতে চাই।"

লালচাঁদবাবু স্মিতমুখে জানালেন, তিনি গুরুগিরি করেন না।

তারপর গেলুম তখনকার আর একজন প্রথম শ্রেণীর গায়ক স্বর্গীয় মহিম মুখোপাধ্যায়ের কাছে। তিনি স্বর্গীয় রাধিকা গোস্বামীর অন্যতম প্রধান শিষ্য। তাঁর গানের গলাও ছিল সুমধুর। তিনি আগে শুনতে চাইলেন আমার কণ্ঠস্বর। তারপর শুনে বললেন, "বেশ, আমি তোমাকে গান শেখাব।"

ব্রজদুলাল স্ট্রীটের একখানা ছোট বাড়িতে ছিল মহিমবাবুর সঙ্গীত-বিদ্যালয়। রাধিকা গোস্বামীও মাঝে মাঝে সেখানে এসে দুই-চারদিন থেকে যেতেন। গান শিখতে আসত সেখানে আরো কয়েকজন ছাত্র। তাদের সঙ্গে আমারও কিছুদিন কেটে গেল সেইখানেই।

কিন্তু বেশীদিন নয়। গান নিয়ে মেতে থাকতে থাকতেই আমার মনের মধ্যে প্রবলতর হয়ে উঠল সাহিত্যের নেশা। তানপুরা তুলে রেখে কাগজ, কলম ও দোয়াত নিয়েই আমার কেটে যেতে লাগল সারাক্ষণ। হাতমক্স করতে করতে আর গলা সাধবার সময় পেতুম না।

নিজে গায়ক হলুম না বটে, কিন্তু সঙ্গীতকে ভুলতে পারলুম না। ভালো গান শোনবার লোভে নানা আসরে গিয়ে হাজিরা দিতে

লাগলুম। তখনকার দিনে জলসার ছড়াছড়ি ছিল না। রঙ্গালয়ে শোনা যেত নিম্নতর শ্রেণীর গান এবং রঙ্গালয়ের বাইরে ঘরোয়া গানের সভা বসাতেন ধনী ব্যক্তিগণ বা সম্পন্ন গৃহস্থরা। আজ রঙ্গালয়ে গানের পাট প্রায় তুলে দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু চারিদিকেই দেখা যায় গানের অতি বাড়াবাড়ি। গ্রামোফোন আছে, সিনেমা আছে, রেডিও আছে, আর আছে বড় বড় সঙ্গীত-সম্মিলন। গান হয়ে উঠেছে সর্বসাধারণের সম্পত্তি। ফ্যালো কড়ি, মাখো তেল। আগে কড়ি ফেলতেন ধনীরা এবং তেল মাখতে পেতেন কেবল তাঁরাই, সমঝদার বলে যাঁদের আমন্ত্রণ করা হ'ত। এমন কথাও মাঝে মাঝে মনে হয়, একালে গানের আধিক্য হয়েছে যতটা, ততটা হয়নি গুণের আধিক্য। আজ স্বল্প জলেও পুঁটিমাছরা সাঁতার কাটতে পারে পরমানন্দে, কিন্তু সেকালের গুণীদের বৈঠকে স্বল্পবিদ্যার খাতির ছিল না।

শ্রীনির্মলচন্দ্র চন্দ্রের বাসভবনে তাঁর খুল্লতাত ব্যাচাবাবু মাঝে মাঝে যে মাইফেলের আয়োজন করতেন, অনায়াসেই এখনকার সঙ্গীতসম্মিলনীর সঙ্গে তার তুলনা করা যায়। কেবল কলকাতার বড় বড় গাইয়ে নন, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতশিল্পীরা আমন্ত্রিত হয়ে সেখানে যোগদান করতে আসতেন। আরো বড় বড় আসর ছিল। সঙ্গীতের প্রতি প্রভূত অনুরাগ থাকলেও একালের অধিকাংশ ব্যক্তিই সাধারণ সঙ্গীত-সম্মিলনে আসন গ্রহণ করতে পারেন না। কারণ ভালো আসনগুলি এমনি অগ্নিমূল্য যে মধ্যবিত্তদের চিত্তে আগ্রহ থাকলেও বিত্তে কুলায় না। কিন্তু সেকালে সুরসিকরা ট্যাঁক গড়ের মাঠ হ'লেও বড় বড় ঘরোয়া আসরে গিয়ে আসীন হ'তে পারতেন অনায়াসেই। এবং সঙ্গীতসুধার সঙ্গে সঙ্গেই থাকত কিছু কিছু 'অধিকন্তু'। অর্থাৎ বিনামূল্যে পানের খিলি ও সিগারেট প্রভৃতি। আগেকার ধনীদের দস্তুরমত দিল ছিল। এখনকার ধনীরা একলসেঁড়ে নিজের নিজের ফুর্তি নিয়েই মশগুল, পাঁচজনের সঙ্গে মিলেমিশে উৎসব করার কথা তাঁদের মনেও জাগে না।

আগেকার বদান্ততার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সাহিত্যগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন "বিচিত্রা বৈঠক"। সুপ্রশস্ত আসর—বৃহতী জনতারও স্থান সংকুলান হ'ত। সেখানে থিয়েটার হ'ত, যাত্রা হ'ত, নাচ হ'ত, দেশী-বিদেশী গুণীর গান হ'ত এবং সেই সঙ্গে হ'ত কবিতা বা নাটক বা গল্প বা প্রবন্ধ পাঠ ও বিবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা। বৈঠকের নিজস্ব ও প্রকাণ্ড পুস্তকাগারে যে সব মহার্ঘ্য গ্রন্থ রক্ষিত ছিল, কলকাতার কোন বিখ্যাত লাইব্রেরী-তেও তা পাওয়া যেত না। সভ্যরা ইচ্ছা করলেই যে কোন বই বাড়িতে নিয়ে যেতে পারতেন। 'বিচিত্রা'র সভ্য-শ্রেণীভুক্ত ছিলেন বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি—একাধারে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বরপুত্র। তাঁরা ইচ্ছা করলেই মুক্তহস্তে প্রচুর টাকা চাঁদা দিতে পারতেন। আবার সভ্যদের মধ্যে আমার মত এমন অনেক লোকও ছিলেন, যাদের ধন-গৌরব উল্লেখ্য নয় আদৌ। যিনি রাজাসনে ব'সে লক্ষ লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখেন এবং যারা স্বপ্ন দেখেন ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে, তাঁদের উভয়েরই সামনে ছিল 'বিচিত্রা'র দ্বার উন্মুক্ত। তাঁরা উভয়েই লাভ করতেন সেখানে সমান অধিকার, সমান ব্যবহার, সমান আতিথেয়তা। এবং তাঁদের কারুকেই ব্যয় করতে হ'ত না একটিমাত্র সোনার টাকা বা রূপোর টাকা বা কাণাকড়ি। 'বিচিত্রা'র বহু সভ্যই আজও ইহলোকে বিদ্যমান। কিন্তু অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠানের আয়োজন ক'রে তাঁদের চিত্তরঞ্জন করতে পারেন, এমন কোন ব্যক্তিই আজ বাংলাদেশে বর্তমান নেই। এখন যাঁদের দেখছি তাঁদেরও অনেকেই ব'সে আছেন টাকার পাহাড়ের টঙে। সোনাদানার ভার বইতে পারে তো গর্দভরাও, কিন্তু ললিতকলার আসরে রাসভ-সঙ্গীতের স্থান কোথায়?

গেলবারে সুকবি শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়ের কথা বলেছি। তাঁর শ্বশুর-বাড়ি শান্তিপুরে। একদিন তাঁর সঙ্গে আমরা দল বেঁধে সেখানে গিয়ে হাজির হলুম। শান্তিপুর হচ্ছে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান। চৈতন্য-দেবের পবিত্র পায়ের ধূলো বুকে নিয়ে শান্তিপুর পরিণত হয়েছে

বৈষ্ণবদের তীর্থক্ষেত্রে। এখানে আছে তাঁর অনেক অবদান। কিন্তু সে সব কিছুর জন্যে আমরা আকৃষ্ট হইনি শান্তিপুরের দিকে। আমরা বেরিয়ে পড়েছিলুম কলকাতার বাইরে গিয়ে খানিকটা হাঁপ ছাড়বার জন্যে। রাণাঘাট থেকে পদব্রজে চূর্ণি নদীর খেয়াঘাটের দিকে চল্লুম। চন্দ্রপুলকিত রজনী। পথের দুইধারে বনে বনে আলো-ছায়ার মিলনলীলা। চারদিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে সুরসংযোগ করছে গানের পাখীরা। এক জায়গায় বনের আড়ালে বেজে উঠল কার বাঁশের বাঁশী। সেই নিরালায় জ্যোৎস্নার বন্যায় মুরলীমুর্চ্ছনায় আমারও মন হয়ে উঠল সঙ্গীতময়। বাঁশীর তান তেমন মিষ্ট আর কখনও লাগেনি—বোধ করি এ স্থান-কালের গুণ। ঠিক সময়ে ঠিক সুরটি যদি প্রাণের তন্ত্রীতে এসে লাগে, তবে তা আর ভোলা যায় না।

কিন্তু সে যাত্রা আমাদের শান্তিপুরে যাওয়া সার্থক হয়েছিল আর একটি বিশেষ কারণে। শুনলুম বিখ্যাত হারমোনিয়াম বাদক (এখন স্বর্গীয়) শ্যামলাল ক্ষেত্রীর শিষ্য বীণবাবু (ভদ্রলোকের ডাকনামটিই কেবল মনে আছে) শান্তিপুরেই বাস করেন। সন্ধ্যাবেলায় আমরা দল বেঁধে তাঁর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলুম। আমাদের দলে ছিলেন "অর্চ্চনা"র সহকারী সম্পাদক স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস চন্দ্র, প্রসিদ্ধ গল্পলেখক ও অ্যাডভোকেট এবং "অর্চ্চনা"র সম্পাদক শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, কবি শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়, সাহিত্যিক শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় এবং আরো কেউ কেউ, সকলের নাম স্মরণে আসছে না।

কেউ ভালো হারমোনিয়াম বাজান, এটা বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক কথা নয়। বড় বড় ওস্তাদরা সুনজরে দেখেননি হারমোনিয়াম যন্ত্রটাকে। এদেশে তার আভিজাত্যও নেই, এক শতাব্দী আগেও এখানে হারমোনিয়ামের চলন ছিল না। শুনেছি এখানে তার আবির্ভাব হয় রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের আগ্রহে। অথচ রবীন্দ্রনাথ নিজেই পরে গানের বৈঠকে হারমোনিয়াম বর্জন করেছিলেন। আর সত্য কথা বলতে কি, এখানে হারমোনিয়ামের

অবস্থা হয়ে উঠেছে বেওয়ারিস মালের মত। যে পায় তাকে নিয়ে যখন-তখন অপটু হাতে টানা-হেঁচড়া করে ব'লে পাড়ার লোকের কাছে অনেক সময়ে যন্ত্রটা হয়ে ওঠে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক।

কিন্তু যথার্থ গুণীর হাতে পড়লে ঐ যন্ত্রই যে কি মন্ত্রশক্তি প্রকাশ করতে পারে, সেদিন বীণবাবুর বাজনা শুনেই তা প্রথম উপলব্ধি করতে পেরেছিলুম। নামেও বীণবাবু, তাঁর হাতের ছোঁয়ায় হারমোনিয়ামের ভিতর থেকেও জেগে উঠল যেন কোন্ নতুন বাজনা। ছন্দে ছন্দে ইন্দ্রজালের ব্যঞ্জনা। আমাদের বিস্ময়ের সীমা রইল না।

পরে বীণবাবুর সঙ্গে কলকাতাতেও দেখা হয়েছিল। তাঁর গুরু শ্যামলালবাবুর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করলুম। তিনিও আমাকে হ্যারিসন রোডে শ্যামলালবাবুর বাসায় নিয়ে গেলেন। অত্যন্ত অমায়িক প্রিয়দর্শন ভদ্রলোক, চারুকলাকে অবলম্বন ক'রে বিবাহ করতে ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁর আস্তানায় এসে ভারতের সর্বশ্রেণীর খ্যাতিমান সঙ্গীতশিল্পীরা জটলা করতেন। শ্যামলালবাবুকে দেখলুম বটে, কিন্তু তাঁর বাজনা শোনবার সুযোগ আর সেদিন হ'ল না, পরেও হয়নি।

স্বর্গীয় বন্ধুবর নরেন্দ্রনাথ বসুর বাসভবনে আমাদের একটি ঘরোয়া সঙ্গীতসভা ছিল। সেখানে উচ্চশ্রেণীর গানবাজনার আয়োজন হ'ত প্রতি শনিবারেই। বাংলার বাইরে থেকেও সেরা সেরা গুণীজনকে আমন্ত্রণ ক'রে আনা হ'ত। একদিন এসেছিলেন এক অতুলনীয় শিল্পী, তাঁর নাম সোনে কি সনি বাবু, ঠিক মনে করতে পারছি না, তিনি গয়ানিবাসী ভারতবিখ্যাত হারমোনিয়াম বাদক স্বর্গীয় হনুমানপ্রসাদের পুত্র। তিনিও যা বাজালেন নামেই তা হারমোনিয়াম, কিন্তু শোনালে এমন বেণুবীণার কাকলী যে, মন আমাদের ভেসে গেল সুরের সুরধ্বনির উচ্ছলিত ধারায়। তারপর কেটে গিয়েছে কত বৎসর, কিন্তু আজও সেই অমূর্ত্ত সুরের মায়া খেলা ক'রে বেড়ায় আমার মনের পরতে পরতে।

সাধারণ হারমোনিয়াম যে শিল্পীর সাধনায় একেবারেই অসাধারণ হয়ে ওঠে, আর একদিন তার প্রমাণ পেয়েছিলুম স্বর্গীয় সঙ্গীতাচার্য করমতুল্লা খাঁয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র রফিক খাঁয়ের বাজনা শুনে। তাও হচ্ছে অরূপ অপরূপ সুরবাহার।

বছর চারেক আগে সেরাইকেলায় গিয়ে আবার রফিক খাঁয়ের দেখা পেয়েছিলুম। তিনি তখন সেরাইকেলার রাজাসাহেবের বৈতনিক শিল্পী। সেবারে তাঁর একক বাজনা শোনবার সুযোগ পাইনি, অন্যান্য যন্ত্রীর সঙ্গে তিনি হারমোনিয়াম বাজালেন ছউ নৃত্যের তালে তালে। ঐকতানের মধ্যে শিল্পীর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আবিষ্কার করা দুষ্কর ব্যাপার।

এইবারে আমার নিজের বাড়ির গানের বৈঠকের কথা বলব। সেখানেও আপনারা দেখতে পাবেন আধুনিক যুগের বহু যশস্বী সঙ্গীত-শিল্পীকে।

কুমার শচীন্দ্র দেব-বর্মণ

আমার ঘরোয়া বৈঠকের শোভাবর্ধন করেছেন বাংলাদেশের বহু কীর্তিমান গায়কই। তাঁদের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্যক্তি হচ্ছেন স্বর্গীয় ওস্তাদ জমীরুদ্দীন খাঁ, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে ও শ্রীদিলীপকুমার রায় প্রভৃতি। তাঁদের কথা নিয়ে আগেই বিশেষভাবে আলোচনা করেছি ভিন্ন গ্রন্থে বা ভিন্ন প্রবন্ধে। প্রথমোক্ত দুই শিল্পী আমার বাড়িতে এসে যে কতবার সুরস্বর্গ সৃষ্টি করেছেন, তার আর সংখ্যা হয় না। একবার সবচেয়ে দীর্ঘ গানের মাইফেল চালিয়েছিলেন জমীরুদ্দীন খাঁ সাহেব। হারমোনিয়াম নিয়ে বসলেন এক দোলপূর্ণিমার দিন দুপুরে; তারপর রাত দুপুর ছাড়িয়েও চলল তাঁর গানের অবিরাম স্রোত। একাই বারো ঘণ্টারও বেশী গান গেয়েও তিনি শ্রান্ত হয়ে পড়েননি। জমীরুদ্দীন

ছিলেন বিস্ময়কর গায়ক এবং তাঁর গানের ভাণ্ডারও ছিল অফুরন্ত। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, অত্যন্ত মদ্যপানের ফলে প্রৌঢ় বয়সেই ফুরিয়ে যায় তাঁর পৃথিবীর মেয়াদ। তাঁর পুত্র বালিও একসঙ্গে পিতার দোষ ও গুণ দুয়েরই অধিকারী হয়েছিলেন। গাইতেন চমৎকার গান এবং করতেন অতিরিক্ত সুরাপান। তাঁকেও কাঁচা বয়সেই করতে হয়েছিল মহাপ্রস্থান। গায়ক সমাজে মৈজুদ্দীন খাঁ ছিলেন ঐন্দ্রজালিকের মত। এমন আশ্চর্য ছিল তাঁর অশিক্ষিতপটুত্ব, ভারতের যে কোন প্রথম শ্রেণীর ওস্তাদের সঙ্গে তিনি পাল্লা দিতে পারতেন। তিনি ছিলেন শ্রুতিধর। একবার মাত্র শ্রবণ করলেই বড় বড় রাগ-রাগিণীকে নিজের ক'রে নিতে পারতেন। কিন্তু সুরার স্রোতে সাঁতার দিয়ে তিনিও অকালে ভেসে গিয়েছিলেন পরলোকে। নট ও গায়ক বিশেষ ক'রে এই দুই শ্রেণীর শিল্পীর সামনেই সুরা খুলে দেয় সর্বনাশের পথ। শিল্পীর আর্টকেও ক'রে অবনত এবং শিল্পীর দেহকেও ক'রে অপহত। অথচ রঙ্গালয়ে এবং গায়ক সমাজেই দেখা যায় সুরার অধিকতর প্রভাব।

আধুনিক বাংলাদেশের একজন অতুলনীয় গায়ক হচ্ছেন শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়। প্রায় চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর আগে ফুটবল খেলার মাঠে প্রায়ই দেখতুম একটি গেরুয়াধারী ক্রীড়াকৌতুকপ্রিয় উৎসাহী তরুণকে—মাথায় তাঁর দীর্ঘকেশ, চক্ষে তাঁর বুদ্ধির দীপ্তি। তখন তাঁর নামধাম জানতুম না, কিন্তু জনতার ভিতর থেকে আলাদা ক'রে মনের পটে লিখে রেখেছিলুম তাঁর মুখচ্ছবি। বহুকাল পরে এক গানের আসরে আবার তাঁর দেখা পেলুম গায়করূপে। তখন তিনি বয়সে অধিকতর পরিণত বটে এবং তাঁর পরণেও নেই আর গেরুয়া, কিন্তু কিছু পরিবর্তিত হ'লেও সেই পূর্বদৃষ্টমূর্তি। তাঁর গানে তাঁর গলার কাজে মন হ'ল মুগ্ধ। নাম শুনলুম ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়।

তারপর ভীষ্মদেবের কণ্ঠে শুনেছি অনেক গান। তাঁর সঙ্গে পরিচয়ও হয়েছে। জেনেছি তিনি কেবল গীতিকার নন, একজন ভালো সুর-

কারও। যথাযথভাবে সুর সংযোগ ক'রে আমার কয়েকটি গানকে তিনি সমৃদ্ধ ক'রে তুলেছেন। এবং সেই গানগুলি তিনি যখন কারুর গলায় তুলে দিতেন, আমিও তখন মাঝে মাঝে হাজির থাকবার লোভ সামলাতে পারতুম না। আর, কোন লোকের সঙ্গে তিনি একদিন আমার বাড়িতেও পদার্পণ করেছিলেন। কিন্তু সে ছিল অপরাহ্নকাল, গান শোনবার সময় নয়। তিনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন আর একদিন এসে গান শুনিয়ে যাবেন।

কিন্তু ঐ পর্যন্ত। তার কিছুকাল পরেই গৃহাশ্রম এবং সঙ্গীতসাধনা ত্যাগ ক'রে ভীষ্মদেব প্রস্থান করলেন পণ্ডিচেরিতে। সুরসৃষ্টিতে ভীষ্মদেবের শক্তিমত্তা দেখে তাঁর কাছ থেকে অনেক আশাই ক'রে-ছিলুম। কিন্তু আমাদের সে আশায় ছাই দিয়ে তিনি অবলম্বন করলেন মৌনব্রত। ফুল ফুটতে ফুটতে হঠাৎ পণ ক'রে বসল—আর আমি ফুটব না। তার ফলে আখেরে তাঁর কি লাভ হ'ল জানি না, কিন্তু বাংলাদেশ বঞ্চিত হ'ল এক উদীয়মান সঙ্গীতশিল্পীর পূর্ণতাপ্রাপ্ত অবদান থেকে। শিল্পীর সাধনা হচ্ছে শিল্পের মধ্য দিয়েই, শিল্পকে ত্যাগ ক'রে নয়। এদেশেই বিশেষ করে একথা খাটে। সঙ্গীতের মাধ্যমেই আত্মপ্রকাশ ক'রে গিয়েছেন সাধক রামপ্রসাদ। কীর্তন হচ্ছে বাংলাদেশের নিজস্ব সঙ্গীত পদ্ধতি। চৈতন্যদেব ঐহিক সব-কিছুই ছাড়তে পেরেছিলেন, কিন্তু ছাড়তে পারেন নি কীর্তনকে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাধনমার্গেও সঙ্গীত করেছিল বিশেষ সহ-যোগিতা। ভারতবর্ষ সঙ্গীতের ভিতর দিয়েই লাভ করে পরমার্থ।

ভীষ্মদেব আবার অরবিন্দ-আশ্রম ছেড়ে গৃহাশ্রমে প্রত্যাগত হয়েছেন। কিন্তু তিনি যে সঙ্গীতজগতে পুনরাগমন করেছেন, এমন সংবাদ পাইনি।

আধুনিক গায়কদের মধ্যে কুমার শ্রীশচীন্দ্র দেব-বর্মণের পসার হয়েছে যথেষ্ট। তিনি আগে ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্রের শিষ্য, তারপর তালিম নেন ভীষ্মদেবের কাছে। ত্রিপুরার রাজবংশে তাঁর জন্ম, কিন্তু আলস্য

চর্চা না ক'রে তিনি সঙ্গীতকেই করেছেন জীবনের সাধনা।

আজকাল রেকর্ড, রেডিও ও সিনেমার প্রসাদে অরসিকদের জনতার মাঝখানে এরণ্ডরাও মহামহীরুহের অভিনন্দন আদায় ক'রে নিতে পারছে। যেখানে সম্মানিত হন না সুশিক্ষিত প্রাচীন সঙ্গীতকুশলীরা, সেখানে যশের মাল্য প'রে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা কুড়োতে দেখি এইসব আনাড়ী অর্বাচীনদের। মাত্র একটি কারণেই তাঁরা পারানি না দিয়েও নদী পার হবার সুযোগ পান এবং সে কারণটি হচ্ছে, তাঁদের গলা তৈরি না হ'লেও শুনতে মধুর। আগেও এ শ্রেণীর গাইয়ের অভাব ছিল না। কিন্তু যেমন মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত, কচি ও কাঁচা-মিষ্ট গলার জোরে তাঁরা বড় জোর বসবার জায়গা পেতেন আমুদে ছোকরাদের আড্ডাখানায়। বড় বড় সার্বজনীন আসরে কলকে পাবার জো ছিল না তাঁদের। কিন্তু এখন সে সব জায়গাতেও তাঁদের দেখা পাওয়া যায়।

শচীন্দ্রদেব ঐ শ্রেণীর গায়ক নন। গান ও কণ্ঠস্বর নিয়ে প্রভূত অনুশীলন করেছেন ব'লেই সাধনমার্গে তিনি নিশ্চিত পদে অগ্রসর হ'তে পেরেছেন। বড় দরদী তাঁর কণ্ঠস্বর, একটু ভাঙা ভাঙা—কিন্তু তাতেই বেড়ে ওঠে যেন তার মাধুর্য। উপরন্তু তাঁর আছে নিজস্ব গাইবার ভঙ্গি, গান শুনলেই গায়ককে চেনা যায়।

যতদূর মনে পড়ে, প্রায় ছাব্বিশ-সাতাশ বৎসর আগে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে'র সঙ্গে সর্বপ্রথম তিনি আমার বাড়িতে পদার্পণ করেন। একজন উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীতশিল্পী ব'লে বাজারে আজ তাঁর প্রচুর খাতির, কিন্তু সেদিন তাঁর এতটা খ্যাতি ছিল না। তখন তিনি ছিলেন শিক্ষার্থী, কিন্তু শচীন্দ্রদেবের গান শুনেই আমার বুঝতে বিলম্ব হয়নি যে, ভবিষ্যৎ তাঁর সমুজ্জ্বল।

আমি ভালোবাসতুম তাঁর কণ্ঠে সুরের খেলা এবং তিনি ভালো-বাসতেন আমার রচিত গানের কথা। স্বাভাবিকভাবে দু'জনেই আকৃষ্ট হলুম দু'জনের দিকে। দেখতে দেখতে সুদৃঢ় হয়ে উঠল আমাদের

বন্ধুত্ববন্ধন। তারপর থেকে আমন্ত্রণে বা বিনা আমন্ত্রণেই আমার বাড়িতে হ'তে লাগল তাঁর ঘন ঘন আবির্ভাব। এবং কিছুদিন তাঁকে দেখতে না পেলে আমিও গিয়ে উপস্থিত হতুম তাঁর কাছে।

আমার বাড়িতে প্রায়ই বসত তাঁর গানের আসর। অন্যান্য গায়করাও থাকতেন। শচীন্দ্রদেবকে দেখলেই—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমার চিত্ত পিপাসিত হয়ে উঠত গীতসুধার তরে। তিনিও সঙ্গীত ধরতেন তদ্‌গত-চিত্তে এবং নৃত্য করতে থাকত শ্রোতাদেরও চিত্তশিখী। গানে গানে সুরের টানে মন চ'লে যেত অরূপসায়রে রূপের সন্ধানে। গান অমূর্ত আর্ট বটে, কিন্তু তার ভিতরেও কি মূর্তি খুঁজে পাওয়া যায় না?

"এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর।"

গায়কের কণ্ঠ যখন সুরে সুরে এই কথাগুলি নিয়ে খেলা করে, তখন কি ঝর ঝর বাদল ধারায় অভিষিক্ত নির্জন পল্লীপ্রকৃতির মাঝখানে শূন্য কোন ঘরে কান্তহীন শয্যার উপরে একাকিনী ব'সে থাকতে দেখি না এক বিরহিণী নারীকে? শিল্পীর সঙ্গীতে অরূপই হয় রূপায়িত।

সুরকাররূপেও শচীন্দ্রদেব অল্প শক্তির পরিচয় দেননি। তাঁর অধিকাংশ বাংলা সঙ্গীতে সুরসংযোগ করেছেন তিনি নিজেই। গানের কথাকে ক্ষুণ্ণ না ক'রেও সুরকে ফুটিয়ে তোলবার নিপুণতা আছে তাঁর অসাধারণ।

"বুলবুলিকে তাড়িয়ে দিলে
ফুলবাগানের নতুন মালী"

এবং

আজকে আমার একতারাতে,
একটি যে নাম বাজিয়ে চলি
কাজলকালো বাদল-রাতে"—

আমার এই দুটি গানে সুরসংযোগ ক'রে শচীন্দ্রদেব যেদিন আমাকে

শুনিয়ে গেলেন, সেদিন তাঁর এই নূতন শক্তির পরিচয় পেয়ে আমি বিস্মিত হয়েছিলুম।

তারপর—

"ও কালো মেঘ, বলতে পারো
কোন্ দেশেতে থাকো ?"

আমার এই গানটিতে সুর দিয়ে শচীন্দ্রদেব যখন হিন্দুস্থান রেকর্ডের মাধ্যমে নিজেই গেয়ে শোনালেন, তখন শ্রোতাদের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন প্রচুর সাধুবাদ। সুরের ও গাওয়ার গুণে গানটিই কেবল অতিশয় লোকপ্রিয় হয়নি, শচীন্দ্রদেবেরও নাম ফিরতে লাগল সঙ্গীত-রসিকদের মুখে মুখে।

আধুনিক কাব্যগীতিতে সুরসংযোগ করবার পদ্ধতিটি শচীন্দ্রদেব দক্ষতার সঙ্গে আয়ত্তে আনতে পেরেছেন। আগে বাঁধা সুরের কাঠামোর উপরে যে কোন গানকে বসিয়ে দেওয়া হ'ত। রামপ্রসাদী সুর হচ্ছে এরকম কিন্তু তা সংযোগ করা হয় রামপ্রসাদের যে কোন গানের কথার সঙ্গে এবং সে সব গান ভক্তিরসপ্রধান ব'লে শুনতে বেখাপ্পা হয় না। কিন্তু সাধারণ প্রেমের গানে সে সুর কেবল অচল হবে না, হবে রীতিমত হাস্যকর। ওস্তাদদের আমি গম্ভীর বাঁধা সুর বসিয়ে গম্ভীরভাবে এমনি অনেক হাস্যকর গান গাইতে শুনেছি। উচ্চতর সঙ্গীতের সেকেলে আসরে কথার দৈন্যকে আমলে না এনে সুরের প্রাধান্য দেখেই সবাই ধন্য ধন্য রব ক'রে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই শ্রেণীর একটি হিন্দী গান উদাহরণরূপে উদ্ধার করেছেন,—"কারি কারি কমরিয়া গুরুজি মোকো মোল দে—অর্থাৎ কালো কালো কম্বল গুরুজি আমাকে কিনে দে।" এমনি সব কাব্যগন্ধহীন রাবিসের সঙ্গেও ভালো ভালো সুর জুড়ে শ্রোতাদের শ্রবণবিবরে নিক্ষেপ করা হয় এবং কেউ আপত্তি তো করেই না, বরং তারিফ ক'রে নিজের রসিকতার প্রমাণ দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

উচ্চতর মনীষার জন্যে ভারতবর্ষে বাঙালীর একটা সুনাম আছে।

তাই পূর্বোক্ত পদ্ধতির বিরুদ্ধে সর্বপ্রথমে বিদ্রোহ প্রকাশ করলেন বঙ্গদেশীয় সঙ্গীতশিল্পীগণ। রবীন্দ্রনাথ বললেন, "সুরের সঙ্গে কথার মিলন কেউ রোধ করতে পারবে না। ওরা পরস্পরকে চায়, সেই চাওয়ার মধ্যে যে প্রবল শক্তি আছে, সেই শক্তিতেই সৃষ্টির প্রবর্তনা।" তিনি নিজে অগ্রনেতা হয়ে সুকৌশলে মিলিয়ে দিলেন কথাকে সুরের এবং সুরকে কথার সঙ্গে। এই বিভাগে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ আরো কারুর কারুর দানকেও অসামান্য বলা চলে। এঁদের চেষ্টাতেই ভারতীয় সঙ্গীতে 'কাব্যগীতি' নামে নূতন সম্পদ আবিষ্কৃত হয়েছে। সেই ঐতিহ্যের অনুসরণ ক'রেই পরে স্বর্গত সুরসাগর হিমাংশু দত্ত, নজরুল ইসলাম ও শচীন্দ্রদেব প্রভৃতি সুরকারগণ বাংলা গানের আসরকে জমিয়ে তুলেছেন।

অতি-আধুনিক যুগের গায়কদের মধ্যে সর্বপ্রথমে নাম করতে হয় কুমার শচীন্দ্রদেবেরই। সঙ্গীতবিদ শ্রীদিলীপকুমার রায় লিখেছেন: "বাংলা গানের গড়ন আগের চেয়ে উঁচুতে উঠেছে—সঙ্গে সঙ্গে সুর-বিহার কণ্ঠকৃতিত্বেও নানা স্থলেই অভাবনীয় রংবাহারের দীপ্তি ঝিলিক দেয় থেকে থেকে। একথা সব চেয়ে বেশী মনে হয় কুমার শচীন্দ্র দেব-বর্মণের কলকণ্ঠে কোনো কোনো বাংলা গান শুনতে শুনতে।

কিন্তু একটা কথা ভেবে আশঙ্কা হচ্ছে। শচীন্দ্রদেবও পড়েছেন সিনেমার প্রেমে। আজ কিছুকাল যাবৎ দক্ষিণ ভারতীয় চিত্রশালার সঙ্কীর্ণ পরিবেশের মধ্যে কালযাপন করছেন, সিনেমাওয়ালাদের জন্যে যোগান দিচ্ছেন ফরমাজী মাল। সিনেমা ফেরি করে হেটো মাল এবং সঙ্গীতকলা নয় হেটো জিনিস। সিনেমার কবলে পড়লে দুর্গতি হয় চারুকলা।

ঘরোয়া বৈঠকের শিল্পীগণ

এই প্রবন্ধমালায় মাঝে মাঝে এমন কারুর কারুর কথাও কিছু কিছু বলতে হচ্ছে, যাঁরা আর ইহলোকে বাস করেন না। কিন্তু এত অল্পদিন আগেই তাঁরা দেহত্যাগ করেছেন যে, মন যেন তাঁদের অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করতে রাজি হয় না। কোন মানুষই এই মানসিক দুর্বলতাকে পরিহার করতে পারে না। প্রিয়জনের মৃত্যুর পরেও কিছুদিন ধ'রে মনে হয়, যেন তাঁরা আমাদের সামনে না থাকলেও কাছাকাছি কোথাও বিদ্যমান আছেন, হয়তো এখনি তাঁর সঙ্গে আবার দেখা হ'তে পারে। এমন সন্দেহ যুক্তিহীন হ'লেও স্বাভাবিক। এবং তা গভীর শোকের মধ্যেও করে কতকটা সান্ত্বনার সঞ্চার।

কিছুদিন আগে সুরসাগর হিমাংশু দত্তের মৃত্যুসংবাদ পেয়েছি, কিন্তু এখনো মনে হয় না তিনি পৃথিবী থেকে মহাপ্রস্থান করেছেন। চোখের সামনে না থাকলেও যেন তিনি শহরেরই কোন একান্তে ব'সে এখনো নূতন নূতন গানে করছেন নূতন নূতন সুরসংযোগ।

আকারে ছোটখাটো, শান্তশিষ্ট, মৃদুভাষী, সুদর্শন মানুষটি। তরুণ বয়সেই প্রবীণ শিল্পীর মত সুরসৃষ্টি করবার ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। তাঁকে মনে হলেই আমার স্মরণ হয় রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দৌহিত্র, সঙ্গীতকলাবিশারদ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের কথা। যৌবনসীমা পার হ'তে না হ'তেই তিনিও ধরাধাম ত্যাগ করেছেন, জনসাধারণের কাছে সুপরিচিত হবার আগেই। তবে বাংলা রঙ্গালয়ে যাঁরা "মুক্তার মুক্তি", "বসন্তলীলা" ও "সীতা" প্রভৃতি নাটক-নাটিকার গান শুনেছেন, তাঁরা সুরকার গুরুদাসের কিছু কিছু

পরিচয় পেয়েছেন।

আমার রচিত উপন্যাসকে যখন কালী ফিল্মস "তরুণী" নামক চিত্রে রূপায়িত করে, তখন তার কয়েকটি গানে সুর-সংযোজনার ভার নেন হিমাংশু দত্ত। সেই সময়ে কালী ফিল্মসের স্টুডিয়োতেই হিমাংশু দত্তের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। তাঁর সুর দেবার শক্তি ও শিল্পীসুলভ সংলাপ আমাকে আকৃষ্ট করে। দুদিন পরেই বুঝতে পারলুম, দেশী গান সম্বন্ধে সুপণ্ডিত হয়েও তিনি গোঁড়া ওস্তাদদের মত ছুঁতমার্গের ধার ধারতেন না, স্বীকার করতেন আধুনিক যুগধর্ম। দরকার হ'লে উচ্চশ্রেণীর কলাবিদের মত পাশ্চাত্য সঙ্গীতের কোন কোন বিশেষত্বকে একেবারে ঘরোয়া জিনিস ক'রে নিতে পারতেন। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের মত তিনিও য়ুরোপীয় সঙ্গীতে লব্ধপ্রবেশ ছিলেন কি না বলতে পারি না, তবে বিলাতী সুরের সঙ্গে তিনি যে সুপরিচিত ছিলেন, এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই।

মাঝে মাঝে তিনি আমার বাড়িতে এসেছেন এবং আমার অনুরোধে গানও গেয়েছেন কিন্তু মৃদুকণ্ঠে। আমার রচিত আর একখানি চিত্র-নাট্যের (শ্রীরাধা) গানেও তিনি চমৎকার সুর দিয়েছিলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর একজন স্থায়ী সুরকারের দরকার হয়, আমি কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁরই নাম বলি। তাঁরা উপযুক্ত পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা ক'রে তাঁকে নিয়ে যান।

কিছুদিন পরে হিমাংশু দত্ত এসে বললেন, "হেমেন্দ্রবাবু, আমি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ছেড়ে দিয়েছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বনিবনাও হ'ল না বুঝি?"

তিনি বললেন, "না, তা নয়। বাংলা আর হিন্দী ছবির রাশি রাশি গানে খুব তাড়াতাড়ি সুর দেবার ভার পড়ত আমার উপরে। যেমন তেমন ভাবে তাড়াহুড়ো ক'রে সুর দিয়ে আমি আনন্দ পাই না। কাজেই আমার পোষালো না।"

খাঁটি শিল্পীর উক্তি—সচরাচর যা শোনা যায় না। আর্টের মস্ত শত্রু হচ্ছে, ব্যস্ততা। কিন্তু এদেশের সাধারণ রঙ্গালয়ে এবং চলচ্চিত্র-শালায় ও-যুক্তি খাটে না। মার্কামারা পেশাদার না হ'লে কোন শিল্পীই সেখানে তিষ্ঠোতে পারে না। দরকার হ'লে সেখানে দুই-এক দিনের মধ্যেই তিন-চারটে নাচ বা গানের কাজ সেরে ফেলতে হয়। থিয়েটার বা সিনেমার কাজ যেমন তেমন ক'রে চলে যায় বটে, কিন্তু শিল্পী বোঝেন, তাঁর কাজ হ'ল নিম্নশ্রেণীর। পেশার খাতিরে পেটের দায়ে সাধারণ শিল্পীরা এ বিষয় নিয়ে উচ্চবাচ্য করেন না, কিন্তু হিমাংশু দত্ত ছিলেন অসাধারণ শিল্পী।

নজরুল ইসলামের বেলায় দেখেছি এর ব্যত্যয়। তিনি যে অসাধারণ শিল্পী সে কথা বলা বাহুল্য। কিন্তু তাঁর মনে গানের কথার সঙ্গে সুর আসত জোয়ারের মত। কতদিন দেখেছি, রীতিমত জনতা ও হরেক রকম বেসুরো গোলমালের মধ্যে অম্লানবদনে ব'সে তিনি রচনা ক'রে যাচ্ছেন গানের পর গান। দেখে অবাক্ হতুম, কারণ আমি নিজে তা পারি না। নির্জন জায়গা না পেলে আমার কলমই সরে না।

আর কেবলই কি গান? সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত অনায়াসে সুর রচনা করতেন নজরুল। প্রথম প্রথম মনে করতুম, চলতি সব বাঁধা সুরের সঙ্গেই তিনি নিজের গানের কথাগুলি গেঁথে নিতেন। এমন বিশ্বাসের কারণও ছিল।

একদিন মেগাফোন রেকর্ডের কার্যালয়ে ব'সে আছি, একজন তরুণী মুসলমান গায়িকার কণ্ঠ পরীক্ষা হচ্ছে। তিনি একটি উর্দু গান গাইলেন, শুনে সচকিত হয়ে উঠলুম। সে গানের সুরের সঙ্গে নজরুলের "মোর ঘুমঘোরে এলে প্রিয়তম" নামে বিখ্যাত গানটির সুর অবিকল মিলে গেল। জিজ্ঞাসা ক'রে জানলুম, উর্দু গানটি নূতন নয়। বোঝা গেল, নিজের গানের সঙ্গে নজরুল উর্দু গানটির সুর হুবহু চালিয়ে দিয়েছেন। এ কাজ তিনি কেবল একলাই করেননি,

বাংলাদেশের আরো বহু বিখ্যাত গীতিকারই উর্দু বা হিন্দী গানের সুর ধার ক'রে বাংলা গান শুনিয়েছেন। এমন কি রবীন্দ্রনাথেরও প্রথম দিকের কোন কোন গানে এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যেতে পারে।

গোড়ার দিকে নজরুলও হয়তো তাই করতেন। কিন্তু তারপর নিয়মিতভাবে সঙ্গীত অনুশীলনের ফলে তাঁর কণ্ঠ হয়েছিল স্বাধীন সুরের প্রস্রবণের মত। তখন তিনি আর পরের ধনে পোদ্দারি করতেন না, নিজেই করতেন সুরসৃষ্টি। হাতে নাতে আমি তার প্রমাণ পেয়েছি। শ্রীমন্মথনাথ রায়ের 'কারাগার' নাটকের জন্যে আমি দশটি গান রচনা করেছিলুম, একটি গানে সুর দিই আমি নিজেই। বাকি নয়টি গানে সুর দেবার ভার নিলেন নজরুল। যখন তিনি সুর দিতেন, আমি বসে থাকতুম তার পাশে। নানা শ্রেণীর গান ছিল—গম্ভীর, চটুল, প্রেমের, হাসির। চাল আর ছন্দও ছিল ভিন্ন ভিন্ন। কোন চলতি বাঁধা সুর কিছুতেই আমার বিভিন্ন গানের কথার সঙ্গে খাপ খেত না। কিন্তু নজরুল আমার গানের কথাগুলি পড়ে নিয়ে প্রত্যেক গানের ভাব, চাল ও ছন্দ অনুসারে এত সহজে ঠিক লাগসৈ সুর বসিয়ে যেতে লাগলেন যে, বিস্মিত না হয়ে পারলুম না। গানের সুর শুনে অভিভূত হ'ত দর্শকরা।

'পায়ে পায়ে বাজে লোহার শিকল,
তালে তালে তার আমরা গাই—
শিকলের গান—শিকলের গান,
শিকলের গান শোনাব ভাই!'

এই জাতীয় ভাবোদ্দীপক গানটিতে নজরুলের দেওয়া অপূর্ব সুর রঙ্গমঞ্চের উপরে যে উদ্দীপক ভাব সৃষ্টি করত, তা এখনো আমার মনে আছে। কিন্তু প্রথম কয়েক রাত্রির পরে আমার ঐ গানে ইংরেজ গভর্নমেণ্ট রাজদ্রোহের গন্ধ আবিষ্কার করেন এবং তা নিষিদ্ধ হয়।

কাব্যকার, গীতিকার ও সুরকার নজরুল সাধারণ মানুষ হিসাবে চপলতায় ও দুরন্তপনায় ছিলেন অদ্বিতীয়। আর কোন কবিকে তাঁর

মত মন খুলে হো হো করে অট্টহাস্য করতে শুনিনি। প্রায় প্রৌঢ় বয়সেও তিনি ছিলেন বিষম দামাল। আমার বাড়িতে শেষ যেদিন তাঁর গানের সভা বসে, সে দিনের কথা স্মরণ হচ্ছে। অনেক রাত্রে গান বন্ধ হ'ল। তাঁর সঙ্গে সেদিন ছিলেন আমার আর এক গায়ক বন্ধু শ্রীজ্ঞান দত্ত (এখন তিনি দক্ষিণ ভারতে চলচ্চিত্র জগতের সুরকার)।

নজরুল বললেন, 'হেমেনদা, রাত হয়েছে, আজ এইখানেই আমার আহার আর শয়ন। জ্ঞানও থাকবে।'

এ রকম প্রস্তাব নতুন নয়। তাঁদের দুজনের জন্যে ত্রিতলের শয়নগৃহ ছেড়ে দিয়ে আমি নেমে এলুম দোতলায়।

গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল আচমকা। ত্রিতলে থেকে দুড়ুম দুড়ুম ক'রে শব্দ হচ্ছে আর সারা বাড়ি কেঁপে কেঁপে উঠছে।

তাড়াতাড়ি উপরে ছুটে গিয়ে শয়নগৃহের দরজায় ধাক্কা মারতে মারতে বললুম, 'ওহে কাজী, কাজী! ব্যাপার কি? তোমরা দুজনে কি মারামারি করছ?' নজরুল দরজা খুলে দিয়ে হোহো ক'রে হেসে উঠলেন।

না, মারামারি নয়। নজরুল ও জ্ঞান কেউ কারুকে খাটে শুয়ে ঘুমোতে দিতে রাজি নন। একজন খাটে উঠলেই আর একজন তাঁকে ধাক্কা মেরে মেঝের উপরে ফেলে দেন। বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলছে এই কাণ্ড।

মার্গ সঙ্গীতের অন্তর্গত হলেও টপ্পাকে বনেদী গান বলে মনে করা হয় না, কারণ বয়স তার বেশী নয়। কিন্তু বাংলাদেশের জনসাধারণের ধাতের সঙ্গে ধ্রুপদের ও খেয়ালের চেয়ে টপ্পা বেশী খাপ খায় বলে এক-সময়ে এখানে টপ্পার চলন হয়েছিল যথেষ্ট। বাংলায় টপ্পার গান বেঁধে কীর্তিমান হয়েছেন অনেকেই এবং তাঁদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন রামনিধি গুপ্ত বা নিধিবাবু। তাঁর কোন কোন গান সুরকে ত্যাগ করে কেবল কথার জন্যে সাহিত্যেও স্থায়ী আসন লাভ করেছে। নটনাট্যকার গিরিশচন্দ্র প্রমুখ লেখকরাও নিধুবাবুর প্রভাব এড়াতে পারেননি।

আমাদের বাল্যকালেও নিধুবাবুর টপ্পা শুনতুম যেখানে সেখানে। কিন্তু আমাদের অতি আধুনিক কবিরা টপ্পার গান রচনা করেন না এবং অতি-আধুনিক গায়করাও বিশেষ ঝোঁক দেন না টপ্পার দিকে। আমি কিন্তু টপ্পা ভালোবাসি, তাই কিছু কিছু টপ্পার গান বেঁধেছি এবং সেগুলি গায়কপ্রবর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দের কণ্ঠে আশ্রয়লাভ করেছে। টপ্পা হচ্ছে ঠুংরীর অগ্রদূত, ওর দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত।

অনেক দিন পরে আমাদের আসরে এসে নিধুবাবুর টপ্পা শুনিয়ে গিয়েছিলেন শ্রীকালী পাঠক। আধুনিক গায়কদের মধ্যে তাঁকে টপ্পার অন্যতম প্রধান ভাণ্ডারী বলা চলে। বেশ মিষ্ট গলা তাঁর। গ্রামোফোন ও রেডিয়োর মাধ্যমে তাঁর গান সুপরিচিত হয়েছে। তাঁর জন্যেও আমি গান রচনা করেছি। সম্প্রতি এক আধুনিক যাত্রার আসরে তাঁর অন্য শ্রেণীর গানও শুনে এসেছি। গুণী লোক।

আমার বাড়ির আসরে এসে আসীন হয়েছেন আরো অনেক সুগায়ক, সকলের পরিচয় দেবার জায়গা হবে না। শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আর দেখা হয় না, তাঁর নামও শুনি না। মাঝে মাঝে তিনি এসে রবীন্দ্রনাথের গান শুনিয়ে যেতেন তাঁর সুকণ্ঠে রবীন্দ্র-গীতি ভালো লাগত। শ্রীবিজয়লাল মুখোপাধ্যায় এবং কে. মল্লিক গ্রামোফোনের রেকর্ডে গান গেয়ে একসময়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন, তাঁরাও আমার আমন্ত্রণ রক্ষা করেছেন। শ্রীজ্ঞান দত্ত ও শ্রীধীরেন দাস তো প্রায়ই দেখা দিতেন। উদীয়মান অবস্থায় অকাল-মৃত হরিপদ বসু, শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী ও শ্রীঅনুপম ঘটকও আমার বাড়িতে পদার্পণ করেছেন। আরো অনেকে আসতেন, কিন্তু নামের ফর্দ আর বাড়িয়ে কাজ নেই।

আজ ভাঙা হাটে একলা বসে সে-সব দিনের কথা স্বপ্ন বলে মনে হয়, এখনো মাঝে মাঝে কেউ কেউ দেখা দিয়ে যান বটে, কিন্তু ভাঙা আসর আর জমে না।

সজনীকান্ত দাস

লিখতে লিখতে একটা কথা মনে হ'চ্ছে, তাও এখানে লিখে রাখিনা কেন?

অর্ধশতাব্দী আগে যখন আমার সাহিত্য-জীবনের সূত্রপাত হয়, সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্রের পরলোকগমনের পর তখনও এক যুগ অতীত হয়নি। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব উত্তরোত্তর বেড়ে উঠছিল বটে, কিন্তু তখনও এখানে সাহিত্যাচার্য এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যশিল্পী রূপে অভিনন্দিত হতেন বঙ্কিমচন্দ্রই। তাঁর সহকর্মী বা সমসাময়িকদের অধিকাংশই তখনও সশরীরে বর্তমান। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত সাহিত্যে ও শিল্পে স্বনামধন্য অধিকাংশ ব্যক্তির সঙ্গেই সংযোগস্থাপনের দুর্লভ সুযোগ আমি লাভ করেছি এবং এই সৌভাগ্যের জন্যে আত্মপ্রসাদও অনুভব করি মনে মনে গত অর্ধশতাব্দী ধ'রে অতীতের ও বর্তমানের নানাশ্রেণীর ধুরন্ধরদের আমি নিজে যেমন ভাবে দেখেছি, ঠিক সেই ভাবে দেখবার জন্যেই গ্রন্থে প্রকাশিত এই প্রবন্ধগুলি লিখিত হয়েছে। 'যাঁদের দেখেছি' এবং 'এখন যাঁদের দেখছি' এই দুইখানি পুস্তকের মধ্যে আমি সাজিয়ে রাখলুম অর্ধশতাব্দীর সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ছবির মালা। জীবনের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে, পাছে আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এই সব ব্যক্তিগত ছবি লুপ্ত হয়ে যায়, তাই সময় থাকতে থাকতেই কাগজ-কলম দিয়ে এগুলিকে এঁকে রাখবার চেষ্টা করছি।

সাহিত্যক্ষেত্রে এবং ব্যক্তিগত কার্যক্ষেত্রকে অনেকে পৃথক ক'রে দেখতে অভ্যস্ত নন। তাই সময়ে সময়ে জীবনের শান্তিভঙ্গ হয়। একাধিক পত্রিকায় সমালোচকের কর্তব্য পালন করতে গিয়ে হারিয়েছি আমি একাধিক বন্ধুকে। আমি তাঁদের এখনো বন্ধু ব'লেই মনে করি, কিন্তু আমার সমালোচনা তাঁদের মনের মত হয়নি ব'লে তাঁরা আমাকে শত্রু ব'লেই ধ'রে নিয়েছেন।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে আর একটা কথাও ব'লে নি। 'বোবার শত্রু

নেই'—এ উক্তি মিথ্যা। আমার এক বিখ্যাত ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমার সঙ্গে পত্রালাপ ও বাক্যালাপ দুইই বন্ধ ক'রে দিয়েছেন, কারণ তাঁর রচনা সম্বন্ধে আমি ভালোমন্দ কিছুই বলিনি।

অতঃপর যা বলছিলুম। আমার তো মনে হয়, ব্যক্তিগত আমি এবং সাহিত্যগত আমি—এই দুই আমিকে এক ব'লে স্বীকার না করলে যথেষ্ট ঝঞ্ঝাট ও হৃদয়দাহ থেকে অব্যাহতি লাভ করা যায়। সাহিত্য-ক্ষেত্রে ঐকমত্য নেই ব'লে বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর মনের অনৈক্য হবে কেন? আমি বেশ ভালো ক'রেই জানি, আমার কোন কোন বন্ধু লেখক হিসাবে আমাকে পছন্দ করেন না। কিন্তু সেজন্যে আমার মনে কোন গ্লানিই পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠেনি, অম্লানবদনে তাঁদের সঙ্গে মেলামেশা করি, তাঁরা যে আমার লেখা ভালো বলেন না, এটা আমি জানি ব'লেও তাঁদের জানতে দিইনি। তাঁরা যে বন্ধুরূপে আমাকে পছন্দ করেন আমার পক্ষে সেইটুকুই পরম লাভ। সকলের লেখা সকলের ভালো লাগে না। এ সত্য মেনে না নিলে পৃথিবীতে জীবনযাত্রা হয় অসহনীয়।

আগে ছিলেন বন্ধু, পরে প্রতিকূল সমালোচনায় হয়ে দাঁড়ালেন শত্রুর মত,—এও যেমন দেখছি, তেমনি এও দেখেছি যে, আগে বিরুদ্ধ সমালোচনায় আহত হয়ে পরে বন্ধুরূপে কাছে এসে কেউ কেউ আমার সঙ্গে করেছেন সৌহার্দ্যের সম্পর্ক স্থাপন। এও লক্ষ্য করেছি যে, শেষোক্ত শ্রেণীর বন্ধুদের সঙ্গে পরে মতের অমিল হ'লেও আর মনের অমিল হয় না। আমার এই রকম এক বন্ধু হচ্ছেন শ্রীসজনীকান্ত দাস।

সেটা হচ্ছে ১৩৩৪ সাল। তখনও সজনীকান্তের সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় হয়নি, তবে এর-ওর মুখে শুনতুম, তিনি 'প্রবাসী' পত্রিকার কার্যালয়ের কর্মচারী। তিনি এবং উক্ত পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায় 'শনিবারের চিঠি নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং মোহিতলাল মজুমদার ও শ্রীনীরদ চৌধুরী প্রভৃতি তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। আমি তখন 'নাচঘর' পত্রিকার সম্পাদক।

'ভারতী' সবে উঠে গিয়েছে। স্বর্গীয় বন্ধুবর দীনেশরঞ্জন দাশ

সম্পাদকের আসনে আসীন হয়ে শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শ্রীবুদ্ধদেব বসু ও শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ তরুণ লেখকদের নিয়ে খুব ঘটা ক'রে চালাচ্ছেন 'কল্লোল' পত্রিকা। আমিও ছিলুম 'কল্লোলের' লেখক।

'শনিবারের চিঠি'তে কিছু কিছু সুলিখিত ও সুচিন্তিত সন্দর্ভ প্রকাশিত হ'ত, কিন্তু সে বেশী ঝোঁক দিয়েছিল রঙ্গব্যঙ্গ ও সমসাময়িক পত্রিকার দোষকথনের দিকে। কোথায় কে কামজ রচনার বেসাতি করছে, 'চিঠি' হ'ত তারই সন্দেশবহ। কেবল সে খবরদার হয়ে হরেক রকম টীকাটিপ্পনী কেটে কটূক্তি করত না, ঐ সঙ্গে করত সেই সব ধিক্কৃত রচনা থেকে নমুনার পর নমুনা উদ্ধার। সেই সব উদ্ধৃতির মধ্যে থাকত যে অশ্লীলতা, তা উপভোগ করবার জন্যে পাঠকেরও অভাব হ'ত না। এইভাবে 'শনিবারের চিঠি' আসর সরগরম ক'রে দস্তুরমত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

'শনিবারের চিঠি'র বাক্যবাণের প্রধান চাঁদমারি হয়ে ওঠে 'কল্লোল' পত্রিকা। প্রথমে আমি রেহাই পেয়েছিলুম। কিন্তু তারপর আমার উপরেও আক্রমণ শুরু হ'ল। গদ্যে ও পদ্যে—অত্যন্ত ঝাঁঝালো ভাষায়। আদিরস পরিবেশনের জন্যে আমি আক্রান্ত হইনি। তাই মনে হয় আমার একমাত্র অপরাধ ছিল আমি 'কল্লোলের' লেখক। সঙ্গদোষে আমিও হয়েছিলুম 'নষ্ট'।

অবশেষে আমিও মৌনব্রত ভঙ্গ করতে বাধ্য হলুম এবং অন্যপক্ষও একই খেলা খেলতে পারে দেখবার জন্যে 'নাচঘরে' খুললুম 'রংমহলের পঞ্চরং' নামে একটি নূতন বিভাগ। গদ্যে ও পদ্যে দিতে লাগলুম পাল্টা জবাব। অচিন্ত্যকুমার প্রমুখ কয়েকজন কবি ও লেখক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাকে অল্পবিস্তর সাহায্য করেছিলেন বটে, কিন্তু 'নাচঘরে'র অধিকাংশ রচনা ছিল আমারই লেখনীপ্রসূত। 'চিঠি'র ব্যঙ্গকবিতাগুলির রচয়িতা ছিলেন সজনীকান্ত। সেই লেখনীযুদ্ধ জনসাধারণের চিত্তরোচক হয়েছিল।

কোন ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নয়, ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল কৌতুকচ্ছলেই

—যদিও কৌতুকটা গড়িয়েছিল যেন কিছু বেশীদূর পর্যন্ত। এবং আমার পক্ষেই সুবিধা ছিল অধিক। 'শনিবারের চিঠি' মাসিক, 'নাচঘর' সাপ্তাহিক। 'চিঠি' মাসে একবার বচনবাণ ছাড়লে, আমি বাক্যবুলেট ছোঁড়বার সুযোগ পাই মাসে চারবার। এইভাবে চলল কিছুকাল।

প্রথমে আক্রমণ আরম্ভ ক'রে শেষটা 'শনিবারের চিঠি'ই প্রথমে দিলে রণে ক্ষান্ত। তুষ্ণীভাব অবলম্বন করল আমারও লেখনী।

খেলাচ্ছলেই আমরা দাঁড়িয়েছিলুম পরস্পরের বিরুদ্ধে, আমাদের মধ্যে ছিল না কিছুমাত্র রেষারেষি ভাব। তাই কিছুদিন পরে যখন পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হলুম, বেশ সহজ ও স্বাভাবিকভাবে দুজনেই গ্রহণ করলুম দুজনকে। আমাদের বিরোধটা ছিল অভিনয় মাত্র।

আসল কথা বলতে কি, ব্যক্তিগত বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে সজনীকান্ত 'কল্লোলের' দলকেও আক্রমণ করেছিলেন ব'লে মনে হয় না। সেও ছিল ভান। 'শনিবারের চিঠি'র চাহিদা বাড়াবার জন্যেই তিনি তুলেছিলেন অশ্লীলতার অজুহাত। ব্যবসাদারি চাল ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ যে শ্রেণীর রচনার জন্যে তিনি 'কল্লোল'কে আক্রমণ করতেন, ঠিক সেই শ্রেণীর গল্পই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'শনিবারের চিঠি'তে।

'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে অচিন্ত্যকুমার লিখেছেন: 'পুরীতে বেড়াতে গিয়েছি বুদ্ধদেব, আমি আর অজিত। একদিন দেখি সমুদ্র থেকে কে উঠে আসছে। পুরাণে-মহাভারতে দেখেছি কেউ কেউ অমনি উদ্ভূত হয়েছে সমুদ্র থেকে। তাদের কারুর হাতে বিষভাণ্ডও হয়তো ছিল। কিন্তু এমনটি কাউকে দেখব তা কল্পনাও করতে পারি নি। স্বর্গ-নৃত্য সভার কেউ নয়, স্বয়ং সজনীকান্ত।

একই হোটেলে আছি। প্রায় একই ভোজনভ্রমণের গণ্ডীর মধ্যে একই হাস্য-পরিহাসের পরিমণ্ডলে।

সজনীকান্ত বললে, 'কেবল বিষভাণ্ড নয়, সুধাপাত্রও আছে। অর্থাৎ বন্ধু হবারও গুণ আছে আমার মধ্যে।'

সজনীকান্ত অত্যুক্তি করেননি। তাঁর মধ্যে বন্ধু হবার গুণ আছে

এবং অপরকেও তিনি খুব সহজেই বন্ধুরূপে আকৃষ্ট করতে পারেন। এই গুণের জন্যেই তিনি কয়েকজন প্রখ্যাত রচনাকুশল সাহিত্যিককে নিয়ে একটি শক্তিশালী নিজস্ব গোষ্ঠী গঠন ক'রে 'শনিবারের চিঠি'র মত নতুন ধরনের পত্রিকাকে সার্থক, লোকপ্রিয় ও দীর্ঘজীবী ক'রে তুলতে পেরেছেন। 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ' ও 'বসুমতীর' মত সুবৃহৎ সুচিত্রিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত পত্রিকার কথা ছেড়ে দি, 'চিঠি' যে সময়ে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, তখনকার আর কোন মাসিক পত্রিকা আজ পর্যন্ত এমনভাবে সজীব হয়ে বাজার দখল ক'রে রাখতে পারেনি। বরাবর দেখে আসছি, এদেশের ছোট ছোট ও মাঝারি মাসিক কাগজগুলি ভেকচ্ছত্রের মত দলে দলে জন্মগ্রহণ করে, যেন অনতিবিলম্বে মৃত্যুমুখে পড়বার জন্যে প্রস্তুত হয়েই। অকালমৃত্যুই যেখানে প্রায়নিশ্চিত, ক্ষুদ্র 'শনিবারের চিঠি' সেখানে অভাবিতরূপে কেবল সুদীর্ঘ পরমায়ুরই অধিকারী হয়নি, উপরন্তু ক্রমে ক্রমে অধিকতর পরিপুষ্টি লাভ ক'রে রীতিমত গরিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তার সমসাময়িক ও প্রধান প্রতিযোগী 'কল্লোল' আসর জমাবার জন্যে রীতিমত হুল্লোড় তুলেছিল এবং সেও লাভ করেছিল এক বিশেষ শক্তিশালী লেখকগোষ্ঠীর কাছ থেকে অকৃপণ রচনাদাক্ষিণ্য। কিন্তু জীবনযুদ্ধে হার মেনে তাকেও বরণ করতে হয়েছে অকালমৃত্যু।

চাহিদা বাড়াবার জন্যে 'শনিবারের চিঠি'কে যে প্রথম প্রথম কিছু কিছু উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করতে হয়েছিল, এ সত্য স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। কিন্তু স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হবার শক্তি অর্জন করবার সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে সে সংস্কৃত ও যথার্থরূপে গুণসুন্দর ক'রে তুলতে পেরেছে। 'শনিবারের চিঠি' হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলা ভাষার একখানি শ্রেষ্ঠ পত্রিকা। সমাজপতির 'সাহিত্য', দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর 'নব্যভারত' এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রবাসী'র মত 'শনিবারের চিঠি'ও সজনীকান্তের নিজস্ব অবদানরূপে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

কিন্তু 'চিঠি', তাঁর একমাত্র কীর্তি নয়। তিনি হচ্ছেন কবি।

মরণ খেলার খেলোয়াড়

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্মশানবাসী হত্যাকারী

ইটের কোটরের বাসিন্দা। গঙ্গানদীর তরঙ্গতানে শুনত কল্পনদীর গীতিময়ী আলপনা!

রোজ সেখানে যায় সন্ধ্যাবেলায়। সেদিনও মাণিকের সঙ্গে গঙ্গার ধারে বেড়াতে বেড়াতে জয়ন্ত বললে, 'দেখ ভাই, সায়েবরা বলে গড়ের মাঠ হচ্ছে কলকাতার হৃদয়। হতে পারে। আমি কিন্তু এই গঙ্গাকে বলি কলকাতার প্রাণ।'

—'কারণ?'

—'জল না থাকলে প্রকৃতির রূপ পূরন্ত হয় না। এই জন্যেই কৃত্রিম বাগান গড়েও তার মধ্যে আমরা জলে-টলোমল সরোবর রাখতে চাই। কিন্তু সরোবরের জল হচ্ছে বদ্ধ। আর গঙ্গাজলে আছে গতিশীল জীবনের চঞ্চল উচ্ছ্বাস। দিনে সূর্যকরে হাজার হীরার মালা পরে গান গেয়ে নাচে। রাত্রে নীলাকাশের চাঁদতারাকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেখায় স্বপ্ন-লোকের সঙ্গীতময় পরীপুরী, অন্ধকারেও তার গভীর কল-কোলাহলে পাওয়া যায় কোন অজানা রহস্যলোকের বাণী! এই ইট-কাঠ-পাথরের শুকনো শহরে কর্কশ চিৎকার আর শব্দের মধ্যে গঙ্গা করে চলেছে দিন-রাত নব-নব গীতিকাব্যের সৃষ্টি! এটা কি কম কথা? বাগান বা মাঠ নিত্যই এক দৃশ্য দেখায়, কিন্তু গঙ্গা দেখায়, নিত্য-নূতন সৌন্দর্য। এর এই জলকণা মাখা স্নিগ্ধ হাওয়ায় এসে দাঁড়ালে শহুরে কর্মক্লান্ত জীবন দু-দণ্ডে জুড়িয়ে যায়।'

মাণিক বললে, 'কিন্তু গঙ্গাতীরকে করে রাখা হয়েছে কত কুৎসিত, তাও দেখছ তো? কিছু কিছু সবুজ ঘাস আর গাছ-পালা থাকলে যে

জায়গা হয়ে উঠত দুর্লভ স্বর্গের মত, সেখানে বিশ্রী লোহার লাইনের উপর দিয়ে হর্দম ছুটছে কান-ফাটানো চিৎকার করে কুৎসিত রেলের গাড়ীর পর রেলের গাড়ী!'

—'কলকাতা যদি ফ্রান্সের কোন শহর হত, তা হলে গঙ্গাতীরের রূপ বদলে যেত একেবারে। অন্তত আমার বিশ্বাস তাই।'

গঙ্গাতীরের রাজপথে তখন গ্যাসের আলো জ্বলে উঠেছে বটে, কিন্তু আজকের বাদল-সন্ধ্যায় পশ্চিমের মেঘ-মহলে এখনো সূর্যের বিদায় সভার রাঙা প্রভাটুকু মিলিয়ে যায় নি নিঃশেষে। সেই দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত ও মাণিক খানিকক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

পশ্চিমে রঙের রঙ্গমঞ্চ অন্ধকার-যবনিকায় অদৃশ্য হয়ে গেল, দুই বন্ধু বাড়ির পথ ধরলে।

যখন তারা প্রায় বাড়ির কাছে এসে পড়েছে তখন দেখলে, ইনস্পেক্টার সুন্দরবাবু আর একটি লোকের সঙ্গে এগিয়ে আসছেন হন্তদন্তের মত!

মাণিক বললে, 'আমাদের সুন্দরবাবু যে! বোঁ-বোঁ করে কোথায় ছুটে চলেছেন?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম, কোথায় আবার? মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত! যাচ্ছি জয়ন্তেরই বাড়িতে।'

জয়ন্ত বললে, 'তা এত তাড়াতাড়ি কেন?'

—'তাড়াতাড়ির কারণ আছে হে! বিষম কারণ। ভয়ানক কারণ।'

—'একটু আভাস দেবেন কি?'

—'একটু আভাস কেন, সমস্ত প্রকাশ করব। তোমার বাড়িতে চল!'

সকলে একসঙ্গে অগ্রসর হল। জয়ন্তের বাড়িতে ঢুকে বৈঠকখানায় একখানা কৌচের উপর বসে সুন্দরবাবু বললেন, 'জয়ন্ত, ইনি হচ্ছেন আমার বন্ধু শশাঙ্ক। বিশেষ প্রয়োজনে এঁকে তোমার কাছে নিয়ে এসেছি।'

জয়ন্ত ও শশাঙ্ক পরস্পরকে অভিবাদন করলে।

সুন্দরবাবু বললেন, 'ওরা দুই ভাই। শশাঙ্ক আর মৃগাঙ্ক। সহোদর নয়, খুড়্তুতো-জ্যাঠ্তুতো ভাই। ওরা নতুনপুরের জমিদার।

জয়ন্ত এইবারে একটু মনোযোগ দিয়ে শশাঙ্ককে দেখতে লাগল। মাথায় ছয় ফুট লম্বা, মস্ত চ্যাটালো বুক, দেখলেই বোঝা যায় লোকটি

খুব বলবান এবং বড়-ঘরের ছেলে। কিন্তু তার মাথার চুলগুলো উশ্‌কোখুশ্‌কো, চোখে-মুখে ভয়-দুর্ভাবনার ভার এবং বেশ-ভূষা ছন্ন-ছাড়ার মত।

জয়ন্ত বেশ বুঝলে, সুন্দরবাবু স্বয়ং যখন এই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত লোকটিকে নিয়ে বিশেষ প্রয়োজনে তার কাছে এসে হাজির হয়েছেন, মামলাটি তখন সামান্য নয়।

সে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে বললে, 'নতুনপুর আমি চিনি। সে তো কলকাতার খুব কাছেই।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হ্যাঁ। কলকাতা থেকে বিশ-বাইশ মাইল হবে।'

—'এখন প্রয়োজনটা কি শুনি?'

—'কাল শেষ-রাতে শশাঙ্কের ছোট ভাই মৃগাঙ্ককে কে খুন করে গেছে।'

জয়ন্ত খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে, 'খুনী তা হলে ধরা পড়ে নি?'

—'না। খুনী ধরা পড়লে শশাঙ্ক নিশ্চয়ই তোমার কাছে আসত না।'

—'কিন্তু নতুনপুরে পুলিশ থাকতে উনি আমার কাছে এলেনই বা কেন? সাধারণ খুনের পক্ষে সাধারণ পুলিশই যথেষ্ট।'

শশাঙ্ক ভাঙ্গা-ভাঙ্গা গলায় বললে, 'না জয়ন্তবাবু, পুলিশই যথেষ্ট নয়। মৃগাঙ্কের এই অপঘাত-মৃত্যুতে আমার বুক ভেঙে গেছে! যত শীঘ্র সম্ভব, এই দুরাত্মা হত্যাকারীকে উচিত শাস্তি দিতে না পারলে প্রাণ আমার শান্ত হবে না। শুনেছি, অপরাধী আবিষ্কার করবার শক্তি আপনার অসীম। আমার বিশ্বাস, আপনার সাহায্য পেলে পুলিশ খুব তাড়াতাড়ি এ মামলার কিনারা করতে পারবে।'

—'আমার সম্বন্ধে মহাশয়ের উচ্চ ধারণা দেখে গর্ব অনুভব করছি। বেশ, তা হলে সমস্ত ঘটনা আমার কাছে খুলে বলুন।'

শশাঙ্ক বললে, 'আপাতত আমার মুখ থেকে আপনি বেশি কিছু জানতে পারবেন না। কারণ আমি নিজেই অন্ধকারে পড়ে আছি। ....আমাদের বাড়ির পিছনে একটা বড় বাগান আছে। সেই বাগানের ধারেই দোতলায় আমার আর মৃগাঙ্কের ঘর। পাশাপাশি নয়, মাঝে আরো চারখানা ঘর আছে। কাল রাত বারোটা পর্যন্ত জমিদারী কাগজপত্র নিয়ে আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। তারপর ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি এল, আমিও শুতে গেলুম। ভোর বেলায় জেগেই শুনি বাড়ির ভিতরে মহা গোলমাল কান্নাকাটি উঠেছে। ঘর থেকে বেরুতেই দাসী ছুটে এসে বললে, ছোটবাবুকে কে খুন করে গেছে! আমি তো হতভম্ব, বিশ্বাসই হল না। কিন্তু তাড়াতাড়ি মৃগাঙ্কের ঘরে গিয়ে স্বচক্ষে যে শোচনীয় দৃশ্য দেখলুম তা মনে করে এখনো আমার বুক শিউরে উঠছে। ঘরের মেঝেতে মৃগাঙ্কের দেহ হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে, তার গলায় কতকগুলো আঙুলের দাগ। দেখলেই বোঝা যায়, কেউ তাকে নিষ্ঠুরভাবে গলা টিপে হত্যা করেছে।

জয়ন্ত বললে, 'মৃগাঙ্কবাবু কি বিবাহ করেন নি? তাঁর ঘরে কি আর কেউ ছিল না?'

—আমি বিপত্নীক আর মৃগাঙ্ক বিবাহ করে নি।'

—'খুনী কি করে বাড়ির ভিতর এল?'

—'পুলিশের মত হচ্ছে, খুনী খিড়কির দরজা দিয়ে বাগানের ভিতরে ঢুকেছিল।'

—'আপনাদের খিড়কির দরজা কি বন্ধ থাকে না?'

—'থাকে। তবে ঘটনার পরদিন—অর্থাৎ আজকে সকালে দরজা খোলা অবস্থাতেই পাওয়া যায়। আমার বিশ্বাস, খুনী পাঁচিল টপকে বাগানে ঢুকে পালাবার সময়ে খিড়কির দরজা খুলে বেরিয়ে গিয়েছিল।'
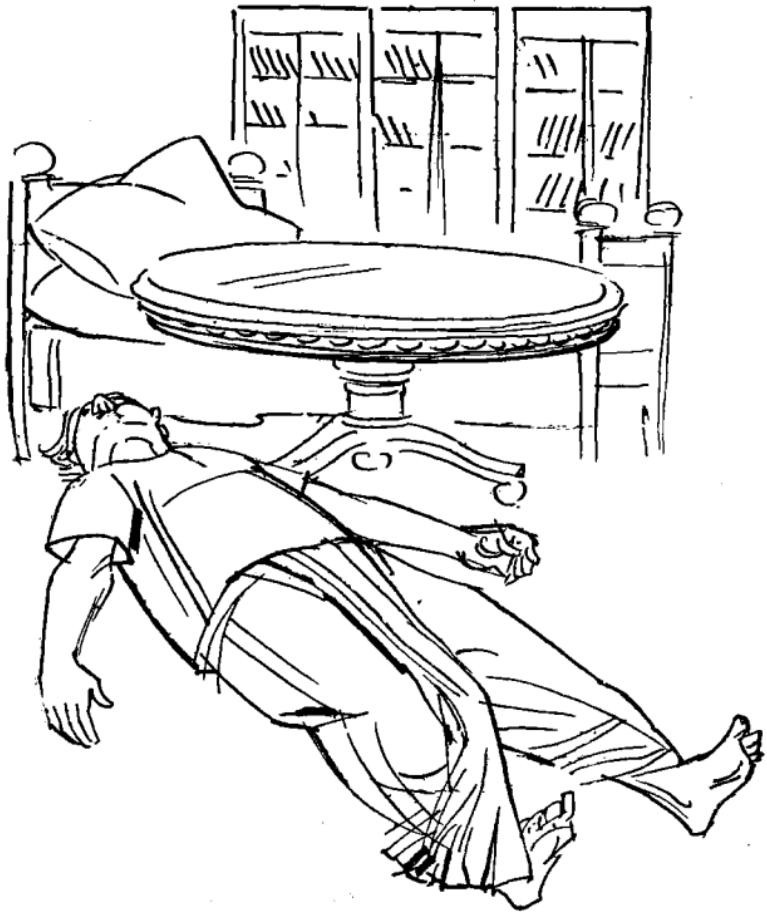
—'সম্ভব।'

—'কিন্তু পুলিশের মত হচ্ছে অন্যরকম। পুলিশ বলে, খুনী খোলা খিড়কির দরজা দিয়েই বাগানে ঢুকেছিল।'

—'পুলিশের এমন মতের কারণ কি?'

—'খিড়কির দরজার ওপরে অনেকগুলো পায়ের দাগ পাওয়া গিয়েছে।'

জয়ন্ত উৎসাহিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'পায়ের দাগ?'

—'আজ্ঞে হাঁ। বলেছি তো, কাল রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। পথের পুরু কাদায় অনেক পায়ের দাগ পাওয়া গিয়েছে। পুলিশ সেই পদচিহ্ন পরীক্ষা করে বলেছে, খুনী সিধে এসে খোলা খিড়কির দরজা দিয়ে

বাগানের ভিতর ঢুকেছে। পুলিশ আরো অনেক আশ্চর্য কথা বলছে।'

—'কি রকম ?'

—'আমাদের বাড়ির খিড়কি থেকে নতুনপুরের শ্মশান পর্যন্ত একটা সরু কাঁচা পথ আছে। পথটা আমাদের জমির উপর দিয়ে গিয়েছে। এ-পথ দিয়ে বড়-একটা লোক-চলাচল নেই। পুলিশের মতে খুনী শ্মশান থেকে ঐ পথ দিয়ে ঘটনাস্থলে এসেছে এবং খুন করে ঐ পথ দিয়েই আবার শ্মশানে ফিরে গেছে।'

দুই চোখ পাকিয়ে সুন্দরবাবু বলে উঠলেন, 'বাপরে, হুম্! শ্মশান থেকে আগমন, শ্মশানেই প্রস্থান ? খুনী কি তবে মানুষ নয় ?'

শশাঙ্ক বললে, 'পুলিশের মতে, খুনীর দলে আরো একজন লোক ছিল।'

জয়ন্ত বললে, 'তা হলে তো অনেক কথাই জানা গিয়েছে দেখছি। আচ্ছা, আপাতত আবার ঘটনাস্থলে ফিরে আসা যাক। খিড়কি দরজা দিয়ে খুনীরা বাগানে ঢুকেছে। বাগানে তাদের পায়ের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে ?'

—'না। বাগানের পথে লাল কাঁকর ঢালা। সেখানে পায়ের ছাপ পড়ে না।'

—'বাগান থেকে বাড়িতে ঢোকবার জন্যে নিশ্চয়ই কোন দরজা আছে ?'

—'আছে। কিন্তু সে দরজা ঘটনার পরেও বন্ধ ছিল। খুনীরা নিশ্চয়ই অন্য কোন উপায়ে বাড়ির ভিতর ঢুকে আবার বেরিয়ে গিয়েছে।'

—'তারা মৃগাঙ্কবাবুর ঘরে ঢুকল কেমন করে ?'

—'মৃগাঙ্কের একটা বদ্-অভ্যাস ছিল। গ্রীষ্ম আর বর্ষাকালের গুমোটের সময়ে সে ঘরের জানলা-দরজা বন্ধ করত না।'

—'জমিদার-বাড়িতে অনেক লোকজন থাকাই স্বাভাবিক। কেউ খুনীদের সাড়া পেয়েছে ?'

—'কেউ না। তারা এসেছে-গিয়েছে যেন ছায়ার মত নীরবে।'

—'মৃগাঙ্কবাবুর ঘর থেকে কিছু চুরি গিয়েছে?'

—'একটা কুটোও না।'

—'তবে তাঁকে খুন করার উদ্দেশ্য কি? কারুর সঙ্গে তার শত্রুতা ছিল?'

শশাঙ্ক অল্পক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'আমার মনে যে সন্দেহ হচ্ছে, শুনুন। নতুনপুরের শ্মশানে কাল-ভৈরবের একটি পুরানো মন্দির আছে। আমাদেরই মাহিনা-করা এক পূজারী রোজ সেখানে পূজা ক'রে আসে। দিন-তিনেক আগে পূজারী সেখানে গিয়ে দেখে, কোথা থেকে এক সন্ন্যাসী এসে সেই মন্দির দখল করে বসেছে। বলে, এবার থেকে সেই-ই হবে সেখানকার সেবাইত, আর কারুকে মন্দিরে ঢুকতে দেবে না। পূজারী এসে আমাদের কাছে নালিশ জানায়। এ হচ্ছে পরশু সকালের কথা। মৃগাঙ্ক ভারি রাগী মেজাজের লোক ছিল। সে তো তখনি ক্ষেপে উঠে শ্মশানে গিয়ে সন্ন্যাসীকে ধরে খুব মারপিঠ করে বলে, 'কাল থেকে তোকে যদি এখানে দেখতে পাই, তা হলে একেবারে খুন করে ফেলব।' সন্ন্যাসী পরশু রাত্রেই অদৃশ্য হয়, কিন্তু যাবার সময়ে নাকি অভিশাপ দিয়ে যায়, তেরাত্রি পোয়াবার আগে সে অপরাধের প্রতিশোধ নেবে।'

—'তা হলে আপনার বিশ্বাস, এই খুনের মূলে আছে সেই সন্ন্যাসীই?'

—'বিশ্বাস নয়, সন্দেহ।'

—'সন্ন্যাসীকে নতুনপুরের কেউ চেনে না?'

—'না, লোকে তাকে সেই প্রথম দেখলে।'

—'তা হলে সে কেমন করে আপনাদের বাড়ির পথ-ঘাট চিনলে? কেমন করে জানলে, মৃগাঙ্কবাবু কোন্ ঘরে শয়ন করতেন?'

—'এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন।'

—'আপনি যা বললেন, তাতে মনে হচ্ছে, এখন আগে আমাদের

দরকার, আপনাদের বাড়িটা দেখা। মোটরে নতুনপুর যেতে বেশিক্ষণ লাগবে না। সুন্দরবাবুও কি আমাদের সঙ্গের সাথী হবেন?'

—'হুম না! ছুটি নেই। পারি তো পরে যাব!......আর সত্যি কথা বলতে কি, খুনী যেখানে শ্মশান থেকে আসে আর শ্মশানে ফিরে যায়, সেখানে তোমরা কেউ আমাকে পাবার আশা করো না!'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শব-সাধনায় বিশ্বাসী শশাঙ্ক

বড় বড় চারিটি মহল ও মস্ত বাগান নিয়ে নতুনপুরের জমিদার-বাড়ি প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বিঘে জমি দখল করে দাঁড়িয়ে আছে। বহুকালের পুরাতন অট্টালিকা, নিয়মিত সংস্কার-অভাবে মলিন ও জীর্ণ। অধিকাংশ ঘরই অন্ধকার, মাঝে-মাঝে দূরে দূরে মিট্‌মিট্ করে কেরোসিনের আলো জ্বলছে, অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এই সব লক্ষ্য করে জয়ন্ত ও মাণিক মনে মনে বুঝলে, শশাঙ্কবাবু জমিদার হতে পারেন, কিন্তু তাঁর আর্থিক অবস্থা আশাপ্রদ নয়।

শশাঙ্ক তাদের নিয়ে আগে গেল বাগানের ভিতরে। বাগান বলতে আমরা যা বুঝি, একে তা বলা যায় না। ছোট-ছোট ফুলগাছের চারা সেখানে নেই বললেই হয়, মান্ধাতার আমলের বুড়ো-বুড়ো অশ্বত্থ-বট-আম-জাম-কাঁঠাল-তাল-নারিকেল গাছ যেখানে-সেখানে ভিড় করে দাঁড়িয়ে রীতিমত অরণ্যের সৃষ্টি করেছে। 'ইলেকট্রিক টর্চের' আলো ইতস্তত চালনা করে জয়ন্ত ও মাণিক দেখলে প্রকাণ্ড একটা পুকুরে সবুজ পানার চাদর ছিঁড়ে মাঝে-মাঝে চক্-চক্ করছে কালো জল।

মাণিক বললে, 'শশাঙ্কবাবু, আমি তো দেখছি আপনারা দস্তুরমত

ম্যালেরিয়ার চাষ করেন। ঐ পুকুরে রোজ কত লক্ষ মশার জন্ম হয়, তার হিসাব রেখেছেন ?'

শশাঙ্ক ম্লান হেসে বললে, 'আজ আমাদের ভগ্নদশা। শুনেছি আগে আমাদের বাৎসরিক আয় ছিল পাঁচ লক্ষ টাকা। কিন্তু সেই আয় এখন দাঁড়িয়েছে বাৎসরিক বিশ হাজারে।'

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, 'মৃগাঙ্কবাবু যখন বিবাহ করেন নি, তখন তাঁর সম্পত্তি তো আপনিই পাবেন ?'

—'হ্যাঁ। কিন্তু ভাইকে হারিয়ে সম্পত্তি আমার বিষের মতন মনে হচ্ছে। মৃগাঙ্কের বৌ-ছেলে থাকলেই আমি খুশি হতুম।'

পায়ে-পায়ে সকলে খিড়কির দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

শশাঙ্ক দরজার পাল্লা খুলে বললে, 'এইখানে পদচিহ্ন পাওয়া গেছে।'

জয়ন্ত মাটির উপরে আলো ফেলে পরীক্ষা করে বললে, 'আজ দিনের বেলাতেও এখানে বৃষ্টি হয়েছিল ?'

—'হ্যাঁ, খুব জোরে।'

—'দেখতেই পাচ্ছি। সমস্ত চিহ্ন প্রায় ধুয়ে-মুছে গিয়েছে। আমারই দুর্ভাগ্য! ও-গুলো দেখতে পেলে উপকার হত। শশাঙ্কবাবু, আজ হাজার-হাজার বৎসর ধরে ঐ পদচিহ্নই হাজার-হাজার চোর-ডাকাত-খুনীকে ধরিয়ে দিয়ে আসছে। যাঁদের চোখ আর মস্তিষ্ক শিক্ষিত, পদচিহ্নের ভিতর থেকে তাঁরা বহু গুপ্ত ইতিহাস আবিষ্কার করতে পারেন।'

শশাঙ্ক বললে, 'তাই তো শুনেছি। কিন্তু ভাববেন না ; পুলিশের কাছ থেকে আপনি পদচিহ্নের অনেক কথাই জানতে পারবেন।'

—'নিজের চোখে দেখায় আর পরের মুখে শোনায় যথেষ্ট তফাত। তবু এও মন্দের ভালো। এখানে তদারক করতে এসেছিলেন কে ?'

—'থানার এক সাব-ইন্‌স্পেক্টার। নাম কুমুদবাবু। বয়স অল্প, কিন্তু উৎসাহ তাঁর অসীম।

—'কাল সকালেই তাঁর কাছে নিয়ে গেলে খুশি হব। এখন চলুন আপনার বাড়ির দিকে।'

বাড়ির কাছে গিয়ে জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, 'বাগান থেকে বাড়িতে ঢোকবার দরজা কোথায়?'

—'ঐখানে। কিন্তু আপনাকে তো বলেছি, খুনী ও-দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকে নি। খুনের পরেও ও-দরজা ভেতর থেকেই বন্ধ ছিল।'

সেইখানে দাঁড়িয়ে জয়ন্ত বাড়িখানাকে বেশ ভালো করে দেখে নিয়ে বললে, 'মাণিক, তুমি শশাঙ্কবাবুর সঙ্গে এইখানে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ কথাবার্তা কও। ততক্ষণ আমি বাড়িখানাকে একবার প্রদক্ষিণ করে আসি।'

জয়ন্ত চলে গেল।

শশাঙ্ক বললে, 'মাণিকবাবু, আপনার বন্ধুর নাম-ডাক তো খুব শুনি। আপনার কি মনে হয়, উনি এ-মামলার কিনারা করতে পারবেন?'

—'জয়ন্ত এর চেয়ে ঢের শক্ত মামলার কিনারা করেছে।'

শশাঙ্ক আর কিছু বললে না।

মিনিট-পনেরো পরে জয়ন্ত বাড়ির অন্য দিক দিয়ে ফিরে এল। তাকে ঘন-ঘন নস্য নিতে দেখে মাণিক আশ্বস্ত হল। কারণ সে জানে, কোন দরকারী সূত্র আবিষ্কার করতে পারলে ঘন-ঘন নস্য নেয় তার বন্ধু।

জয়ন্ত এসে বললে, 'শশাঙ্কবাবু, আপনার যে পূর্বপুরুষ এই বাড়িখানা তৈরি করেছিলেন তি ন খুব হুশিয়ার ব্যক্তি।'

—'এ-কথা কেন বলছেন?'

—'চারিদিকে আমি নিজে বার-বার চেষ্টা করে দেখলুম, কিন্তু বাহির থেকে কোন কৌশলেই উপরে উঠতে পারলুম না।'

—'তা হলে খুনী কেমন করে বাড়ির দোতলায় উঠল?'

জয়ন্ত সহজ স্বরেই বললে, 'বাড়ির ভিতর থেকে খুনের আগে আর

পরে কেউ এই দরজা খুলে আর বন্ধ করে দিয়েছে।'

শশাঙ্ক প্রবল মস্তকান্দোলন করে বললে, 'না, অসম্ভব!'

—'তা হলে বলতে হয়, খুনের আগে আর পরে এ-দরজা খোলা ছিল।'

—'না, তাও অসম্ভব! আমি নিজে দেখেছি দরজা বন্ধ।'

—'তবে বাড়ির কোথাও গুপ্তদ্বার আছে, খুনী সে-খবর জানে।'

ব্যঙ্গপূর্ণ স্বরে শশাঙ্ক বললে, 'আর বাড়ির মালিক আমি, সে-খবর জানি না।'

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, 'বাড়ির মালিককে আমি আর একটা নতুন খবর দিতে পারি। জানেন, আমি যখন চারিদিক পরীক্ষায় ব্যস্ত ছিলুম, তখন অন্ধকারে গাছপালার আড়ালে-আড়ালে গা ঢেকে একজন লোক আমার কার্যকলাপ লক্ষ্য করছিল! বলতে পারেন, কে সে?

শশাঙ্ক প্রথমটা অবাক হয়ে রইল। তারপর ব্যস্ত হয়ে বললে, 'বলেন কি? আচ্ছা, দাঁড়ান একটু, আমি এখনি দরোয়ানদের হুকুম দিচ্ছি, দুরাত্মাকে ধরে আনুক। কি সর্বনাশ, বাড়ির ভেতরে শত্রু! চোবে! পাঁড়ে!'

—'মিছে দরোয়ানদের ডাকবেন না। আমি তাকে ধরবার চেষ্টা করেছিলুম, পারি নি। এতক্ষণে সে নাগালের বাইরে সরে পড়েছে।'

—'কিন্তু আপনার কথা শুনে আমার হৃৎকম্প হচ্ছে! বাড়ির ভেতরে শত্রু! শেষটা আমিও অপঘাতে মরব নাকি?'

—'সাবধানে থাকলে ভয় কি? এখন চলুন, মৃগাঙ্কবাবুর ঘরটা দেখে আসি।'

বাড়ির ভেতর ঢুকে জয়ন্ত টর্চের আলো দেওয়ালের গায়ে বুলোতে বুলোতে এগিয়ে চলল। তারপর সিঁড়ির দ্বিতীয় ধাপেই দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, 'শশাঙ্কবাবু, খুনী গলা টিপে ধরাতে মৃগাঙ্কবাবুর মুখ দিয়ে রক্ত উঠেছিল?'

শশাঙ্ক বিস্মিত স্বরে বললে, 'উঠেছিল। কিন্তু আপনি কি করে জানলেন ?'

—'দেখুন, বলেই জয়ন্ত সিঁড়ির দেওয়ালের এক জায়গায় 'টর্চে'র আলো স্থির করলে।'

মাণিক ও শশাঙ্ক দুজনেই দেখলে, দেওয়ালের গায়ে খানিকটা লাল দাগ লেগে রয়েছে।

জয়ন্ত বললে, 'খুনীর হাতে রক্ত লেগেছিল। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় সেই রক্তের ছাপ কোন-গতিকে দেওয়ালে লেগে গিয়েছে।'

শশাঙ্ক বিস্ফারিত নেত্রে চুপ করে রইল।

মাণিক বললে, 'এই দাগই প্রমাণিত করছে খুনের পর খুনী সিঁড়ি দিয়ে যখন নীচে নেমেছে, তখন বাগানের দরজা দিয়েই বাইরে বেরিয়ে গেছে।'

জয়ন্ত বললে, 'হুঁ। অথচ শশাঙ্কবাবু দেখেছেন দরজা বন্ধ। সে-দরজা বাড়ির ভেতর থেকে কে বন্ধ করলে ?'

মাণিক বললে, 'সেই-ই কি আজ অন্ধকারে তোমার উপরে পাহারা দিচ্ছিল ?'

—'শশাঙ্কবাবু, আপনার বাড়ির প্রত্যেক লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে হবে।'

শশাঙ্ক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'যে আজ্ঞে।'

—'এখন চলুন মৃগাঙ্কবাবুর ঘরে !'

মৃগাঙ্কের ঘরখানি একেবারে বাগানের উপরে। মৃতদেহ সেখানে আর ছিল না বটে, কিন্তু ঘরে ঢুকে তবু যেন সকলে অনুভব করলে, অদৃশ্য মৃত্যুর কেমন একটা থমথমে ভয়-ভয় ভাব ! অন্ধকার বাগান থেকে বাতাসে সেখানেও ভেসে আসছিল হাস্নুহানা আর চাঁপার মিশ্র গন্ধ। গতকল্য এ-গন্ধ হয়তো হতভাগ্য মৃগাঙ্কও উপভোগ করেছিল, কিন্তু আজ সেই সৌরভকেই মনে হচ্ছে প্রকৃতির নিষ্ঠুর পরিহাসের মত।

ঘরখানি বেশ সাজানো-গুছানো।—

একদিকে খাট, মাঝখানে একটি গোল মার্বেলের টেবিল, খান-কয় গদীমোড়া চেয়ার আর একদিকে তিন আলমারি-ঠাসা বই। এখানে-ওখানে ছোট-ছোট ত্রিপায়ার উপরে মর্মর মূর্তি, দেওয়ালেও ঝুলছে বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা বাছা-বাছা চিত্রাবলী।

জয়ন্ত বললে, 'ঘর দেখলে ঘরের মালিকের স্বভাব বোঝা যায়। মৃগাঙ্কবাবু সৌখিন, রসিক আর পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন।'

শশাঙ্ক বললে, 'ঠিক। কিন্তু সে যে পণ্ডিত ছিল এ-কথা কেমন করে বুঝলেন?'

—'আলমারির বইগুলির নাম পড়ে। সব বই উঁচুদরের।......... আচ্ছা শশাঙ্কবাবু, এ-ঘরে আর বিশেষ দ্রষ্টব্য কিছুই নেই। এইবারে আপনার ঘরখানা একবার দেখাবেন?'

—'কেন দেখাব না? এইদিকে আসুন।'

খান-চারেক ঘর পেরিয়ে এবারে সকলে যে-ঘরে গিয়ে ঢুকল, সেখানে প্রথমেই চোখে পড়ে কালো মার্বেলের একটি জলচৌকির উপর সাজানো পাঁচটি সিন্দুর-লিপ্ত মড়ার মাথা! আর এক পাশে ব্যাঘ্রচর্মের আসনের সামনে জবার মালাপরানো, কষ্টিপাথরে গড়া ছোট্ট একটি কালিকা-মূর্তি। তারই পিছনে দেওয়ালের তাকে-তাকে রয়েছে অনেক-গুলি বাঁধানো বহু-ব্যবহৃত পুস্তক। জয়ন্ত বইগুলোর নামও লক্ষ্য করলে। বৃহৎ তন্ত্রসার, শ্যামা-রহস্য, মহানির্বাণ-তন্ত্র প্রভৃতি।

বললে, 'আপনি তান্ত্রিক?'

শশাঙ্ক বললে, 'স্ত্রীর মৃত্যুর পর আমি পূজা-অর্চনা নিয়েই কাল কাটাই।'

—'ঐ মড়ার মাথাগুলো?'

—'ওগুলো তান্ত্রিক সাধনের উপকরণ। আমার কাছে জপ-তপই জীবন।'

—'হ্যাঁ, অনেকেই যে মড়ার দেহে জীবন খুঁজে নিজেদের সারা জীবন মিছে আশায় কাটিয়ে দেয়, এ-কথা আমি জানি।'

শশাঙ্ক আহত স্বরে বললে, 'মন্ত্রগুণে মড়া যে জ্যান্ত হয়, আপনি কি তা বিশ্বাস করেন না?'

—'না। প্রাকৃতিক বিধানে যে-দেহ থেকে জীবন পালিয়েছে, তান্ত্রিক মন্ত্রের গুণে তা যদি আবার জ্যান্ত হত, লোকে তা হলে তাকে পুড়িয়ে বা পুঁতে ফেলত না। এই বিংশ শতাব্দী জানে,—ম্যাজিকের আসল অর্থ হচ্ছে চোখে ধুলো দেওয়া; তাকে নিয়ে মজা করা চলে, তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করা চলে না।'

—'ভারতবর্ষের লোক হয়ে এমন কথা বললেন জয়ন্তবাবু? জানেন, ক্রীশ্চান-ফিরিঙ্গীর দেশ আমেরিকাও এখন তান্ত্রিক মন্ত্রের গুণে মৃত-দেহে জীবন সঞ্চার করছে?'

—'হ্যাঁ, আমেরিকা থেকে প্রকাশিত 'তন্ত্র' পত্রিকায় ও-রূপ কথা পড়েছি বটে। কিন্তু আমেরিকায় ছাপার হরফে যত আজগুবি কথা প্রকাশিত হয়, পৃথিবীর আর কোথাও তত নয়। তান্ত্রিক তন্ত্রের যদি এত গুণ, তবে মৃগাঙ্কবাবুকে আবার বাঁচাবার চেষ্টা করুন না?'

শশাঙ্ক অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে অভিভূত স্বরে বললে, 'ও-প্রসঙ্গ এখন চাপা থাক।'

—'ঠিক বলেছেন! তার চেয়ে এই জামাটার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক্। এর সবটাই তো দেখছি কাদায় ভর্তি—বিশেষ করে হাতা দুটো। এমন জামা আলনায় টাঙানো কেন?—হুঁ, এর হাতায় গোটাকয় ঘাসের কুচিও লেগে রয়েছে যে?'

শশাঙ্ক হেসে বললে, 'ওটা আমারই জামা। আজ সারাদিন বৃষ্টিতে ভিজে পথে-ঘাটে কত ছুটোছুটি করতে হয়েছে, বুঝেছেন তো? পা হড়কে একবার কাদায় পড়েও গিয়েছিলুম। তারপর জামা-কাপড় বদলে ওটাকে ভুলে আবার আলনাতেই টাঙিয়ে রেখেছি,—আজ কি আর আমার মাথার ঠিক আছে?'

জয়ন্ত সহানুভূতির স্বরে বললে, 'সত্যকথা। আজ আপনার বড়ই দুর্দিন। এখনো ভেঙে পড়েন নি, এইটেই আশ্চর্য।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীমান স্থরেন ও জয়ন্তের আর্শি

পরদিন প্রভাত। জয়ন্ত ও মাণিক বিছানায় বসে চা পান করছে।

জমিদার-বাড়ির সদর মহলের বেশ একখানি বড়-সড় ঘর তাদের জন্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ঘরের সামনেই খানিকটা খোলা জমি, তারপর ফটক, তারপর একটা বড় রাস্তা।

জয়ন্ত বললে, 'ভোরে উঠে আমার নিত্যকর্মের মধ্যে প্রথম হচ্ছে, বাঁশী বাজানো। কিন্তু বাঁশীটি সঙ্গে আনতে ভুলে গিয়েছি।'

মাণিক হেসে বললে, 'তবেই তো মুস্কিল দেখছি। তুমি আবার বল, সকালে বাঁশী না বাজালে তোমার বুদ্ধি নাকি খোলে না!'

—'আমার তো তাই বিশ্বাস। কিন্তু আজ আমার বুদ্ধি খুব বেশি না খুললেও চলবে।'

—'সে কি হে, তোমার হাতে আজ এত বড় একটা মামলা—'

—'না মাণিক, এ-মামলাটাকে আমি বড় মামলা বলি না'—বলেই জয়ন্ত চায়ের পেয়ালা রেখে কামাবার সরঞ্জাম নিয়ে বসল।

মাণিক বললে, 'কারণ?'

—'কারণ, কালকেই আমরা আবিষ্কার করে ফেলেছি,—হয় খুনী নিজে, নয় তার সহকারী এই বাড়ির ভেতরেই আছে। পুকুর যখন পেয়েছি, জাল ফেলে মাছ ধরতে বেশি দেরি লাগবে না।'

—'কিন্তু পুকুরের কোন্ মাছটি হবে তোমার লক্ষ্য, সেটা তুমি জানো না।'

—'শীঘ্রই জানতে পারব। ধরতে গেলে, এখনো আমি কাজ শুরুই করি নি। আগে থানায় গিয়ে সাব-ইন্স্পেক্টার কুমুদবাবুর মতামত

শুনি, এ বাড়ির কে কি এজাহার দিয়েছে দেখি, পায়ের দাগের মাপ নি, তারপর অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা কঠিন হবে না বলেই আমার বিশ্বাস।'

—'না জয়ন্ত, ব্যাপারটা খুব সোজা না হতেও পারে। একটা কথা ভেবে দেখ। ঝড়-জলের ভেতর দিয়ে খুনী এল বাড়ির ভেতরে, তারপর খুন করে সেই দুর্যোগে সে গেল কোথায়? না, শ্মশানে!—এটা কি অস্বাভাবিক নয়? শ্মশানে তার কি কাজ থাকতে পারে? আর শ্মশান থেকেই বা সে কোথায় অদৃশ্য হল?'

—হ্যাঁ মাণিক, ঐখানেই একটা-কোন রহস্য আছে'—বলেই সে মাণিককে ইশারায় কাছে ডাকলে।
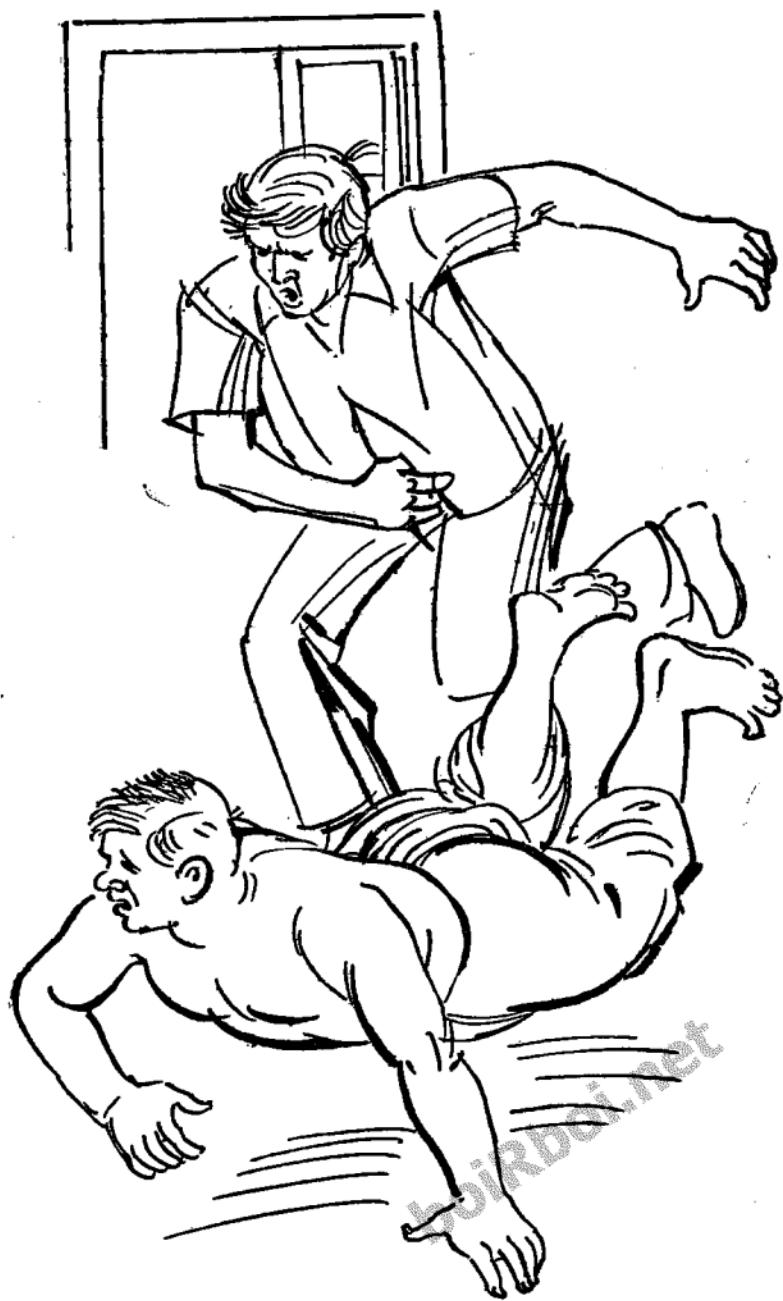
মাণিক তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। জয়ন্ত অতি মৃদুস্বরে বললে, 'শোনো! কামাবার এই আর্শির ভেতর দিয়ে দেখছি, দরজার পাল্লা একটুখানি ফাঁক করে দাঁড়িয়ে কে একজন লোক আমাদের কথা শুনছে। এ-ঘরে আর একটা দরজা আছে। সেই দরজা দিয়ে সহজ-ভাবে বাইরে গিয়ে লোকটাকে তুমি গ্রেপ্তার কর।'

মাণিক অত্যন্ত উদাসীনের মত বাঁ দিকের একটা দরজার কাছে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল, জয়ন্তও নির্বিকারের মত দাড়ির উপরে বুরুশ দিয়ে সাবানের ফেনা লাগাতে লাগল।

আধ মিনিট যেতে না যেতেই ঘরের বাইরে একটা ধস্তাধস্তির আওয়াজ উঠল। তারপর সশব্দে ডান দিকের দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল, মাণিকের হাতে গলাধাক্কা খেয়ে একটা লোক ঘরের ভিতরে এসে পড়ল।

জয়ন্ত যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাবে গালের উপরে ক্ষুর চালাতে চালাতে বললে, 'এস বন্ধু, বোসো। ওহে মাণিক, বন্ধুর জন্যে একখানা চেয়ার এগিয়ে দাও। ততক্ষণে আমি কামিয়ে নি।'

মাণিক হাসতে হাসতে একখানা চেয়ার টেনে আনলে। কিন্তু লোকটা বসল না, দাঁড়িয়ে রইল বেজায় হতভম্বের মত। তাকে দেখতে

হৃষ্টপুষ্ট, তার রং কালো, দেহের তুলনায় মাথাটা বড় এবং মুখের তুলনায় চোখ দুটো ছোট।

জয়ন্ত বললে, 'বসবে না বন্ধু? গলাধাক্কা ভক্ষণ করে অভিমান হয়েছে? কিন্তু আমাদের এ-সব তো বাসর-ঘর নয়, বোকার মতন আড়ি পাততে এসেছিলে কেন?'

লোকটা বললে, 'না মশাই, আমি আড়ি পাততে আসি নি, আমি আপনাকে ডাকতে এসেছিলুম।'

—'এতটা অনুগ্রহ কেন?'

—'শশাঙ্কবাবু আপনাকে ডাকতে বললেন।'

—'তুমি কে?'

—'এ বাড়ির সরকার।'

—'নাম?'

—'সুরেন্দ্রমোহন দে।'

জয়ন্ত কামাতে কামাতেই কথা কইছিল। একটু নীরব থেকে ঠোঁটের উপরটা সাফ করে বললে, 'ওহে মাণিক, তুমি একবার শশাঙ্ক-বাবুর কাছে যাও। জেনে এস, তিনি আমাকে কেন ডেকেছেন?'

মাণিক চলে গেল।

কামাতে কামাতেই জয়ন্ত বললে, 'আরে আরে সুরেন, কোথা যাও? আর্শির ভেতর দিয়ে তোমার চলন্ত ছবি যে আমি জ্বলন্ত দেখতে পাচ্ছি।...দাঁড়াও সুরেন, যেও না!'

কিন্তু সুরেন থামল না, বরং গতি বাড়িয়ে দিলে—পালায় আর কি।

জয়ন্ত চোখের নিমেষে উঠে দাঁড়িয়ে দুই লাফে বাঘের মত সুরেনের কাছে গিয়ে পড়ল এবং তারপর এক হাতে তার গলা চেপে ধরে তাকে বিড়াল-ছানার মতই মাটি থেকে টেনে শূন্যে তুলে আবার ঘরের ভিতরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

ধপাস্ করে মাটিতে আছড়ে পড়ে সুরেন আর্তনাদ করে উঠল।

আবার আর্শির সুমুখে গিয়ে বসে ক্ষুর তুলে নিয়ে জয়ন্ত শান্ত স্বরেই বললে, 'চুপ করে ঐখানে বসে থাকো। এবারে নড়লে বাঁচবে না।'

সুরেন বুঝলে, সে আজ কোন মিষ্টভাষী যমের খপ্পরে পড়েছে; সে আর পালাবার চেষ্টা করলে না।

মাণিক ফিরে এসে বললে, 'শশাঙ্কবাবু বললেন, তিনি তোমাকে ডাকেন নি।'

জয়ন্তের কামানো শেষ হল। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে সে বললে, 'সুরেন, এখন তোমার বক্তব্য কি?'

সুরেন মাথা হেঁট করে বসে রইল, জবাব দিলে না।

—'তা হলে কাল রাতে বাগানে আমার পিছু নিয়েছিলে তুমিই?'

সুরেন তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না, না, আমি নই।'

—'হুঁ, এ-কথা সত্যি হলে বলতে হবে শশাঙ্কবাবুর বাড়িতে তোমার মতন জীব আরো আছে? খুনীকে দরজা খুলে দিয়েছিল কে? তুমি?'

সুরেন কাঁদো-কাঁদো গলায় বলে উঠল, 'দোহাই মশাই, এ খুনোখুনির ভেতরে আমাকে আর জড়াবেন না! আমি দীন-দুঃখী, সামান্য মাইনের চাকরি করি, খুন-ডাকাতির ধার ধারি না—দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন।'

তীব্র ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জয়ন্ত খানিকক্ষণ মৌনমুখে লোকটির দিকে তাকিয়ে রইল। সুরেনের মনে হল দু-দুটো প্রচণ্ড চক্ষু যেন দস্যুর মতন তার মনের ভেতরে ঢুকে সমস্ত গুপ্তকথা লুণ্ঠন করছে!

হঠাৎ জয়ন্ত হো হো করে হেসে উঠে বললে, 'সুরেন, আমি বুঝেছি তুমি মস্ত এক কাপুরুষ! যাও, বিদায় হও! কিন্তু সাবধান, এ-বাড়ি ছেড়ে পালিও না, পালালেই মরবে! কাল কি পরশু তোমাকে আমি দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করব। ঠিক জবাব দিলে তোমার ভয় নেই।'

সুরেন দ্রুতপদে প্রস্থান করলে।

মাণিক বললে, 'ওকে ছেড়ে দিলে কেন? ও হয়তো অনেক কথাই

বলতে পারত।'

—'তা পারত। পরে আমাকে বলবেও। আপাতত ওকে আমি হাতে রাখতে চাই।'

এমন সময়ে শশাঙ্কের প্রবেশ। এসেই প্রশ্ন—'আমি যে আপনাকে ডেকেছি, এ-কথা আপনার কাছে কে বললে?'

—'আপনাদের সরকার।'

—'সুরেন? ভুল বলেছে। এজন্যে তাকে আমি শাস্তি দেব।'

—'দরকার নেই।...চলুন শশাঙ্কবাবু, এইবারে আমরা থানার সাব-ইন্‌স্পেক্টার কুমুদবাবুর সঙ্গে আলাপ করতে যাই। পদচিহ্নের ইতিহাস শুনতে হবে। আপনি প্রস্তুত তো?'

'হ্যাঁ।'

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পদ-চিহ্ন কাহিনী

সাব-ইন্‌স্পেক্টার কুমুদচন্দ্র সেনের বয়স ত্রিশের ভেতরে। থানার প্রধান কর্মচারী অসুস্থ বলে এই খুনের মামলার ভার পড়েছে তারই উপরে।

কুমুদ খুব উৎসাহী পুলিশ-কর্মচারী, এদেশের সাধারণ পুলিশের লোকের মত নয়। সে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য অপরাধ-তত্ত্ব সম্বন্ধে নানা পুস্তক নিয়মিতরূপে পাঠ করে এবং যা পড়ে, তা নিয়ে স্বাধীন চিন্তা করতেও ভোলে না। উল্লেখযোগ্য মামলা হাতে পেলে, সে কাজও করে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথা অনুসারে।

শশাঙ্কের মুখে জয়ন্তের পরিচয় পেয়েই কুমুদ বিপুল পুলকে বলে উঠল, 'সুপ্রভাত জয়ন্তবাবু, সুপ্রভাত। আপনার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়ই

ছিল না, কিন্তু আপনার সমস্ত কীর্তিকলাপই আমি জানি। আপনার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পাওয়াও সৌভাগ্য। শশাঙ্কবাবুর সুবুদ্ধিকে ধন্যবাদ দি', তিনি ঠিক সময়ে ঠিক লোককেই স্মরণ করেছেন।'

শশাঙ্ক বললে, 'আমার ভাইয়ের হত্যাকারীকে ধরবার জন্যে আমি অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছি।

জয়ন্ত সবিনয়ে বললে, 'কুমুদবাবু, আপনার কাছে আমার এক আবেদন আছে।'

বিনয়ে কুমুদও কম নয়, বললে, 'আবেদন নয় জয়ন্তবাবু, আদেশ!

জয়ন্ত বললে, 'বাপ্ রে, বলেন কি! অনেক পুলিশের লোকই তো দেখলুম, মেজাজ তাঁদের লাট-বেলাটের মত। বাইরের লোক আদেশ দিলে, তাঁরা কি আর রক্ষা রাখবেন?'

মুখ টিপে হেসে কুমুদ বললে, 'আমি শিক্ষার্থী মাত্র, বিশেষজ্ঞের সম্মান রাখতে জানি। এখন কি আদেশ বলুন!'

জয়ন্ত বললে, শশাঙ্কবাবুদের বাগানের খিড়কি-দরজার সামনে আপনি যে পদচিহ্নগুলো দেখেছিলেন, দয়া করে তাদের কথা কিছু বলুন।'

—'খালি শুনবেন? চোখে কিছু দেখবেন না?'

—'কালকের বৃষ্টি চোখে দেখবার আর কোন উপায়ই রাখে নি কুমুদবাবু। সব পদচিহ্ন ধুয়ে-মুছে গেছে।'

কুমুদ হাসি-ভরা মুখে উঠে দাঁড়াল, তারপর একটি আলমারি থেকে কাগজে-মোড়া চারটে জিনিস বের করে সন্তর্পণে টেবিলের উপরে স্থাপন করলে।

—'এগুলো কি?'

—'মোড়ক খুলেই দেখুন না। কিন্তু খুব সাবধানে খুলবেন।'

জয়ন্ত মোড়ক খুলেই বলে উঠল, 'এ যে দেখছি 'প্লাষ্টার অফ প্যারিস' দিয়ে তৈরি পায়ের ছাপের ছাঁচ। দু-জোড়া পায়ের দু-জোড়া ছাঁচ!'

—'জানেন তো, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাজ করলে ধুলো, কাদা, বালি আর বরফের উপর থেকে সমস্ত পদচিহ্নের নিখুঁত ছাঁচ তুলে নেওয়া যায় ?'

—'জানি, কারণ আমি নিজেও ঐ পদ্ধতিতে কাজ করি। কিন্তু বাঙলা দেশের পুলিশও যে এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, তা আমি জানতুম না। এইবারেই আমার অন্ন মারা গেল দেখছি!'

—'নির্ভয় হোন জয়ন্তবাবু, আপনার দিন এখনো ফুরোয় নি। বাঙলা পুলিশ এখনো এ-সব নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি নয়। আমার সহকর্মীরা বলেন, এ-সব হচ্ছে অনাবশ্যক তুচ্ছ ছেলেখেলা, বাজে সময় নষ্ট করা মাত্র!'

—'পুলিশ-লাইনে আপনি দেখছি অতুলনীয় বাঙালী, আপনার পক্ষে আমার সাহায্য অনাবশ্যক।'

—'না, খুবই আবশ্যক জয়ন্তবাবু, আপনার মস্তিষ্ক নিশ্চয়ই আমার চেয়ে নূতন তথ্য আবিষ্কার করতে পারবে। এখন শুনুন।

এই ছাঁচজোড়া হচ্ছে প্রথম ব্যক্তির—অর্থাৎ যে শ্মশান থেকে আগে এসে আবার শ্মশানে ফিরে গেছে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তির পদচিহ্ন থেকে এই ছাঁচজোড়া তুলেছি, যে খিড়কির দরজা থেকে বেরিয়ে শ্মশানে গেছে, আবার ফিরে এসে শশাঙ্কবাবুদের বাড়ির ভিতরে ঢুকেছে।

—'কি করে এ-সব অনুমান করছেন ?'

—'এ তো খুবই সোজা! ধরুন, আমি শ্মশান থেকে কর্দমাক্ত পথ দিয়ে শশাঙ্কবাবুর বাড়ির খিড়কির দরজায় গিয়ে হাজির হলুম। তারপর ভিতরে ঢুকে কাজ সেরে আবার শ্মশানে ফিরে গেলুম। তারপর আপনি বেরুলেন খিড়কি দিয়ে ঐ এক পথেই। তখন আপনার পায়ের চিহ্ন প্রায়ই পড়বে আমার পায়ের চিহ্নের উপরে। তারপর আপনি যখন শ্মশান থেকে ফিরবেন তখন আপনার পায়ের চিহ্ন মাঝে মাঝে কেবল আমার উপরে নয়, আপনার নিজেরও আগেকার শ্মশানমুখো

পদচিহ্নের উপরে গিয়ে পড়বে। কেমন, তাই নয় কি?

—'আপনার যুক্তি অকাট্য।'

—'মোটকথা, প্রথম ব্যক্তি শ্মশান থেকে এসে আবার সেইখানেই ফিরে গেছে! আশ্চর্যের বিষয় তারপর সে যে কোথায় গেল, পদচিহ্ন দেখে আর তা বোঝবার উপায় নেই। শ্মশানে উপস্থিত হয়েই সে যেন অশরীরী হয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে! সে শ্মশানেও নেই অথচ সে যে শ্মশান থেকেও বেরোয় নি, এ-সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি যে শ্মশানে গিয়ে আবার বাড়িতে ফিরে এসেছে, পদচিহ্ন তার যথেষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে।

প্রশংসাভরা কণ্ঠে জয়ন্ত বললে, 'কুমুদবাবু, আপনার সূক্ষ্ম-দৃষ্টির পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হলুম।'

মাণিক এতক্ষণ পরে বললে, 'কুমুদবাবু, আমার দৃষ্টি আপনার মত সূক্ষ্ম নয় বটে, কিন্তু আপনি যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছেন, তার উপরে কি নির্ভর করা উচিত?'

—'কেন উচিত নয়?'

—'এক নম্বরের প্রশ্ন: খুনী কে? সে যদি সেই সন্ন্যাসী হয়, তা হলে সে তো খুনের আগের রাত্রেই শ্মশান থেকে বিদায় হয়েছিল, আর আপনাদের মতে এ-খুনী এসেছে শ্মশান থেকেই।

দুই নম্বরের প্রশ্ন: খুনী শ্মশান থেকেই বা এল কেন আর খুনের পরে আবার ঐ শ্মশানেই বা ফিরে গেল কেন?

তিন নম্বরের প্রশ্ন: খুনী শ্মশান থেকে কি উপায়ে অদৃশ্য হল? আপনারা বলছেন, খুনী যে শ্মশান থেকে বেরিয়ে অন্য কোথাও গিয়েছে, কাদার উপরে এমন কোন চিহ্ন নেই।

চার নম্বরের প্রশ্ন: খুনীর সহকারী বা শশাঙ্কবাবুর বাড়ির কোন লোক কি উদ্দেশ্যে খুনের পরে আবার শ্মশানে গিয়ে ফিরে এসেছিল? সে কী খুনীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল, না খুনীকে ধরতে গিয়ে দেখা না পেয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিল?

পাঁচ নম্বরের প্রশ্ন ঃ এই দ্বিতীয় ব্যক্তি খুনীর বন্ধু, না শত্রু ?'

কুমুদ বললে, 'নিশ্চয়ই বন্ধু নইলে এতক্ষণে সে আত্মপ্রকাশ করত।'

ইতিমধ্যে শশাঙ্ক প্লাষ্টারের একজোড়া পদচিহ্ন তুলে নিয়ে কৌতূহলী দৃষ্টিতে পরীক্ষা করছিল, আচম্বিতে সে-দুটো তার হাত ফস্কে মাটির

উপরে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল এবং সঙ্গে-সঙ্গেই সে

'ঐ যাঃ!' বলে চিৎকার করে উঠল!

কুমুদ হতাশভাবে ভগ্নাংশগুলোর দিকে তাকিয়ে দুঃখিত স্বরে বললে, 'কি করলেন শশাঙ্কবাবু! এত পরিশ্রম মিথ্যে করে দিলেন!'

শশাঙ্ক কাঁচু-মাচু মুখে বললে, 'আমাকে মাফ করুন কুমুদবাবু! আপনাদের কথা শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলুম, তাই এই বিপত্তি। ছাঁচ কি নতুন করে তোলা যায় না?'

—'অসম্ভব। কাদার উপরে পায়ের ছাপ আর নেই।'

চিন্তিত মুখে শশাঙ্ক বললে, 'তবে কি হবে?'

জয়ন্ত নিশ্চিন্ত স্বরে বললে, 'আপনি বেশি ভাববেন না শশাঙ্কবাবু। কিছু ক্ষতি হল বটে, কিন্তু ও-রকম ছাঁচ তোলবার আগে পায়ের ছাপের 'ফোটো' আর সঠিক মাপ নেওয়া হয়। তাই নয় কি কুমুদবাবু?

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। কাজ চালাবার পক্ষে তাইই যথেষ্ট।'

শশাঙ্ক উৎফুল্ল স্বরে বললে, 'আঃ, শুনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। আমার যা ভয় হয়েছিল!'

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, 'মা ভৈ! কিন্তু বাকি ছাঁচজোড়ার দিকে দয়া করে আর নজর দেবেন না!'

শশাঙ্ক জিভ কেটে বললে, 'পাগল! আর আমি ওদিকে তাকাই?' বলেই হড়্-হড়্ করে চেয়ার টেনে নিয়ে টেবিলের কাছ থেকে পাঁচ হাত তফাতে গিয়ে বসল।

কুমুদ বললে, 'ডিটেক্টিভের পক্ষে এমন সুন্দর ছাঁচ পাবার সুযোগ বড়-একটা ঘটে ওঠে না। এখানে আমার সৌভাগ্যের কারণ হচ্ছে তিনটি।

প্রথম, বিষম দুর্যোগ হলেও মাটিকে নরম করে ঘটনার আগেই বৃষ্টি থেমে গেছে।

দ্বিতীয়, শশাঙ্কবাবুর বাড়ি থেকে শ্মশানে সরু পথ দিয়েও বড় একটা লোক-চলাচল নেই।

তৃতীয়, নতুনপুরের শ্মশান নির্জন জায়গা; ঘটনার রাত্রি ও পরদিন

সকাল পর্যন্ত সেখানে কেউ মড়া পোড়াতে যায় নি।

কাজেই পায়ের ছাপগুলো এমন নিখুঁৎ অবস্থায় পেয়েছি যে, ছাপানো গল্পের বইয়ের মতই তাদের কথা অনায়াসে পাঠ করা যায়। ঐ ছাপগুলো না পেলে আমি ধরতেই পারতুম না যে, শশাঙ্কবাবুর বাড়ির ভিতরেই সব রহস্য জানে এমন কোন লোক আছে।'

শশাঙ্ক বিমর্ষ মুখে ভগ্নস্বরে বললে, 'আমার দুর্ভাগ্যের দেখছি শেষ নেই।'

মাণিক বললে, 'কিন্তু পায়ের ছাপ না দেখেই জয়ন্ত সে-কথা জানতে পেরেছেন।'

কুমুদ সবিস্ময়ে বললে, 'তাই নাকি?'

জয়ন্ত বললে, 'আমার দৃঢ়বিশ্বাস, শশাঙ্কবাবুর বাড়ির ভিতর থেকেই খুনীকে কেউ দরজা খুলে দিয়েছিল।'

শশাঙ্ক তেমনি বিষণ্ণ ভাবেই বললে, 'এ-কথা শুনে পর্যন্ত আমার জীবন বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। মন সর্বদাই ছাঁৎ-ছাঁৎ করছে।'

কুমুদ বললে, 'কারুর উপরে আপনার সন্দেহ হয়?'

শশাঙ্ক বললে, 'যদিও আমাদের আসল পরিবার বড় নয়, তবু বাড়িতে আশ্রিত, পোষ্য, আত্মীয়, কর্মচারী, দাস-দাসী আছে অনেক। হঠাৎ তাদের কার ওপরে সন্দেহ করি বলুন?'

জয়ন্ত বললে, 'কিন্তু কাল রাতে আমি যখন বাগানে ছিলুম, তখন কে একজন লোক লুকিয়ে আমায় অনুসরণ করছিল। আবার আজ সকালেই ও-বাড়ির সরকার সুরেন আড়ি পেতে মাণিকের সঙ্গে আমার কথা শুনছিল।'

শশাঙ্ক প্রায় স্তম্ভিতের মত বললে, 'অ্যাঁঃ! বলেন কি? এতবড় আস্পর্ধা সুরেনের? কৈ, এতক্ষণে এ-কথা তো আমাকে বলেন নি?'

—'দরকার হয় নি তাই বলি নি।'

শশাঙ্ক ক্রোধে প্রায়-অবরুদ্ধ স্বরে বললে, আজকেই সুরেনকে আমি তাড়িয়ে দেব। হতভাগা, পাজী, নিমকহারাম!'

কুমুদ দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'আপনি তাড়িয়ে দেবার আগেই সুরেনকে আমি গ্রেপ্তার করব।'

মাণিক বললে, কিন্তু কি প্রমাণে? আড়ি পাতলেই কেউ খুনীর সহকারী হয় না।'

কুমুদ বললে, 'তা জানি। আইনের কেতাবে আড়ি-পাতা একটা অপরাধ বলে গণ্য নয়। কিন্তু সুরেন যখন লুকিয়ে আপনাদের কথা শুনছিল, তখন নিশ্চয়ই তার মনের ভেতরে পাপ আছে। হয়তো তার পায়ের মাপ দ্বিতীয় ব্যক্তির পায়ের মাপের সঙ্গে মিলে যাবে। আপাতত পরীক্ষা করব বলেই গ্রেপ্তার করব।'

জয়ন্ত রূপোর নস্যদানী বার করে নস্য নিতে নিতে বললে, 'হ্যাঁ, গ্রেপ্তার করবেন—ইতিমধ্যে সে যদি না চম্পট দিয়ে থাকে!

কুমুদ বললে, 'পালাবে? অসম্ভব! শশাঙ্কবাবুর বাড়ির চারিদিকেই পুলিশ-পাহারা বসেছে। সেখান থেকে এখন একটা মাছিও আর পালাতে পারবে না।'

জয়ন্ত আর এক টিপ নস্য নিয়ে বললে, 'আপনি দেখছি অতিসজাগ ব্যক্তি। আমার সাহায্য আপনার কাছে বাহুল্য মাত্র!···চলুন তা হলে। শ্রীমান সুরেনের সন্ধানে মহাসমারোহে যাত্রা করা যাক!'

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তিন ব্যক্তি খুন, তিন ব্যক্তি উধাও

সুরেনকে গ্রেপ্তার করে কুমুদ এল জয়ন্ত ও মাণিকের কাছে।

সুরেন কাঁদছিল।

জয়ন্ত বললে, 'শশাঙ্কবাবু কোথায় গেলেন?'

কুমুদ বললে, 'বাড়ির ভেতরে পূজো করতে। তাঁর আবার ও-সব

বাতিক আছে কিনা। পৃথিবী না ওল্টালে ঠিক সময়টিতে পূজোয় তাঁকে কেউ বাধা দিতে পারবে না।'

জয়ন্ত বললে, 'সুরেন, তুমি যে এত-শীঘ্র পুলিশের দয়া-দৃষ্টিতে পড়বে, তা আমি জানতুম না। ভেবেছিলুম কাল-পরশু তোমাকে গোটাকয়েক কথা জিজ্ঞাসা করব। কিন্তু কাল-পরশু তুমি তো থাকবে থানায় বা হাজতে, অতএব কথাগুলো এখনি জিজ্ঞাসা করব কি?'

সুরেন কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমি নির্দোষ। আমি কিছুই জানি না।'

কুমুদ ধমক দিয়ে বললে, 'চুপ কর বলছি! সব বদমাইসই আগে ঐ কথাই বলে, তারপর রুলের গুঁতো খেলেই সুর বদলায়।'

জয়ন্ত বললে, 'কুমুদবাবু, সুরেনকে নিয়ে একবার আমি পাশের ঘরে যেতে পারি কি?'

—'অনায়াসেই। কিন্তু দেখবেন, পালায় না যেন!'

—'সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।' এই বলে সুরেনকে নিয়ে জয়ন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মিনিট-পনেরো পরে আবার তারা ফিরে এল। মাণিক লক্ষ্য করলে সুরেনের কান্না বন্ধ হয়েছে এবং জয়ন্ত নিচ্ছে ঘন-ঘন নস্য।

জয়ন্ত বললে, 'কুমুদবাবু, আপাতত সুরেনের বিরুদ্ধে তো কোন 'কেস্' নেই?'

—'না, তবে 'কেস্' তৈরি করতে কতক্ষণ?'

'নেই বা তৈরি করলেন! সুরেনকে ছেড়ে দিন।'

কুমুদ সবিস্ময়ে বললে, 'সে কি! আপনিই তো বললেন—'

—'আমি যা বলেছি, মনে আছে। কিন্তু সুরেন আমার প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিয়েছে। ওর আর থানায় যাবার দরকার নেই। ওর জন্যে আমিই দায়ী রইলুম—ওকে ডাকলেই দেখতে পাবেন।'

—'আচ্ছা জয়ন্তবাবু, আপনি কি ওর চোখের জল দেখে ভুলে গেলেন?'

জয়ন্ত হেঁট হয়ে কুমুদের কানে কানে ফিস ফিস করে বললে, ভুলি নি। এটা আমার একটা চাল। ওকে ছেড়ে দিন। আমি বলছি, ও পালাবে না।'

—'বেশ, তাই হোক। যাও সুরেন, আজ আর তোমাকে থানায় যেতে হবে না।'

সুরেন মহাবেগে প্রস্থান করল—ব্যাঘ্রদলের মধ্যে থেকে মেষশাবকের মত।

কুমুদ একটু অসন্তুষ্ট স্বরে বললে, 'আপনার এ-চালের মহিমা বুঝলুম না।'

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, 'সব জিনিসেরই মহিমা কি সব সময়ে বোঝা যায়?'

'আমার দেখবার ইচ্ছা ছিল, দ্বিতীয় ব্যক্তির পায়ের মাপের সঙ্গে ওর পায়ের মাপ মেলে কি না!'

—'ও তো পালাচ্ছে না, দু'দিন পরে মেলালেই বা ক্ষতি কি?'

—'অকারণে দেরি করেই বা লাভ কি?

—'দেরি? কিচ্ছু দেরি হবে না মশাই! আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি, ঠিক আর দু'দিনের মধ্যেই শশাঙ্কবাবুর মনস্কামনা পূর্ণ হবে—অর্থাৎ তাঁর ভাইয়ের হত্যাকারীকে কুমুদবাবু গ্রেপ্তার করবেন।'

কুমুদ মাথা নেড়ে বললে, 'না মশাই, না! আমি ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের অমানুষিক গোয়েন্দা নই—সেই যাদের কানের পাশ দিয়ে বোঁ বোঁ করে শত শত গুলি ছুটে যায়, কিন্তু গায়ে লাগে না। আপনার পক্ষে ভবিষ্যদ্বাণী করা সহজ, কিন্তু অত শীঘ্র তাকে সফল করবার শক্তি আমার হবে না!'

—'বেশ, আমার ভবিষ্যদ্বাণী না হয় ব্যর্থই হবে। কিন্তু ও-কথা রেখে এখন বলুন দেখি, আপনি আর কোন নতুন তথ্য আবিষ্কার করতে পেরেছেন কিনা?'

—'নতুন তথ্য?······হ্যাঁ, আপনার প্রশ্ন শুনে একটা কথা মনে

পড়ে গেল। কিন্তু কথাটা হচ্ছে ভারি অদ্ভুত।'

—'কি রকম?'

—'আমাদের এলাকায় গেল দেড় মাসের মধ্যে তিনটে খুন হয়েছে।

প্রথম খুনটাও হয় এই নতুনপুরেই, হত ব্যক্তির নাম শ্যামাকান্ত বক্সী—তার ব্যবসা ছিল সুদে টাকা খাটানো।

দ্বিতীয় খুন হয় পাশের গ্রাম নন্দনপুরে, হত হয় একজন মাড়োয়ারি; তারও ব্যবসা ছিল টাকা লেন-দেন করা।

তৃতীয়বারে মারা পড়েছেন মৃগাঙ্কবাবু।'

—'কিন্তু এর মধ্যে তো অদ্ভুত কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

—শুনুন।

প্রথমত, লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে, তিন ব্যক্তিকেই গলা টিপে মেরে ফেলা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, তিন বারেই খুনী কাজ সেরে পালাতে পেরেছে।

তৃতীয়ত, তিন বারেই খুনের আগের দিন একজন করে মানুষ অদৃশ্য হয়েছে।'

জয়ন্ত উত্তেজিত ভাবে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'তার মানে?'

—'প্রথম খুনের আগের দিন থেকেই নতুনপুরের চাঁড়াল-পাড়ার একটি লোকের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। দ্বিতীয় খুনের আগের দিন এখানকার এক গোয়ালা অদৃশ্য হয়েছে, এখনো তার সন্ধান মেলে নি। মৃগাঙ্কবাবু যেদিন খুন হন, তারও আগের দিন শ্মশান থেকে অন্তর্হিত হয়েছে এক সন্ন্যাসী, এ-কথা ত আপনারাও জানেন।'

—'জানি। কিন্তু শশাঙ্কবাবুর বিশ্বাস সত্য হলে মানতে হয়, সেই সন্ন্যাসী হয়তো খুনী, সুতরাং তার অন্তর্ধানের একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে।'

—'অপরাধী পালায় অপরাধের পর, কিন্তু সন্ন্যাসী গা-ঢাকা দিয়েছে খুনের আগের দিনে।'

—'সন্ন্যাসী তো নতুনপুরের লোক নয়, তাড়িয়ে দেবার পর সে যে

এখান থেকে চলে যাবে, এইটেই তো স্বাভাবিক। হয়তো সে খুনীও নয়।'

—'কি জানি, আমার মন যেন বলছে, এই তিনটে খুনের মধ্যে কি একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। প্রত্যেক বারেই গলা টিপে হত্যা, আর ঘটনার ঠিক আগের দিন একজন করে মানুষের অন্তর্ধান। হুঁ, বড়ই সন্দেহজনক!'

মাণিক বললে, 'কিন্তু যারা অদৃশ্য হয়েছে, তাদের সঙ্গে হত্যাকারীর কি সম্পর্ক থাকতে পারে?'

—'কিছুই বুঝতে পারছি না। এক চাঁড়াল আর এক গোয়ালা অদৃশ্য হয়েছে, কিন্তু তাদের অদৃশ্য হবার কথা নয়। তারা বাসা থেকে অন্য কাজে বেরিয়ে আর ফেরে নি। তাদের আত্মীয়েরা আর পুলিশ অনেক খুঁজেও সন্ধান পায় নি। তাদের সঙ্গে দুই ব্যক্তির পরিচয় পর্যন্ত ছিল না। যদি মানুষ-চুরি বলি, তা হলে প্রশ্ন ওঠে, তাদের মত গরিব লোককে চুরি করে কার কি লাভ হবে? তারা শিশু নয়, জোয়ান ব্যক্তি। সন্ন্যাসী না হয় চলে গেছে বা পালিয়েছে;—কিন্তু তারা কোথায় গেল? জয়ন্তবাবু, প্রায় উপরি-উপরি এই সব মামলার কিনারা হচ্ছে না বলে আমাদের থানার ভারি দুর্নাম হয়েছে।'

জয়ন্ত গম্ভীর মুখে ভাবতে ভাবতে বললে, 'কুমুদবাবু, আপনি ঘটনার ধারাকে আবার অন্য দিকে নিয়ে গেলেন যে! ভেবেছিলুম আপনার সঙ্গে আজ একবার নতুনপুরের শ্মশান পরিদর্শনে যাব, তা আর হল না দেখছি।'

—'কেন?'

—'শ্মশান পরিদর্শন কালকের জন্যে তোলা রইল। প্রথম আর দ্বিতীয় বারে যারা খুন আর অদৃশ্য হয়েছে তাদের ঠিকানা দিন দেখি, আমি কিছু খবরাখবর নিয়ে আসি।'

'পুলিশ যেখানে হাল ছেড়ে দিয়েছে, এতদিন পরে সেখানে গিয়ে আপনি আর নতুন কি আবিষ্কার করবেন?'

—'তবু চেষ্টা করে দেখতে দোষ আছে কি?'

—'বেশ, যা ভালো বোঝেন করুন। কিন্তু বলছি, এ-মাকড়সার জালের কোনই হদিস পাবেন না।'

জবাবে জয়ন্ত কেবল একটুখানি মুচকে হাসলে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কাঠের বাক্সে কি ছিল?

সন্ধ্যার পর জয়ন্ত বাসায় ফিরে এল।

মাণিক বললে, 'আমাকে সারাদিন একলা ফেলে নিজে তো দিব্যি টহল দিয়ে এলে! আমি গুনছি কড়িকাঠ, আর তুমি টানছ নস্যি! তোমার যত নস্যি তত ফূর্তি! এ মামলাটা হাতে নিয়ে পর্যন্ত তুমি যেন আনন্দে আটখানা হয়ে আছ! এত আনন্দ কেন হে বন্ধু?'

—'মামলাটা ছেলেখেলার মতন সহজ বলে।'

—'সহজ? আমি তো কোন থই পাচ্ছি না।'

—'সেইজন্যেই তোমার নাম মাণিক আর আমার নাম জয়ন্ত।'

—'আমি যথেষ্ট ভেবে দেখছি। খুনী কে? সেই সন্ন্যাসী? কাল রাতে বাগানে যে তোমার পিছু নিয়েছিল, সে? সুরেন? না শশাঙ্কবাবুর বাড়ির আর কোন লোক? না শ্মশানে গিয়ে যে অদৃশ্য হয়েছে সেই ব্যক্তি? সারাদিন ধরে তো তদ্বির করে এলে, সঠিক কোন উত্তর পেলে?'

—'অপেক্ষা কর, হয়তো কাল উত্তর দিতে পারব। হয়তো আমার ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হবে না।'

—'তুমি চলে যাবার পর কুমুদবাবু আমাকে কি বললেন জানো?'

—'কি?'

—কুমুদবাবু বললেন, 'তিনি কাল এ-বাড়ির সকলকার পায়ের মাপ নেবেন।'

—'তারপর?'

—'সেই দ্বিতীয় ব্যক্তির পায়ের মাপের সঙ্গে যার পা মিলবে তাকেই তিনি গ্রেপ্তার করবেন।'

—'কি অপরাধে?'

—'খুনীর সহকারী বলে?'

—'তিনি গ্রেপ্তার করতে পারেন না।'

—'পারেন না?'

'না। আসামী বলবে, আমি খুনীকে ধরবার জন্যে তার পিছু নিয়েছিলুম। তারপর ধরতে না পেরে ফিরে এসেছি!'

—'তা হলে প্রশ্ন ওঠে, পুলিশকে আগে সে-কথা জানায় নি কেন?'

—'সে বলবে, ভয়ে! বুঝেছ মাণিক, আইন আছে বটে, কিন্তু আইনেই আইনকে ফাঁকি দেবার উপায়ও আছে। কুমুদবাবু এত সহজে কেল্লা ফতে করতে পারবেন না। আগে তাঁকে আবিষ্কার করতে হবে, শ্মশান থেকে এসে খুন করে আবার শ্মশানে ফিরে গিয়ে যে অদৃশ্য হয়েছে, সে কে? তার পায়ের ছাপের সঙ্গে যার পা মেলে তাকে না ধরতে পারলে কোন সুবিধাই হবে না।'

—'তুমি তার সন্ধান পেয়েছ?'

—'এখনো পাই নি।'

—'তবু ভবিষ্যদ্বাণী করেছ?'

—'হুঁ। হয়তো শ্মশানে গিয়ে কাল তার পাত্তা পাব।'

—'যদি না পাও?'

—'আশা হচ্ছে, কিছু-না-কিছু পাবই। মাণিক, তুমি জানো না, একে-একে আমি অনেক গুপ্তকথাই আবিষ্কার করেছি। আমি যে ঠিক পথ ধরেছি তাতে আর কোন সন্দেহ নেই; অগ্রসরও হয়েছি অনেকখানি, যদিও পথের শেষে কি আছে সেটা এখনো আমার

কাছে অজানা। হয়তো পথের শেষ পাব ঐ শ্মশানেই! দেখা যাক, কী হয়!'

সে রাতে যেমন গুমোট তেমনি মশা। মশারি ফেললে আরো গরম হয় এবং মশারি তুললে প্রাণ যায়-যায়।

জয়ন্ত মহা জ্বালাতন হয়ে বললে, 'ধেৎ, মশার সঙ্গে আর লড়তে পারি না! মাণিক তোমার অবস্থা কেমন?'

—'ভয়াবহ! শত শত হুলের খোঁচায় সর্বাঙ্গে হয়েছে শত-শত ছিদ্র। প্রাণপক্ষীকে আর বুঝি দেহের ভিতরে ধরে রাখা যায় না, সেই সব ছিদ্রপথ দিয়ে সে উড়ে যেতে চায়! গরমে ঘেমে নেয়ে উঠেছি।'

—'বাগানে গিয়ে খানিকটা পায়চারি করে আসবে?'

—'সাধু প্রস্তাব। সমর্থন করবার জন্যে এই আমি গাত্রোত্থান করলুম।'

দুই বন্ধুতে ঘরের দরজা খুলে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল।

নিশুতি রাত। কাছেই কোথাও পাঁড়ে, চোবে, দোবে প্রভৃতির নাকে-নাকে নানা সুরের বাজনা বাজছে। চারিদিক থেকে তাদের সঙ্গে টক্কর দেবার জন্যে ব্যাঙের দলও বসিয়েছে জলসা। ঝিঁঝিঁ-পোকারাও হার মানতে রাজি নয়, তাদেরও পাড়ায় চলছে ঝিঁঝিঁ-রাগিণীর আলাপ। গাছে-গাছে বসে প্যাঁচারাও বলছে—আমরাই বা চুপটি মেরে থাকব কেন? আলাপ করতে না পারি, প্রলাপই বকব,—শোনো!

শব্দময়ী রাত্রি। শহুরে রাত তবু খানিকটা স্তব্ধ হয়, কিন্তু পাড়াগেঁয়ে কিংবা বন্য রাত্রি মৌনব্রত অবলম্বন করতে শেখে নি।

বাতাস আজ ধর্মঘট করেছে বলে গাছের দল গোলমাল ভুলে ঘুমিয়ে পড়েছে। কবিদের অত-সাধের মর্মধ্বনি গেছে দেশ ছেড়ে পালিয়ে।

চাঁদের আলোর এমন জোর নেই যে, আকাশের রং বোঝা যায়। বিরক্ত তারাদের চোখ করছে পিটপিট, পিটপিট।

জয়ন্ত বললে, 'চল, পুকুরের দিকে পা-চালানো যাক! সেখানে গেলে একটু-আধটু ঠাণ্ডার আমেজ পাওয়া যেতে পারে।'

আলোআঁধারি-মাখা রহস্যের মধ্য দিয়ে দু'জনে পুকুরের দিকে অগ্রসর হল।

যখন তারা শশাঙ্কবাবুর ঘরের নীচে গিয়ে পড়েছে তখন উপর থেকে শোনা গেল সুগম্ভীর সুরে মন্ত্র-উচ্চারণ ঃ

'চিন্তয়ামি চ তন্নাম রক্ষ মাং সর্বতঃ সদা।
দিগম্বরীং করালাস্যাং ঘোরদংষ্ট্রাং ভয়ানকাং ॥
কর্ণমূলে শবযুগ্মং স্থূলতুঙ্গপয়োধরাং
মহারৌদ্রীং মহাঘোরাং শ্মশানালয়বাসিনীং ॥—'

মাণিক বললে, 'শশাঙ্কবাবু পূজায় বসেছেন। দক্ষিণা-কালিকার মন্ত্র আউড়ে বোধ হয় গুমোটের কবল থেকে নিস্তার পাবার চেষ্টায় আছেন।'

জয়ন্ত বললে, 'আমরা যে মন্ত্র-তন্ত্র জানি না! জানলে হয়তো আজকের বেয়াড়া গুমোটকে জব্দ করে দিতুম দস্তুরমত!'

তারা পুকুরের ঘাটে গিয়ে বসল। সত্যি, সেখানটি বেশ ঠাণ্ডা। খানিক আলোয় খানিক ছায়ায় ভরা জল করছে টলটল,—মাঝে-মাঝে আকাশে মেঘ এসে তার বুকে ঘনিয়ে তুলেছে অন্ধকার।

দু'জনে নীরবে বসে রইল অনেকক্ষণ—এবং সেখান থেকেই শুনতে লাগল ভক্ত শশাঙ্কবাবুর রসনা মন্ত্রপাঠ করছে ক্রমাগত।

বাড়ির কোন বড় ঘড়ী হঠাৎ ঢং-ঢং-ঢং করে জানিয়ে দিলে—রাত এখন তিনটে।

জয়ন্ত বললে, 'এইবার ওঠা যাক মাণিক! রাতের পরমায়ু এল ফুরিয়ে। ঘরের শিকার পলাতক দেখে মশারাও এতক্ষণে বেরিয়ে পড়ে, পাঁড়ে চোবে দোবেদের আস্তানায় গিয়ে হাজির হয়েছে।'

মাণিক বললে, 'কিন্তু বাঙালীদের সরস দেহের গন্ধ পেলে নিশ্চয়ই তারা এখুনি শুকনো ছাতুর লোভ ত্যাগ করে ছুটে আসবে। আমার ইচ্ছে এইখানেই লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ি।'

—'তা হয় না মাণিক! কোথায় এসেছি জানো তো? এখানে আমরা অজাতশত্রু নই। ওঠ।'

তারা উঠল। কিন্তু ফিরতেই দেখলে, কে একজন লোক বাগানের পথ দিয়ে আসতে-আসতে তাদের সাড়া পেয়েই লম্বা দৌড় মেরে বাগানের তলায় অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

জয়ন্ত বললে, 'গতিক সুবিধের নয়। কে ও? আমাদের দেখে অমন করে পালালো কেন?'

উপরে শশাঙ্ক তখনো নিজের মনে ভক্তিভরে দক্ষিণা-কালিকার মন্ত্র আবৃত্তি করছে।

মাণিক বললে, 'শশাঙ্কবাবুকে ডাকব নাকি?'

—'ডাকবার দরকার নেই। ভক্তের পূজোয় বাধা দেওয়া কখনও উচিত নয়।'

—'তবে? ঐ অন্ধকারের মধ্যে ওখানে গিয়ে আমরা কি ওকে খুঁজে পাব?'

—'ওকে খুঁজতে গেলে ঘর থেকে আমাদের 'টর্চ' নিয়ে আসতে হয়। কিন্তু ততক্ষণে ও রাস্কেল লম্বা দেবে।'

—'আমাদের কাছে রিভলভার পর্যন্ত নেই। এখন কি করা যায় বল দেখি?'

—'কুইক মার্চ কর! যেন আমরা ওকে দেখতে পাই নি। ঘরে পৌঁছে আপাতত নিদ্রাদেবীর আরাধনা, তারপর কাল সকালে উঠে কর্তব্য স্থির করা যাবে।'

তারা দ্রুতপদে ঘরের দিকে এগুতে লাগল। লোকটাকে আর দেখা গেল না।

তাদের ঘর যে-দিকে, সে-দিকের দালানে ওঠবার সিঁড়ির সামনেই

গিয়ে জয়ন্ত বললে, 'আমরা যখন ঘর থেকে বেরুই, তখন এখানে এ-বাক্সটা ছিল না তো!'

মাণিক-বললে, 'হয়তো ছিল—হয়তো ছিল না। অত আমি লক্ষ্য করি নি।'

জয়ন্ত বাক্সটা নেড়ে-চেড়ে পরীক্ষা করতে করতে বললে, 'গোয়েন্দার সবচেয়ে বড় কর্তব্য হচ্ছে দৃষ্টিকে সজাগ রাখা সর্বদা। অন্যমনস্ক গোয়েন্দা গাধার চেয়েও নীচু দরের জীব।'

বাক্সটা সাধারণ প্যাকিং-কেসের মতন দেখতে। তার দরজাটা টেনে তুলে ভেতরে আঘ্রাণ নিয়ে জয়ন্ত বললে, 'বিশ্রী বুনো-বুনো গন্ধ বেরুচ্ছে। মাণিক, এর ভেতরে কোন জানোয়ার ছিল।'

—'এখন তো নেই?'

—'না। কিন্তু সে গেল কোথায়? বাক্সটা এখানে ছিল না, কোত্থেকে এল? এর মধ্যে যে জন্তু ছিল, সে কোথায় গেল?'

—'চুলোয়। জয়ন্ত, মিছে মাথা ঘামাও কেন? চল, আমার ঘুম পেয়েছে।'

'কি ঘুম মাণিক? অনন্ত ঘুম নয় তো?'

—'মানে?'

—'পৃথিবী এখন ঘুমোচ্ছে। এমন সময়ে আমাদের ঘরের ঠিক সামনেই কেন এই বাক্সের আবির্ভাব? বাগানে এই মাত্র যে-লোকটা আমাদের দেখেই পালিয়ে গেল, সে কে? বাক্সের ভেতরের জানোয়ার বাইরে গেছে, আর পাঁচ-ছয় হাত তফাতেই আমাদের ঘরের জানালা ছিল খোলা। আমাদের দেখে খুশি নয়, এ-বাড়িতে এমন সব লোকের অভাব নেই। ভেবে দেখ মাণিক, ভালো করে ভেবে দেখ!'

—'ভাবছি।'

—'দুই আর দুইয়ে কত হয়?'

—'চার।'

'অতএব আজ রাত্রে জয়ন্তের ও মাণিকের গৃহপ্রবেশ নিষেধ। ঘরে

আলো জ্বালা নেই। অন্ধকারে হয়তো ওখানে অনন্ত নিদ্রা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। অতএব সকাল না-হওয়া পর্যন্ত উদ্যান ভ্রমণই প্রশস্ত।'

—'আমার আর ঘুম পাচ্ছে না জয়ন্ত!'

'অপরাধীদের ওপরে নিয়তির কি অভিশাপ আছে জানি না, খুব মাথা খাটিয়ে গুছিয়ে কাজ করেও প্রায়ই তারা শেষ রক্ষা করতে পারে না। এই জন্যেই তারা মরে। দেখ না, খালি বাক্সটা এমন চোখের সামনে ফেলে রেখে যাবার কি দরকার ছিল?'

পরদিন সকালে বিছানার ওপরে এবং খাটের তলায় আবিষ্কৃত হল, মস্ত-মস্ত দুটো কেউটে সাপ। কিন্তু ছোবল মারবার আগেই রিভলভারের গুলিতে তাদের উদ্যত ফণা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নতুনপুরের শ্মশান

বেলা আর একটু বাড়লে পর কুমুদ এসে হাজির। সমস্ত শুনে এবং মরা সাপ দুটো স্বচক্ষে দেখে খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইল।

তারপর বললে, 'আপনাদের আর এখানে থাকা উচিত নয়।'

জয়ন্ত হাস্যমুখে বললে, 'আমাদের তো আর বেশিক্ষণ এখানে থাকবার প্রয়োজন হবে না! আমার ভবিষ্যদ্বাণী মনে আছে তো? কালকের মধ্যেই আপনি খুনীকে গ্রেপ্তার করবেন।'

—'ঠাট্টা করে আমাকে আর লজ্জা দেবেন না জয়ন্তবাবু! আমার এলাকায় তিন তিনটে খুনী পলাতক, তাদের একজন আবার আমাদের কাছে-কাছে থেকেই নতুন খুন করবার চেষ্টায় আছে, আর আমি কিছুই করতে পারছি না! হ্যাঁ, ভালো কথা। শশাঙ্কবাবুকে সমস্ত বলেছেন?'

—'না। মিছে তাঁকে ব্যস্ত করে লাভ কি?'

—'কাল রাতে বাগানে যাকে দেখেছিলেন, সে সুরেন নয় তো?'

'দূর থেকে চিনতে পারি নি। সুরেন হলেও হতে পারে। সে কাপুরুষ আর নির্বোধ দুই-ই। ও-শ্রেণীর লোক ভয় পেলে সব করতে পারে।'

'আর আপনি তাকেই ছেড়ে দিলেন! না জয়ন্তবাবু, আর আমি আপনার কথা শুনছি না। আজ এখনই সুরেনকে গ্রেপ্তার করব।'

—'আজকের দিনটাও দয়া করে অপেক্ষা করুন। এখন আগে আমাকে একবার শ্মশানটা দেখিয়ে আনুন।'

—'মিথ্যেই সেখানে যাওয়া। সেখানে গিয়ে দেখবেন খালি কতকগুলো ভাঙা হাঁড়ি, দু-চার টুকরো হাড় আর ছাইয়ের গাদা।

পদচিহ্নগুলো পর্যন্ত আর নেই।'

—'তবু একবার যাব। যে-পথ দিয়ে খুনী গিয়েছিল, সেই পথ দিয়েই আমি যাব। চল মাণিক! কুমুদবাবু, আপনি জনচারেক পাহারাওয়ালা সঙ্গে নেবেন।'

—'কেন?'

—'সাবধানের মার নেই।'

—'যা বলেছেন। যে-সব কাণ্ড হচ্ছে!'

—'আসুন! আমরা খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে শ্মশানের পথ ধরব।'

বাগান দিয়ে সকলে খিড়কির দরজার দিকে যাচ্ছে হঠাৎ শশাঙ্ক তাদের দেখতে পেলে। ওপরের জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে বললে, 'একি ব্যাপার! সকলে মিলে দল বেঁধে কোথায় যাওয়া হচ্ছে?'

মাণিক বললে, 'শ্মশান ভ্রমণে।'

—'হ্যাঁ, বেড়াবার মত জায়গা বটে! আমিও তোমার সঙ্গী হব নাকি?'

—'স্বচ্ছন্দে।'

মিনিট-দুয়েক পরেই শশাঙ্কও তাদের দলে এসে জুটল। তখন সে বোধ হয় সবে পূজো সেরে উঠেছে—কারণ, তার পরনে গরদের ধুতি-চাদর, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা। সেই পোশাকেই শশাঙ্ক শ্মশানের পথ ধরলে।

মাণিক বললে, 'কাল অত রাত পর্যন্ত দক্ষিণা-কালিকার পূজোর মন্ত্র আউড়েও আপনার আশা মেটে নি? এর মধ্যেই আবার আর এক দফা পূজো সারা হয়ে গেল?'

—'কি আশ্চর্য, 'রাত্রের কথা আপনি কি করে জানলেন?'

—'কাল যা গুমোট গেছে! আমি আর জয়ন্ত বাগানে বেড়াতে বেড়াতে আপনার গলা শুনতে পেয়েছি।'

শশাঙ্ক লজ্জিতভাবে বললে, 'অসার সংসারে একটু-আধটু মায়ের

নাম কির, ওর ওপরে আর দৃষ্টি দেবেন না।'

কুমুদ বললে, 'আপনি পুণ্যাত্মা, তাই পরলোকের পথ পরিষ্কার করছেন। আমরা হচ্ছি মহাপাপিষ্ঠ, দিন-রাত কেবল মায়াকেই আঁকড়ে পড়ে আছি।'

জয়ন্ত বললে, 'শশাঙ্কবাবুও মায়ার ভক্ত। তবে ছার মায়া নয়, —মহামায়া।'

তারা শ্মশানের পথে এসে পড়ল। পথ চওড়ায় পুরো চার হাতও হবে না বোধহয়। কখনো ছোট-ছোট মাঠের ওপর দিয়ে, কখনো কাঁটা-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এবং কখনো বা বাঁশবনের পাশ দিয়ে সেই পথ এঁকে-বেঁকে এগিয়ে প্রায় মাইলখানেক পরে শ্মশানে গিয়ে শেষ হয়েছে। এ-পথটা হচ্ছে শশাঙ্কবাবুদের নিজস্ব ব্যবহারের জন্যে। এর ধারে হাট-বাজার বা বাড়িঘর নেই, কাজেই এখানে বড়-একটা পথিকের দেখা পাওয়া যায় না।. নতুনপুরের লোক শ্মশানে যায় বড় রাজপথ দিয়ে।

কুমুদ আঙুল দিয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললে, 'ঘটনার পর তিন-চারবার বৃষ্টি হওয়াতে পদচিহ্নগুলো অনেক জায়গাতেই লুপ্ত হয়ে গেছে বটে, কিন্তু ঐ দেখুন, মাঝে-মাঝে অস্পষ্ট ছাপ এখনো দেখা যাচ্ছে। বৃষ্টি না হলে কঠিন কাদার ওপরে ছাপগুলো আরও সুস্পষ্ট থাকত। ঘটনার পর পুলিশের লোক ছাড়া আর কেউ বোধহয় এ-পথে আসে নি। এ-পথে লোক না চলার আরো একটা কারণ আছে। অনেকের বিশ্বাস, এটা হচ্ছে ভূতুড়ে পথ,—রাত্রে এখানে যারা দেখা দেয়, তারা মানুষ নয়। পথটা মাঝে-মাঝে জলার পাশ দিয়ে গেছে তাই আলেয়া জ্বলে। সেইজন্যেই এই কুসংস্কার আর কি!'

শশাঙ্ক বললে, 'কেবল তাই নয়। কোন-কোন ডানপিটে লোক রাত্রে এ-পথে এসে আর বাড়িতে ফেরে নি।'

কুমুদ বললে, তাই নাকি? তাদের মৃতদেহ এই পথে পাওয়া গিয়েছে?'

শশাঙ্ক গম্ভীর স্বরে বললে, 'না। তাদের মৃতদেহ আর পাওয়া যায় নি!'

কুমুদ সচমকে বললে, 'পাওয়া যায় নি মানে? দেহশুদ্ধ লোক-গুলোর প্রাণ কি পঞ্চভূতেই বিলীন হয়ে গেল?'

শশাঙ্ক তেমনি গম্ভীর স্বরেই বললে, 'কি হল, কোথায় গেল, কেউ জানে না! তবে তারা যে আর বাড়িতে ফেরে নি, বা তাদের দেহও যে আর পাওয়া যায় নি, এটা সত্যি কথা।'

কুমুদ যেন নিজের মনে-মনেই বললে, 'তা হলে এ অঞ্চলে মানুষের অদৃশ্য হওয়া দেখছি খুবই সাধারণ ঘটনা। মানুষের পর মানুষ অদৃশ্য হয়, পুলিশও তাদের খুঁজে পায় না।'

যেন একটু ব্যঙ্গের স্বরেই শশাঙ্ক প্রতিধ্বনি করে বললে, 'না, পুলিশও তাদের খুঁজে পায় না। কুমুদবাবু, আপনি দু-দিন তো এখানে এসেছেন, আপনি কেমন করে জানবেন? কিন্তু আমরা সকলেই জানি আর বিশ্বাস করি, শ্মশানের এ-পথটা হয়েছে অনেকের পক্ষেই মহা-প্রস্থানের পথ। যাক ও-কথা। এই আমরা শ্মশানে এসে পড়েছি।'

ছোট শ্মশান। একদিকে কালভৈরবের ছোট একটি পুরানো মন্দির ছাড়া আর কোন ঘর নেই। পাশেই একটা পুকুর,—তার ঘাট ভাঙা, জল নোংরা। শ্মশানের দু-দিকে রয়েছে দুর্ভেদ্য অরণ্য; চিতার কাঠ কাটবার সময় ছাড়া মানুষ তার কাছে যায় না এবং তার ভিতরে প্রবেশ করবার কোনরকম পথই দেখা গেল না।

জয়ন্ত একলা চারিদিকটা একবার ঘুরে এল।

কুমুদ বললে, 'আমি কি ভুল বলেছি জয়ন্তবাবু? দেখছেন তো, এখানে এসে আপনার কোনই লাভ হবে না?'

জয়ন্ত সে-কথা কানে না তুলে বললে, 'প্রথম ব্যক্তির—অর্থাৎ খুনীর পায়ের দাগ কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছিল!'

কুমুদ অগ্রসর হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বললে, 'এইখানে।'

জয়ন্ত দেখলে, তারপরেই রয়েছে ছোট একটা জঙ্গল, কাঁটাগাছে ভরা। সে বললে, 'এ-জঙ্গলে মানুষ ঢুকতে পারে শশাঙ্কবাবু?'

শশাঙ্ক জোরে মাথা নেড়ে বললে, 'অসম্ভব?'

—'যদি ঢোকে?'

'কাঁটাগাছে সর্বাঙ্গ ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে।'

—'কিন্তু খুনের পরে মানুষ হয় মরিয়া। খুনী যদি আহত হয়েও ওর মধ্যে ঢুকে বেরিয়ে গিয়ে থাকে?'

শশাঙ্কের চেয়ে জোরে মাথা নেড়ে কুমুদ বললে, 'তা সে যায় নি জয়ন্তবাবু, তা সে যায় নি। ও-সন্দেহ আমারও মনে আছে। জঙ্গলটার চারদিকে আমরা তন্ন-তন্ন করে খুঁজেছি, কোথাও একটাও পায়ের দাগ দেখতে পাই নি।'

—'খুনী যদি শ্মশানের অন্য কোন দিক দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে থাকে?'

—'পায়ের দাগ সে-কথা বলে না, শ্মশানের আর কোথাও তার পদচিহ্ন নেই। যেখানে তার পায়ের দাগ শেষ হয়েছে, দ্বিতীয় ব্যক্তিও সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তারপর সে যে ফিরে শ্মশান থেকে বেরিয়ে শশাঙ্কবাবুর বাড়ির দিকে গিয়েছে, পায়ের দাগ দেখে তা ধরতে পেরেছি।'

জয়ন্ত কোন জবাব না দিয়ে হঠাৎ কি-যেন দেখে জঙ্গলের দিকে এগিয়ে গেল। পকেট থেকে রূপোর নস্যদানী বার করলে। এক টিপ নস্য নিয়ে বললে, 'নস্যি খুব ভালো জিনিস কুমুদবাবু! মাথা সাফ হয়। এক টিপ নেবেন নাকি?'

—'না, ধন্যবাদ। আর আমাদের এখানে কোন কাজ আছে?'

—'আপনি ঠিক বলেছেন। খুনী শেষ পদচিহ্ন ফেলেছিল এই-খানেই। আপনার দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা স্বীকার না করে উপায় নেই। কিন্তু কেবল দৃষ্টির তীক্ষ্ণতাই সব নয়, তার পরেও আর একটা শক্তি না থাকলে চলে না।'

—'কি শক্তি?'

—'মস্তিষ্ক-চালনার শক্তি। সে শক্তিকে আপনি কখনও কাজে লাগান নি।'

কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট স্বরে কুমুদ বললে, 'কেন?'

—'মানুষ কর্পূর নয়, উবে যায় না। সে মাটির ওপরে দাগ ফেলে চলতে বাধ্য; তার ডানা নেই যে উড়ে পালাবে।'

মাথা চুলকোতে চুলকোতে কুমুদ বললে, 'আমিও সে-কথা জানি জয়ন্তবাবু। কিন্তু—'

—'এখানে কোনও কিন্তু নেই। খুনী যখন বেরিয়ে যায় নি, তখন সে শ্মশানেই আছে।'

—'এখনো?'

—'এখনো।'

—'কী বলছেন!'

—'ঠিক বলছি। ঐ দেখুন!'—জয়ন্ত জঙ্গলের এক জায়গায় অঙ্গুলি নির্দেশ করলে।

—'ওখানে বুনো ঝোপের তলায় লোহার ডাণ্ডার মত কি-যেন দেখা যাচ্ছে না?'

—'হ্যাঁ। বোধহয় শাবল।'

কুমুদ হাত বাড়িয়ে সেটা টানতেই কিসের শব্দ হল—লোহায়-লোহায় ঠোকাঠুকির মত।

জয়ন্ত বললে, 'বোধহয় ওখানে কোদালও আছে।'

সত্য! কুমুদ হস্তচালনা করে একটা কোদালও বার করলে। বললে, 'এর অর্থ কি?'

—'অর্থ অত্যন্ত স্পষ্ট। খুনী এখনো এখান থেকে পালাতে পারে নি।'

—'সে কি জঙ্গলে লুকিয়ে আছে?'

—'পাগল! সে ঠিক আমার পায়ের তলায় মাটির ভেতরে লুকিয়ে আছে। দেখছেন না, আশপাশের জমিতে ঘাস রয়েছে, কেবল এইটুকু

জায়গাতেই নেই !'

কুমুদ এক মুহূর্ত কি ভাবলে, তারপর হঠাৎ লাফ মেরে দু'হাতে জয়ন্তের দু'খানা হাত চেপে ধরে উচ্ছ্বসিত স্বরে বললে, 'জয়ন্তবাবু, জয়ন্তবাবু! স্বীকার করছি, গোয়েন্দাগিরিতে আপনার কাছে আমি শিশু! আপনি এত সহজে যে সত্য আবিষ্কার করলেন, তার জন্যে এত দিন ধরে আমরা অন্ধের মত অন্ধকার হাৎড়ে বেড়াচ্ছিলুম! ঠিক, ঠিক! জমির এই অবস্থা, এই শাবল আর কোদাল দেখেই সব বোঝা যাচ্ছে !'

—'হুঁ! খুনীকে কেউ খুন করে এইখানে পুঁতে রেখেছে। তাই সে শ্মশান থেকে বেরুতে পারে নি।'

—'তা হলে দ্বিতীয় ব্যক্তি খুনীর বন্ধু নয়, শত্রু ?'

—'তাই তো মনে হচ্ছে !'

—'সে কে ? সুরেন ?'

—'না অন্য কেউ। তার পায়ের মাপ আপনার কাছে আছে। সুতরাং প্রমাণের অভাব হবে না।'

—'তাকে আপনি জানেন ?'

—জানি বৈকি! ঐ যে, ঐ যিনি শ্মশানের পথ দিয়ে দৌড় মেরেছেন রেসের ঘোড়ার মত !'

—'উনি তো শশাঙ্কবাবু! কিন্তু উনি অত ছুটছেন কেন !'

—'পাছে আপনি ওঁর পায়ের মাপ নেন !'

—অ্যাঁঃ, অ্যাঁঃ! বলেন কি ? আপনি কি অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পারেন ? আপনি কি যাদুকর ? সেপাই, সেপাই! শীগগির ঐ বাবুর পিছনে ছোটো। ও যেন পালাতে না পারে। ওকে ধরে আনো···কিন্তু— কিন্তু, এ যে বিশ্বাস হচ্ছে না···তবে অসম্ভবই বা কি ? রাগ সামলাতে না পেরে খুনীকে খুন করে উনি প্রতিশোধ নিয়েছেন !'

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, 'কিন্তু হয়তো উনি অতটা সাধুও নন। আমার বিশ্বাস—খুনীকে উনিই নিজের ভাইয়ের পিছনে লেলিয়ে

দিয়েছিলেন। আচ্ছা, আসল ব্যাপার নিয়ে পরে মাথা ঘামানো যাবে—আগে তো এখানকার মাটি খুঁড়ে দেখা যাক !'

জয়ন্ত শাবল নিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগল এবং কুমুদ কোদাল নিয়ে

মাটি তুলতে লাগল। মাটি বেশ আলগাই ছিল, বেশিক্ষণ পরিশ্রম করতে হল না—প্রথমেই দেখা গেল, মানুষের ছ'খানা বিবর্ণ ও স্ফীত পা।

মাণিক নাকে কাপড়-চাপা দিয়ে পিছিয়ে আসতে আসতে ঘৃণাভরে বলে উঠল, 'জয়ন্ত, তুমি কি করে এ-বিকট গন্ধ সহ্য করছ? প্রমাণ তো পেলে, এখন উঠে এস—মুদ্দোফরাস ডেকে এনে মড়াটাকে বার কর!

জয়ন্ত শাবলটা ফেলে দিয়ে বললে, 'হ্যাঁ কুমুদবাবু, এ-গন্ধ সহ্য করা অসম্ভব! মুদ্দোফরাসদের খবর দিন।'

একজন জমাদারও কুমুদের সঙ্গে এসেছিল, সে তখনি গিয়ে চারজন মুদ্দোফরাস ডেকে আনলে।

যে মৃতদেহটা তারা ওপরে টেনে তুললে, পচে ফুলে তা হয়ে উঠেছিল বীভৎস! মাথায় তার লম্বা চুল, শরীরের স্থানে-স্থানে এখনো দেখা যাচ্ছে সিন্দুরের ও রক্তচন্দনের চিহ্ন এবং গলায় ঝুলছে তখনো শুকনো জবাফুলের মালা!

কুমুদ বললে, 'এই বোধহয় সেই খুনী সন্ন্যাসী! কিন্তু এমন ভাবে রক্তচন্দন, সিন্দুর মেখে আর জবার মালা পরে কেউ কখনো খুন করতে যায়!'

মুদ্দোফরাসরা সবিস্ময়ে জানালে, গর্তের মধ্যে আরো ছুটো লাস আছে!

কুমুদ যেন আকাশ থেকে পড়ে বললে, 'বলিস কি রে, বলিস কি রে!'

জয়ন্তের মুখ বিষম গম্ভীর হয়ে উঠল।

এবারে যে ছুটো দেহাবশেষ বেরুলো, তাদের অবস্থা অভাবিত-রূপে ভয়ানক। একটা তো একেবারে কঙ্কালে পরিণত হয়েছে আর একটা কঙ্কালের স্থানে স্থানে কিছু-কিছু গলিত মাংস লেগে আছে, এইমাত্র।

কুমুদ হতভম্বের মত বললে, 'এ ছুটো কাদের শেষ চিহ্ন? কে এদের খুন করলে?'

জয়ন্ত বললে, 'খুনী যে শশাঙ্ক তাতে আর সন্দেহ নেই। তবে এরা যে কারা, সেটা ঠিক করে বলা শক্ত। এদের এখানে দেখব বলে আমি আশা করি নি।'

মাণিক বললে, 'কুমুদবাবু, আপনার এলাকা থেকে আরো দু-জন লোক অদৃশ্য হয়েছে বলেছিলেন না? এরা তারা নয় তো?'

—'তা কি করে হবে? তাদের সঙ্গে শশাঙ্কের সম্পর্ক কি?'

জয়ন্ত চিন্তিতভাবে বললে, 'তাদের সঙ্গে শশাঙ্কের সম্পর্ক আছে কিনা জানি না। তবে তাদের অদৃশ্য হবার পরে-পরেই শ্যামাকান্ত বক্সী আর এক মাড়োয়ারি খুন হয়—যাদের টাকা লেন-দেনের ব্যবসা ছিল। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, তাদের দু'জনেরই কাছে শশাঙ্ক প্রচুর টাকা ধার করেছিল!'

কুমুদ যেন আপন মনেই বললে, 'তিনটে খুন একরকম—হত্যা করা হয়েছে গলা টিপে! তিন বারেই খুনের আগের দিনে একজন করে লোক গুম হয়। এখানেও একত্রে পাওয়া গেল তিনটে লাস! জয়ন্তবাবু, আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে, যুক্তি খেই হারিয়ে ফেলছে! এ কী রহস্য!'

মাণিক বললে, 'জয়ন্ত আমি তোমাকে জানি—তুমি অস্বাভাবিক বা অলৌকিক কিছু মানতে চাও না। কিন্তু এখানে যেন কোন অপার্থিব রহস্য আছে বলে মনে হচ্ছে। অন্তত সেইটুকু অস্বাভাবিকতাকে মেনে নিলে সমস্ত ব্যাপারটাই যেন স্বাভাবিক হয়ে আসে।'

জয়ন্তও ঠিক সেইরকম কিছু ভাবছিল কিনা প্রকাশ করলে না, কেবল বললে, 'তোমার কি মনে হয় মাণিক?'

মাণিক বললে, 'শশাঙ্ক যে তান্ত্রিক, কুমুদবাবুও তা জানেন বোধহয়?'

—'আপনি কি বলতে চান তা জানি না মাণিকবাবু। তবে আমি কানাঘুষোয় শুনেছি, শশাঙ্ক নাকি প্রায়ই গভীর রাতে একলা শ্মশানে এসে পূজোটুজো করত। কিন্তু এ-সব শোনা কথা নিয়ে আমি কোন-দিন মাথা ঘামাই নি।'

মাণিক বললে, 'মন্ত্রগুণে মড়া যে জ্যান্ত হয়, শশাঙ্কবাবু পরশু রাতে আমাদের কাছে সেই প্রসঙ্গ তুলেছিলেন। আমার বিশ্বাস, তিনি নিজেও ছিলেন শব-সাধক।'

জয়ন্ত অধীর স্বরে বললে, 'বেশ তো, তার সঙ্গে এ-সব ব্যাপারের সম্পর্ক কি?'

—'তন্ত্রোক্ত শব-সাধকদের কথা নিশ্চয়ই তুমি পড়ে দেখেছ। বিশ্বাস কর আর না কর, কিন্তু নানা তন্ত্রে স্পষ্ট লেখা আছে শব-সাধকরা অপঘাতে মরা শবকে বাঁচাতে পারে, আর নানারকম অলৌকিক উপায়ে ঘটনাস্থলে হাজির না হয়েও—অর্থাৎ দূরে বসে শত্রু বধ করতে পারে।'

—'বেশ। তারপর?'

—'ধর আমিই যেন শশাঙ্ক। আমি জনকয় শত্রু নিপাত করতে চাই। এক-একবারে এক-একজনকে নিয়ে পড়লুম। আগে এমন এক-একজন গরীব বা ভবঘুরে লোক বেছে নিলুম, যাঁরা অদৃশ্য হলেও খুব বেশি গোলমাল হবে না। প্রথম বারে নির্বাচন করলুম এক গরীব চাঁড়ালকে। যারা শবসাধক তাদের কাছে মড়া খুব প্রিয়। চাঁড়ালকে ভুলিয়ে গোপন স্থানে নিয়ে গিয়ে হত্যা করলুম। নতুনপুরের শ্মশান অতি নির্জন। শবকে রাত্রে এখানে এনে মন্ত্রপ্রভাবে করলুম জীবন্ত। তারপর তাকে পাঠিয়ে দিলুম শত্রুসংহার করবার জন্যে। ঘটনার সময়ে যদি কেউ তাকে দেখে ফেলে, তাহলেও আমার ভয় নেই—আমি আছি শ্মশানে বসে। শব ফিরে এলে পর মন্ত্রপ্রভাবেই তার জীবনহরণ করলুম। তারপর শ্মশানের মধ্যেই একটা বিশেষ জায়গা বেছে নিয়ে শবকে পুঁতে ফেললুম। এইভাবে বারেবারে আমি দিলুম তিন শত্রুকে যমের বাড়িতে পাঠিয়ে, অবশ্য সঙ্গে-সঙ্গে আমার হাতে প্রাণ গেল আরো তিন বেচারী গরীবের!'

—'মাণিক, তুমি কি আমাকে এই-সব বিশ্বাস করতে বল?'

—'জানি তুমি বিশ্বাস করবে না। তবু তুমি বা আমি যা কুসংস্কার

বলে মনে করি, সেইদিক দিয়েই এই রহস্যটার একটা অস্বাভাবিক—কিন্তু সঙ্গত কারণ খোঁজবার চেষ্টা করছি। দেখ কুমুদবাবু বলছেন একজন চাঁড়ালকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তারপর দেখ, সন্ন্যাসীর যে-লাস পাওয়া গেছে, তাকে রক্তচন্দন মাখিয়ে, জবার মালা পরিয়ে পূজো করা হয়েছিল তা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। কে না জানে, শব-সাধকরা এমনিভাবে মড়া পূজো করে? অন্য দুটো মড়াকেও ঐ-ভাবে পূজো করা হয়েছিল নিশ্চয়, কিন্তু তাদের পচা মাংসের সঙ্গে পূজোর চিহ্নগুলোও নষ্ট হয়ে গেছে। তারপর দেখ, শশাঙ্ক তান্ত্রিক, তার ঘরে সাজানো মড়ার মাথা; আর মড়া যে মন্ত্রে জ্যান্ত হয়—এই নিয়ে আমাদের সঙ্গে তর্কও করেছে। রাত্রে শ্মশানে গিয়ে তার যে পূজো করার অভ্যাস আছে, তাও শোনা যাচ্ছে। জয়ন্ত, এ-সবের কী অর্থ তুমি করতে চাও?'

জয়ন্ত কিছু না বলে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে বিরক্তভাবে।

কুমুদ বললে, 'দেখুন, ঝাড়-ফুঁক, মারণ-উচাটন, শবসাধন, প্রেততত্ত্ব—আইন এ-সব মানে না। সুতরাং আইনের দিক দিয়ে এ-সব প্রমাণ বলেই গণ্য নয়। কিন্তু অলৌকিক হলেও আপনি যা বললেন, তার মধ্যে যুক্তি পাওয়া যায়। নইলে অদ্ভুত এই তিন ব্যক্তির একই-ভাবে মৃত্যু, অদ্ভুত এই তিন ব্যক্তির ঘটনার আগের দিনেই অদৃশ্য হওয়া, আর অদ্ভুত এই তিন মৃতদেহের একই স্থানে আবিষ্কার—এ-সবের মধ্যে কোন যুক্তিসঙ্গত সম্পর্ক পাওয়া যায় না।'

জয়ন্ত হঠাৎ উচ্চস্বরে হাস্য করে বলে উঠল, 'ও-সব আজগুবি যুক্তির কোন ধার আমি ধারি না। কেন যে এখানে তিন-তিনটে দেহ বা কঙ্কাল পাওয়া গেল, তা নিয়ে আমার বেশি মাথাব্যাথা নেই। তবে হ্যাঁ, সত্যিকার গোয়েন্দা-রূপে আমি হত মৃগাঙ্ক আর তার হত্যাকারীকে কেমন করে আবিষ্কার করেছি, তার আইন-সম্মত ইতিহাসের উল্লেখ করতে পারি, শুনুন।'

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কার্য ও কারণের ইতিহাস

জয়ন্ত বলতে লাগল :

'কুমুদবাবু! মাণিক! ডিটেকটিভের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, সকলকেই সন্দেহ করা। ডিটেকটিভের উচিত, বিনা প্রমাণে বিনা বিচারে কিছুই সত্য বলে গ্রহণ না করা।'

শশাঙ্ক খুনীকে ধরবার জন্যে খুব-বেশি জিদ দেখিয়েছিল বটে, কিন্তু তবু গোড়া থেকেই আমি তার উপরে সন্দেহ করেছিলুম। মুখে জিদ দেখিয়ে তলে-তলে সে আমাদের বিপথে চালনা করতে চেয়েছিল।

অকারণে কেউ কাউকে খুন করে না। প্রত্যেক খুনের মধ্যেই একটা উদ্দেশ্য থাকে। শশাঙ্ক আমাদের সন্দেহকে সন্ন্যাসীর দিকে চালনা করবার চেষ্টায় ছিল বটে, কিন্তু সে-চেষ্টা আমার কাছে সফল হয় নি। সত্য, মৃগাঙ্কের ওপরে সন্ন্যাসীর রাগ ছিল। মার খেলে কার না রাগ হয়? কিন্তু কোথাকার এক ভবঘুরে, সহায়-সম্পদহীন সন্ন্যাসী, মার খেয়েও সে যে মৃগাঙ্কের মত প্রতাপশালী এক জমিদারের বাড়িতে রাত্রে একা ঢুকে তাকে হত্যা করতে সাহস করবে, এ-কথা সহজে বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। তার উপরে সে বিদেশী, শশাঙ্কদের বাড়ির পথঘাট জানবে কেমন করে? তাই প্রথমে আমি সন্ন্যাসীকে সন্দেহ করি নি, তবে পরে করেছিলুম—আর তার কারণও পরে বলব।

যখন শুনলুম মৃগাঙ্কের মৃত্যুর পরে তার বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে শশাঙ্ক, তখন তাকেই আমি সন্দেহ না করে পারি নি।

প্রত্যেক হত্যাকারীই নিজেকে অতিরিক্ত চালাক বলে মনে করে। কেউ-কেউ ভাবে, পুলিশকে সাহায্য করলে তাদের আর কেউ সন্দেহ করতে পারবে না। কেননা তারা জানে, তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণই নেই।

ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বেশ বুঝতে পারলুম, হাতে-নাতে যেইই খুন করে থাকুক, বাড়ির কোন লোকই ভেতর থেকে দরজা খুলে দিয়ে হত্যাকারীকে পথ দেখিয়ে এনেছে, আর ঘটনার পর দরজা বন্ধ করে সকলের চোখে ধূলো দেবার চেষ্টা করেছে। সন্ন্যাসী যদি রাগের মাথায় মৃগাঙ্ককে একলা খুন করে সরে পড়ত, তা হলে বাড়ির দরজা খোলাই থাকত। পুলিশের চোখে এ-রহস্যটা ধরা পড়ে নি বটে, কিন্তু পদচিহ্ন দেখে তারাও বুঝতে পেরেছিল, বাড়ির ভেতরে এমন কোন লোক আছে, যে খুনীর বন্ধুও হতে পারে—অন্তত খুনের ও খুনীর কথা জানে।

শশাঙ্কের ঘরে ঢুকে আর-একটা সন্দেহজনক প্রমাণ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সেটা হচ্ছে একটা কাদামাখা জামা—অর্থাৎ কোট। শশাঙ্ক বললে বটে, ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করবার সময়ে কাদায় আছাড় খেয়ে তার জামার ওপর কাদা লেগেছে, কিন্তু তার ও-ওজরে আমি ভুলি নি। সাধারণত কাদায় আছাড় খেলে মানুষের জামা-কাপড়ের একদিকটাই হয় বেশি কর্দমাক্ত। কিন্তু এই কোটটার চারিদিকেই ছিল কাদা। বিশেষ করে হাত দুটো ছিল পুরু কাদায় যেন বারংবার চোবানো, তার ওপরে আবার ঘাসের কুচিও লেগে ছিল। দেখলেই মনে হয়, এ-জামার মালিক যেন বৃষ্টির দিনে মাঠে-ময়দানে ভিজে, জমি খুঁড়ে গর্তে হাত ঢুকিয়ে মাটি তুলেছে। তখন ও-ব্যাপারটার কারণ খুঁজে পাই নি বটে, কিন্তু মনে একটা খটকা লেগে রইল।

ইতিমধ্যে আরো দু-একটা ছোট ঘটনা আমার লক্ষ্যকে একটু বিক্ষিপ্ত করে দিলে। যে-রাত্রে শশাঙ্কের বাড়ি পরিদর্শন করি, লুকিয়ে কে আমার পিছু নেয়। তারপর আমার ঘরে আড়ি পাততে গিয়ে

সুরেন ধরা পড়ে। এই দুটি কারণে শশাঙ্কের ওপর থেকে আমার সন্দেহের মূল খানিকটা আলগা হয়ে গেল। ভাবলুম, শশাঙ্ক নয় তার বাড়ির অন্য কোন লোক বা কর্মচারীই হয়তো খুনের ব্যাপারে জড়িত আছে, খুনীকে সাহায্য করেছে।

কিন্তু সুরেনকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে মনে হল, লোকটা বোকা আর ভীরু—এমন একটা ভয়াবহ অপরাধের পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য। নিশ্চয়ই সে অন্য মস্তিষ্কের দ্বারা চালিত হচ্ছে। কিন্তু কার মস্তিষ্ক?—তার ওপরে প্রভুত্ব আছে এমন কেউ। এখানে তার প্রভু হচ্ছে শশাঙ্ক, মনিবের কথা সে শুনতে বাধ্য। কিছুক্ষণ পরেই আমার সে-সন্দেহ পাকা হল, যথাস্থানে তা বলছি।

তারপর আর এক কাণ্ড। কুমুদবাবু যাকে খুনীর শত্রু বা মিত্র বলে সন্দেহ করেছিলেন, সেই দ্বিতীয় ব্যক্তির পায়ের ছাপের ছাঁচ শশাঙ্কের হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেল। এ-রকম দৈব-দুর্ঘটনা অসম্ভব নয়, বরং প্রায়ই এটা ঘটে থাকে। কিন্তু সে-সময়ে আমি ছাড়া আর কেউ একটা বিষয় লক্ষ্য করেন নি। আমাদের হাত ফস্কে হঠাৎ কোন জিনিস পড়ে যাবার পরই আমরা 'ঐ যাঃ' বলে চেঁচিয়ে উঠি,—কিন্তু মনে রাখবেন, পড়ে যাবার আগে নয়,—পরে!

আমি বেশ ভালো করেই লক্ষ্য করলুম, শশাঙ্ক আগে চেঁচিয়ে উঠল, 'ঐ যাঃ' বলে,—ছাঁচ-জোড়া হাত থেকে ছেড়ে দিলে তার পর-মুহূর্তেই!

এথেকে কি বোঝায়? সে ইচ্ছা করেই ছাঁচ-জোড়া ফেলে দিলে,—'ঐ যাঃ' বলে চ্যাঁচালে কেবল আমাদের ঠকাবার জন্যেই। কেমন, তাই নয় কি?

খুব তুচ্ছ, ছোট ঘটনা। কিন্তু সময়ে সময়ে নগণ্য ঘটনাও যে কত-বড় হয়ে উঠতে পারে, এটা তারই মস্ত প্রমাণ। এই একটি ছোট ঘটনাই আমার মনে সব রহস্য পরিষ্কার করে দিলে!

দ্বিতীয় ব্যক্তির পায়ের ছাঁচ শশাঙ্ক স্বেচ্ছায় ফেলে দিলে কেন? ও

ছাঁচ নষ্ট করে তার কি লাভ ?

তা হলে শশাঙ্কই কি দ্বিতীয় ব্যক্তি ? ঘটনার পর সেইই কি খুনীর পেছনে শ্মশানে গিয়ে ফিরে এসেছিল একাকী ? তাই কি সে তার বিরুদ্ধে সব-চেয়ে বড় চাক্ষুষ প্রমাণ নষ্ট করতে চায় ?

কিন্তু শশাঙ্ক জানত না, ছাঁচ তোলবার আগে পুলিশ পায়ের ছাপের ফোটো তোলে ও সঠিক মাপ নেয়। অপরাধীকে গ্রেপ্তার করবার পক্ষে সেইটুকুই যথেষ্ট।

এই ঘটনাতেই ধাঁ করে আমার মনে পড়ে গেল, শশাঙ্কের কাদা মাখা জামার কথা ! শ্মশানে ফিরে যাবার পর সন্ন্যাসীর সমস্ত চিহ্ন লুপ্ত হয়ে গেছে ! সন্ন্যাসীর লাসটাকেই লুকিয়ে রাখবার জন্যে শশাঙ্ক কি স্বহস্তে শ্মশানের মাটি খুঁড়েছিল ?···

তার খানিক পরেই সুরেন পড়ল পুলিশের কবলে। আমি তার চরিত্র-বিচার করতে ভুল করি নি। পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে তাকে স্পষ্টাস্পষ্টি বললুম, 'সুরেন, আমি জানি যে, তোমার মনিব শশাঙ্কের হুকুমেই তুমি আমার পিছু নাও, আমার ঘরে আড়ি পাতো। এ কথা যদি স্বীকার কর, তা হলে এখনি ছাড়ান পাবে ; নইলে খুনের দায়ে তোমার হয় ফাঁসি, নয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হবে।'

সুরেন ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে তখনি আমার পায়ে ধরে সব কথা স্বীকার করলে।

তারপর কুমুদবাবুর মুখে শুনলুম এক বিচিত্র কথা ! দেড় মাসের মধ্যে একই থানার এলাকায় একই ভাবে তিন ব্যক্তির হত্যা ও প্রত্যেকবারেই ঘটনার আগের দিনে এক-এক ব্যক্তির অন্তর্ধান !

এর কোন মানে হয় না। মাণিকের আজগুবি ব্যাখ্যার পরেও এর মানে হয়েছে বলে মনে করি না। তবে একটা সন্দেহ হয় যে, এই তিন হত্যাকাণ্ডের মধ্যে কাজ করেছে একই মস্তিষ্ক।

শ্যামাকান্ত বক্সী আর মাড়োয়ারি—অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় হত ব্যক্তির খাতাপত্র পরীক্ষা করে আমি আবিষ্কার করলুম, ওদের কাছ

থেকে শশাঙ্ক 'হ্যাণ্ড-নোটে' ধার নিয়েছিল যথাক্রমে দশ হাজার আর আট হাজার টাকা এবং খুনের পর 'হ্যাণ্ড-নোট' দু'খানা আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

এইটুকু প্রমাণের ওপরেই নির্ভর করে বলা যায় না যে, শশাঙ্কই তাদের হত্যা করেছে বা করিয়েছে। তবে এ-প্রমাণ পেয়ে আমার লাভ হল। আমি বুঝতে পারলুম, জমিদার হলেও শশাঙ্ক ভোগ করছে অত্যন্ত অর্থকষ্ট।

কুমুদবাবুর কাছ থেকে পদচিহ্নের সমস্ত ইতিহাস সংগ্রহ করে আমি এই ভাবে শেষটা আমার মামলা খাড়া করলুম :

যে-কারণেই হোক শশাঙ্কের বড়ই টাকার টানাটানি। টাকার জন্যে সে সব পাপ করতেই প্রস্তুত।

সে ভেবে দেখলে, মৃগাঙ্কের মৃত্যু হলে তার আর টাকার ভাবনা থাকে না। কিন্তু কেমন করে মৃগাঙ্কের মৃত্যু হবে? স্বহস্তে ভ্রাতৃ-হত্যা করতে পারবে না সে—বিশেষ, কেউ যদি দেখে ফেলে, বা হঠাৎ সে ধরা পড়ে যায়? অতএব মৃগাঙ্ককে মারতে হবে অন্যের হাতে এমন ভাবে, যাতে কেউ শশাঙ্কের ওপরে সন্দেহ করতে না পারে।

দৈব-গতিকে সুযোগ মিলল। নতুনপুরের শ্মশানে এল এক বিদেশী সন্ন্যাসী এবং মৃগাঙ্কের হাত থেকে সে খেলে মার। সন্ন্যাসী অভিশাপ দিলে, তা চারিদিকে রটতে বিলম্ব হল না।

শশাঙ্ক লুকিয়ে গেল সন্ন্যাসীর কাছে। অনেক টাকার লোভ দেখিয়ে গরীব ও ক্রুদ্ধ সন্ন্যাসীকে রাজি করালে মৃগাঙ্ককে হত্যা করতে। তারই পরামর্শে সন্ন্যাসী শ্মশান থেকে অদৃশ্য হল।

দুর্যোগের রাত্রে সন্ন্যাসী আবার শ্মশানে ফিরে এল। বৃষ্টি থামবার পর সে ঘটনাস্থলের দিকে যাত্রা করলে। শশাঙ্ক অপেক্ষা করছিল—তাকে খিড়কির দরজা ও বাড়ির দরজা খুলে দিলে নিজের হাতে।

খুনের পর শশাঙ্ক তাকে আবার নির্জনে শ্মশানে ফিরে যেতে বললে

—খুব সম্ভব এও জানালে যে, বখশিসের টাকা সে নিজে শ্মশানে গিয়ে একটু পরেই তার হাতে দিয়ে আসবে।

খানিক পরে শ্মশানে শশাঙ্কের প্রবেশ ও তার হস্তে সন্ন্যাসীর মৃত্যু। মাটি খুঁড়ে সন্ন্যাসীকে কবর দিয়ে শাবল ও কোদাল ঝোপে লুকিয়ে শশাঙ্কের প্রস্থান।

কিন্তু অপরাধীরা কেউ জানলে না, তাদের নৈশ ভ্রমণ-কাহিনী লেখা রইল কর্দমাক্ত পৃথিবীর বুকে, পদচিহ্নের রেখায় রেখায়।

শশাঙ্ক নিশ্চয় সন্দেহ করেছিল, আমি তার অনেক কীর্তি জেনে ফেলেছি। সেইজন্যেই আমাদের মত বিপদজনক অতিথির মুখ বন্ধ করতে এসেছিল দুই কেউটে সাপ। আমাদের মৃত্যুর পর পুলিশ ভাবত, দৈব-দুর্ঘটনা। পল্লীগ্রামে বর্ষাকালে এমন ঘটনা নিত্যই ঘটে।

সাপ-দুটোকে আমাদের ঘরে রেখে গিয়েছিল কে, সেটা আবিষ্কার করবার ভার রইল পুলিশেরই ওপরে। সে সুরেনও হতে পারে, অন্য কেহও হতে পারে।

আমি এসেছি মৃগাঙ্কের হত্যাকারীকে ধরতে। অন্য দুটো লাশের কথা নিয়ে আপাতত আমার মাথাকে ভারাক্রান্ত করব না। অতএব এইখানেই আমার কথা ফুরুলো।

কুমুদ খানিকক্ষণ চমৎকৃত হয়ে রইল। তারপর অভিভূত কণ্ঠে বললে, আজ বুঝলুম, কেন আপনার এত নাম। আমার হাতের কাছে সব প্রমাণ রয়েছে, তবু আমি ঠিক সূত্র ধরতে পারি নি! কিন্তু আপনি অনায়াসেই জুলিয়াস সিজারের ভাষায় বলতে পারেন—'আমি জয় করলুম! ধন্য।'

জয়ন্ত বললে, 'না কুমুদবাবু, নিজেকে অতটা তুচ্ছ মনে করবেন না। আপনি এ-মামলাটার জন্যে যে তোড়জোড় করছেন, বাঙলা-পুলিশের ইতিহাসে তা দুর্লভ। সত্যিকথা বলতে কি, আপনার রচিত পদচিহ্নের অপূর্ব ইতিহাসই আমার সাফল্যের প্রধান কারণ।'

কুমুদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'সন্ন্যাসীর তো কিনারা হল। কিন্তু আপনি আমার ঘাড়ে দু-দুটো বেওয়ারিস মড়া চাপিয়ে গেলেন। আদালতে মাণিকবাবুর যুক্তি শুনলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচতুম! কিন্তু সেখানে ও-সব কথা তুললে আমাকে জোর করে পাঠিয়ে দেবে পাগলা-গারদে।'

মাণিক আহত স্বরে বললে, 'আমার যুক্তি কি এতই বাজে?'

জয়ন্ত বললে, 'না মাণিক, প্রেততত্ত্ববিদদের কাছে তোমার যুক্তি বাজে নয়। কিন্তু তুমি জানো, আমরা প্রেততত্ত্ববিদ্ নই।...এখন চল, শশাঙ্কের খোঁজে যাই। দেখি, সে অপরাধ স্বীকার করে কিনা।'

কিন্তু তাদের আর শশাঙ্কের খোঁজে যেতে হল না, দু'জন পাহারাওয়ালা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে সেইখানেই জানিয়ে দিলে শশাঙ্কের শেষ-সংবাদ।

তারা যা বললে তার মর্ম হচ্ছে এই:

শশাঙ্ক প্রাণপণে দৌড়ে বাড়িতে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে গলায় দড়ি দিয়ে কলা দেখিয়েছে ফাঁসিকাঠকে।

সুতরাং জয়ন্ত বা মাণিক কার অনুমান সত্য, সে-কথা বোঝবার আর কোন উপায়ই রইল না। কেবল জানা গেল, আসল অপরাধী হচ্ছে শশাঙ্কই।

ছুটির ঘণ্টা

চোরের নালিশ

এক যে ছিল চোর তার নাম আমি জানি না। একদিন সে পা টিপে টিপে গেল সওদাগরের বাড়িতে চুরি করতে।

সেই সওদাগরটা ভারি ফিচেল ছিল, বাড়িতে চোর আসা সে মোটেই পছন্দ করত না। তাই বাড়ির সদর দরজা সবসময়েই সে বন্ধ ক'রে রাখত। কাজেই চোর তখন পাঁচিলের ওপরে উঠে, একটা জানলার ভেতর দিয়ে, গরাদ ভেঙে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে গেল।

কিন্তু জানলাটা তেমন শক্ত ছিল না। তাই চোর যেই জানলাটা ধরলে অমনি সেটা হুড়মুড় করে ভেঙে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চোরও সেই উঁচু থেকে বোঁটা ছেঁড়া কাঁটালের মতন একেবারে মাটির ওপরে দড়াম ক'রে এক আছাড় খেয়ে পড়ল।

আছাড় খেয়ে চোরের ঠ্যাং গেল খোঁড়া হয়ে। সে তখন ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে রাজা হবুচন্দ্রের কাছে গিয়ে নালিশ করলে, "মহারাজ, অবধান করুন। আমি সওদাগরের বাড়িতে চুরি করতে গিয়েছিলুম। কিন্তু তার বাড়ির জানলাটায় হাত দিতে না-দিতেই সেটা ভেঙে গেল। কাজেই পড়ে গিয়ে পা ভেঙে ফেলেচি। এখন আপনি এর যা হয় একটা বিহিত করুন।"

শুনেই রাজা হবুচন্দ্র খাপ্পা হয়ে সেপাইকে ডেকে বললেন, "সওদাগরের কান ধরে এখানে টেনে আন তো!" সেপাই সওদা-গরের কান ধরে হিড়হিড় করে টেনে আনলে। রাজা বললেন, "হ্যাঁ হে সওদাগর, এ কি শুনচি? এই চোর তোমার বাড়িতে চুরি করতে গিয়েছিল, কিন্তু তোমার জানলা ভেঙে যাওয়াতে বেচারী পড়ে গিয়ে পা খোঁড়া ক'রে ফেলেচে। জানলায় তুমি পেরেক মেরে রাখ

না কেন?”

সওদাগর জোড়হাতে বললে, “মহারাজ অবধান করুন। এ তো আমার দোষ নয়, যে জানলা তৈরি করেচে, এ সেই ছুতোরের দোষ!”

রাজা বললেন, “সেপাই, ছুতোরকে টিকি ধরে টেনে আন তো।

সেপাই ছুতোরকে টিকি ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল।

রাজা বললেন, "ওরে ছুতোর, জানলা তুই আলগা করে বসিয়েছিস কেন? ছ্যাখ দেখি তোর জন্যে চোর বেচারীর ঠ্যাং খোঁড়া হয়ে গেছে।"

ছুতোর জোড়হাতে বললে, "মহারাজ, অবধান করুন। এ তো আমার দোষ নয়, যে রাজমিস্ত্রী জানলা বসিয়েছে এ তারই দোষ।"

রাজা বললেন, "সেপাই, দাড়ি ধ'রে রাজমিস্ত্রীকে এখানে টেনে আন তো!"

দাড়িতে হ্যাঁচকা-টান পড়তেই রাজমিস্ত্রী এসে হাজির। রাজা বললেন, "মিস্ত্রী, ভালো ক'রে তুমি জানলা বসাওনি কেন?"

মিস্ত্রী জোড়হাতে বললে, "মহারাজ অবধান করুন। রাস্তা দিয়ে একটি সুন্দরী মেয়ে যাচ্ছিল, তার পরনে কি চমৎকার রঙিন কাপড়! তাই দেখে আমি অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলুম, কি করতে কি ক'রে ফেলেচি, আমার মনে নেই।"

তখনি সেই সুন্দরী মেয়েকে এনে রাজসভায় হাজির করা হলো। রাজা বললেন, "সুন্দরী মেয়ে, কেন তুমি সেদিন রঙিন কাপড় পরেছিলে?"

সুন্দরী মেয়ে জোড়হাতে বললে, "মহারাজ, অবধান করুন। এতে আমার দোষ নেই, যে কাপড় বুনেচে—যত নষ্টের গোড়া সেই বোকা তাঁতি।"

বোকা তাঁতিকে তখনি ধরে আনা হলো। কিন্তু রাজার কথায় সে কোনই জবাব দিতে পারলে না—শুধু ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল।

রাজা বললেন, "সুন্দরী মেয়ে ঠিক বলেচে—যত নষ্টের গোড়া এই বোকা তাঁতি! এ আমার কথায় তাই জবাব দিতে পারচে না! বেঁটে জল্লাদ, বোকা তাঁতির মাথা এখনি ঘ্যাঁচ করে কেটে ফেল।

বেঁটে জল্লাদ তখনি বোকা তাঁতিকে ধ'রে বাইরে নিয়ে গেল। বোকা তাঁতির মাথাটি সেদিন নিশ্চয় কাটা যেত, কিন্তু সে বেজায়

ঢ্যাঙা ছিল ব'লে বেঁটে জল্লাদের তরোয়াল তার মাথা পর্যন্ত উঠল না।

বেঁটে জল্লাদ তখন রাজার কাছে ফিরে গিয়ে বললে, "মহারাজ, অবধান করুন। বোকা তাঁতি বড় ঢ্যাঙা। আমি বেঁটে মানুষ, তার মাথার নাগাল পাচ্ছি না।"

রাজা হবুচন্দ্র তখন ফাঁপরে পড়ে, মন্ত্রী গবুচন্দ্রের পরামর্শ চাইলেন। গবুচন্দ্র কানের তুলো খুলে বুদ্ধি বার ক'রে, অনেক মাথা ঘামিয়ে বললেন, "মহারাজ, বোকা তাঁতি ঢ্যাঙা বলেই তো বেঁটে জল্লাদ তার মাথা কাটতে পারচে না? এতে আর ভাবনার কি আছে? একটা বেঁটে লোককে খুঁজে বার করলেই তো সব ল্যাঠা চুকে যায়!"

রাজা বললেন, "ঠিক কথা। কিন্তু এখন আমার ক্ষিদের চোটে পেট চুঁই চুঁই করচে, বেশী খোঁজাখুঁজির সময় নেই। একটা বেঁটে লোক হ'লেই চলবে তো? বেশ, ঐ বেঁটে জল্লাদকেই তবে কেটে ফেলা হোক।"

তখনি বেঁটে জল্লাদের কাঁধ থেকে মুণ্ডু গেল উড়ে। রাজার সুবিচারে খুশি হয়ে খোঁড়া চোর ঠ্যাঙের ব্যথা ভুলে বাড়ি গেল, আর সকলেও হাঁপ ছেড়ে বাঁচল—আর আমার কথাটিও ফুরুল।

বাঘের মাসীর গ্রহণযাত্রা

১

রঙটা ছিল তার একেবারে কালো কুচকুচে—কোথায় লাগে অমাবস্যার ঘুরঘুট্টে অন্ধকার! সেই কালো রঙের ভিতর থেকে, তার দু-দুটো গোল গোল চোখকে, দেখাত ঠিক যেন জ্বলন্ত কয়লার দুটো টল-গুলির মত।

তাকে কেউ ডাকেওনি, আনেওনি, কে জানে কোথা থেকে হঠাৎ

সে একদিন উড়ে এসে জুড়ে বসল। তার শয়তানের মত বিদঘুটে চেহারা দেখে, নেপাল সেইদিনই তাকে লাথি মেরে দূর ক'রে খেদিয়ে দিচ্ছিল, কিন্তু নেপালের মা বললেন, "আহা, থাক, থাক! কেষ্টোর জীব এসেচে, ওকে তাড়াসনে নেপু!"

বিড়ালটা সেইদিন থেকেই নেপালদের বাড়িতে জাঁকিয়ে আস্তানা গেড়ে বসেছিল। সবাই তার নাম দিলে কেলেমুখী।

২

শুধু চেহারা নয়, কেলেমুখীর স্বভাবেও যে কতখানি শয়তানী ছিল, ক্রমেই তা ফুটে বেরুতে লাগল।

রোজ সে নিয়ম ক'রে হাঁড়ি খেত। এত বড় তার বুকের পাটা ছিল যে, খেতে বসে নেপালচন্দ্র একটু অন্যমনস্ক হয়েছে কি, অমনি সে ফস ক'রে থুলো মেরে পাত থেকে একখানা মাছ নিয়ে, ল্যাজ তুলে দে চম্পট! খোকার হাত থেকে থাবা মেরে খাবার কেড়ে নেওয়া, খুকীর দুধ চেটেপুটে খেয়ে যাওয়া, এসব ব্যাপার তো প্রায় হামেশাই ঘটত।

শেষটা কেলেমুখীকে দেখলেই নেপাল রেগে পাগলের মত হয়ে উঠত। কেলেমুখীকে মারতে গিয়ে নেপাল যে পা হড়কে দুমদাম কত আছাড় খেয়েছে, বাপের কত ভালো ভালো লাঠি ভেঙেছে, তা আর গুণে বলা যায় না। কেলেমুখী কিন্তু এমনি সেয়ানা ছিল যে, কিছুতেই সে নেপালকে ধরা-ছোঁয়া দিত না। উল্টে, লাঠি ভাঙার দরুণ নেপালকেই বাপের কাছে বকুনি আর চড়-চাপড়টা খেয়ে হজম করতে হত।

৩

নেপাল সেদিন বাজারে গিয়ে, নিজে দেখে-শুনে সখ করে একটা ইলিশমাছ কিনে এনেছে। ঝি মাছ কুটে, ধুয়ে, কোটা মাছগুলো একখানা গামলা চাপা দিয়ে রেখে গেল। কেলেমুখীও সে খোঁজ

পেলে। যখন কেউ কোথাও নেই, কেলেমুখী আস্তে আস্তে এসে, গামলাখানা নুলো মেরে উল্টে দিয়ে, একে একে মাছগুলো পেটের

ভিতরে পুরতে লাগল। বুঝেই দেখ, টাটকা ইলিশ মাছ। খেতে তার বড়ই আয়েস হচ্ছিল!

এমন সময় নেপাল এসে হাজির। কিন্তু মাছগুলো তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। অত সাধের মাছ কেলেমুখীর পেটে সেঁধুচ্ছে দেখে, প্রথমটা নেপাল চক্ষুস্থির ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

কেলেমুখী কিন্তু নেপালকে দেখেই, গতিক বড় সুবিধের নয় বুঝে লম্বা এক দৌড় মারলে। নেপালও তাকে ধরবার জন্যে পিছনে পিছনে ছুটল বটে, কিন্তু তাকে ধরতে পারবে কেন? কেলেমুখী দিব্যি জানলার রেলিং গ'লে পাশের বাড়ির ছাদে গিয়ে পড়ল। তারপর নেপালের মুখের দিকে তাকিয়ে—"মে-এ-এ-অ্যাঁও!" ব'লে ডেকে, বেশ ধীরে-সুস্থে বসে বসে নিশ্চিন্ত মনে হাত দিয়ে মুখ মুছতে লাগল।

নেপাল তো আর কেলেমুখীর মত জানলার রেলিং গ'লে বাইরে যেতে পারলে না, চটে লাল হয়ে ঘরের ভিতর থেকেই সে খাঁচায় বন্ধ বাঘের মত লম্ফঝম্ফ আর তর্জন গর্জন করতে লাগল। কেলেমুখী হচ্ছে পাজির পা-ঝাড়া, সে বেশ জানে মানুষরা তার মত ফুড়ুক ক'রে জানলা দিয়ে গলতে পারে না, কাজেই সে নেপালের তর্জন-গর্জনে একটুও কেয়ার করলে না। মাঝে মাঝে সে খালি ঝাঁটার মত গোঁফ ফুলিয়ে "মে-এ-এ-অ্যাঁও" ব'লে ডাক ছাড়ে, আর মাথা নেড়ে হাত দিয়ে মুখ মোছে।

নেপালের মনে হলো কেলেমুখী তাকে দাঁত খিঁচিয়ে ঠাট্টা ক'রে বলছে, "ওরে ছোঁড়া, মার না দেখি।" নেপালের রাগ তখন দস্তুরমত মাথায় চড়ে গেল, সে হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে, বাপের চটি-জুতোর এক পাটি ঘরের মেঝে থেকে তুলে নিয়ে, কেলেমুখীকে যত জোরে পারে ছুঁড়ে মারলে। জুতো কেলেমুখীকে পেরিয়ে, দু-দুটো বাড়ি ছাড়িয়ে কোথায় যে গিয়ে পড়ল তা বোঝা গেল না। কেলেমুখীর কিছুই হলো না, বরং সেদিন জুতো হারিয়ে বাপের হাতে নেপালেরই বেশ একচোট উত্তম-মধ্যম লাভ হলো। মার খেয়ে পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে নেপাল প্রতিজ্ঞা করলে, কেলেমুখীকে যমের বাড়ি না পাঠিয়ে সে আর জল খাবে না।

৪

সেইদিনই বিকালবেলায়, কেলেমুখী রান্নাঘরে উনুনের ছাইয়ের গাদায় কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পরম আরামে নিদ্রা দিচ্ছিল, এমন সময়ে পা টিপে টিপে এসে নেপাল ক্যাঁক করে তার টুঁটি টিপে ধরলে। কয়লার গাদায় চটের একটা মস্ত থলে ছিল, নেপাল তার মধ্যে আগে দুখানা ইঁট পুরে, তারপর কেলেমুখীকে ঢুকিয়ে খুব কষে থলের মুখ বেঁধে ফেললে। সে মনে মনে ঠিক করেছে, কেলেমুখীকে আজ থলে সুদ্ধ গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে এসে, তবে অন্য কাজ। পাছে থলে ভেসে ওঠে, তাই তার ভিতরে থান ইঁট দুখানা পুরে দিয়েছে।

মা এসে বাধা দিয়ে বললেন, "আহা কেষ্টোর জীব!"

নেপাল বললে, "হ্যাঁ, কেলেমুখী যাতে চটপট কেষ্ট পায়, সেই বন্দোবস্তই করা যাচ্ছে!" এই ব'লে সে থলে কাঁধে ক'রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

তার মনটা আজ ভারি খুশি। কেলেমুখী তাকে বড় জ্বালানোই জ্বালিয়েছে, আজ তার সব শেষ। কেলেমুখীর কালামুখ আর কেউ তার বাড়িতে দেখতে পাবে না।

গঙ্গার ধারে এসে, নেপাল আগে একটা জাহাজ বাঁধবার জেটির ওপরে গিয়ে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু থলেটা বারকতক ঘুরিয়ে যেই সে গঙ্গার ভিতরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে, অমনি টাল সামলাতে না পেরে নিজেও ঝুপ করে পড়বি তো পড়—একেবারে ডুব-জলের মধ্যে।

জলে পড়ে নেপাল যখন ভয়ানক নাকানি-চোবানি খাচ্ছে, তখন কি ভাগ্যি একজন খালাসী তাকে দেখতে পেলে, নইলে কেলেমুখীর সঙ্গে তাকেও সেদিন এক ডুবে পাতালে গিয়ে হাজির হতে হতো!

খালাসী যখন তাকে জল থেকে টেনে ডাঙায় এনে তুললে, নেপালচন্দ্রের অবস্থা তখন বড়ই কাহিল। তার জুতো ভেসে গেছে, জামা-কাপড় ছিঁড়ে গেছে, পেটটি জল খেয়ে মস্ত একটি ঢাক হয়ে উঠেছে।

নেপাল মনে মনে বললে, "কেলেমুখী মরবার সময়েও আমাকে জ্বালিয়ে গেল। জামা-কাপড় ছেঁড়া আর জুতো হারানোর জন্যে আজ আবার একচোট মার খেতে হবে দেখছি! যাক, কেলেমুখী আর তো আমাকে জ্বালাতে আসবে না, ঐটুকুই যা লাভ!"

৫

কিন্তু নেপাল যখন বাড়ি ফিরে এল, তখন সে যা দেখলে তাতে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারলে না। অ্যাঁঃ! ও কি,—কেলেমুখী? না, কেলেমুখীর ভূত?

সত্যিই তাই! রান্নাঘরের দরজার গোড়ায়, মাটির ওপরে থাবা পেতে জাঁকিয়ে ব'সে, ল্যাজ তুলে ঘাড় বেঁকিয়ে কেলেমুখী একমনে বামুন-ঠাকরোণের মাছ ভাজা দেখছিল। নেপালকে দেখেই সে "মে-এ-এ-অ্যাঁও" বলে ঠাট্টা ক'রে এক দৌড়ে পালিয়ে গেল।

নেপাল হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এমন সময়ে মা এসে আশ্চর্য হয়ে বললেন, "হ্যাঁ রে নেপু, অবেলায় নেয়ে এলি বড় যে?"

সে কথার কোন জবাব না দিয়ে নেপাল বললে, "হ্যাঁ মা কেলে-মুখী আবার কোত্থেকে ফিরে এল, আমি তো ওকে এইমাত্র গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসচি।"

মা হেসে বললেন, "থলের তলায় মস্ত একটা ছ্যাদা ছিল যে! তুই যেই থলেটা কাঁধে ফেললি, কেলেমুখী অমনি সেই ছ্যাদা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ল।"

নেপাল কাঁদো কাঁদো মুখে বললে, "মা, তুমি কেলেমুখী পালাচ্চে দেখেও সেকথা আমায় ব'লে দাওনি!"

মা বললেন, "আহা, কেষ্টোর জীব!"

হবু-গবুর মুল্লুকে

এক যে ছিল মেয়ে—নামটি তার খুদী। সে যে রাজার মেয়ে নয়, নাম শুনেই সেটা বোধহয় তোমরা ধরে ফেলেছো। রাজা তো দূরের কথা, সে ধনীর মেয়েও নয়। তার বাপ হচ্ছে সামান্য এক চাষা।

এখন, খুদী সেদিন খেলার সাথী না পেয়ে, ঘরের দাওয়ায় একলাটি পা ছড়িয়ে বসে, আকাশ-পাতাল নানান কথা ভাবছিল। কি ভাবছিল সেটাও তোমাদের বলছি, শোনো।

খুদী ভাবছিল, 'আমি যখন বড় হব, তখন নিশ্চয়ই রূপকথার এক পরমসুন্দর রাজপুত্তুরের সঙ্গে ধূমধাম ক'রে আমার বিয়ে হবে। আর বিয়ে হ'লেই আমার ক্ষীরের পুতুলের মত একটি সুন্দর ফুটফুটে খোকাও হবে তো! খোকনের নামটি রাখব মাণিক। যদি হঠাৎ কোন অসুখে মারা পড়ে,—যেমনি এই কথা মনে হওয়া, অমনি খুকুমণির নাকী সুরে কান্না শুরু! "ওমা, কি হবে গো—ওমা, কি হবে গো!"

খুদীর মা রান্নাঘরে উনুনের উপরে ভাতের হাঁড়ি চড়াতে যাচ্ছিল, মেয়ের কান্না শুনে তাড়াতাড়ি দাওয়ায় বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে, —"কি লা খুদী, সক্কালবেলায় কান্না ধরলি কেন?"

খুদী ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললে, "বিয়ের পরে যদি আমার খোকা হয়, আর সে যদি মারা যায়? তাই কাঁদচি!"

যেমনি এই কথা শোনা, অমনি খুদীর মাও মাথায় হাত দিয়ে ধপাস ক'রে বসে পড়ে, কান্না জুড়ে দিলে—"ওরে আমার খুকুর খোকা! ওরে আমার নাতি! ওরে আমার স্বর্গের বাতি! তুই যদি মারা যাস রে বাছা—" সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মায়ে-ঝিয়ে এমনি কান্নাটা কাঁদলে যে, রান্নাবান্না কিছু সেদিন আর হোলো না।

দুপুরবেলায় ক্ষেতে লাঙল ঠেলে, রোদ্দুরের তাতে ধুঁকতে ধুঁকতে তেষ্টায় টা টা করতে করতে, খুদীর বাপ বুদ্ধু বাড়ি ফিরে এল।

বাড়িতে ঢুকেই মড়া-কান্না শুনে তার পিলে চমকে গেল। তারপর এদিক-ওদিক দেখে সে বললে, "একি, তোরা কাঁদচিস ক্যান রে? আর আমার খাবারই বা কোথায়?"

খুদীর মা তখন সব কথা খুলে বললে। শুনেই বুদ্ধু রেগে তিনটে হয়ে বললে, "অ্যাঁঃ! আমার খেতের গরু দুটোর বুদ্ধিও যে তোদের চেয়ে বেশী। কোথায় বিয়ে,- কোথায় খোকা তার ঠিক নেই, এখুনি উদ্দেশেই কান্না! দুৎতোরি, নিকুচি করেচে—এমন নিরেট বোকার সঙ্গে ঘরকন্না করা আমার পোষাবে না।" এই না বলে রাগে গসগস করতে করতে চাষা বাড়ি থেকে সোজা বেরিয়ে গেল।

একটা, দুটো, তিনটে,—এমনি অনেকগুলো গ্রাম, মাঠ, নদী পার হয়ে, বুদ্ধু শেষটায় এক অচেনা দেশে এসে হাজির।

হঠাৎ দেখলে এক জায়গায় একটা ঝুপসী বটগাছের তলায় কিসের জটলা হচ্ছে। কাছে গিয়ে দেখে, প্রায় দুশো-তিনশো লোকে মিলে একখানা তক্তার দুদিক ধরে ক্রমাগত টানাটানি করছে আর গলদঘর্ম হয়ে হাপিয়ে মরছে।

বুদ্ধু বললে, "তোমাদের একি হচ্চে বাপু?"

তারা বললে, "এই তক্তা দিয়ে আমরা ঐ নদীর একটা সাঁকো তৈরি করতে চাই। কিন্তু কাঠখানা এত ছোট যে, নদীর ওপার পর্যন্ত পৌঁচচ্ছে না। তাই আমরা সবাই মিলে টেনে টেনে তক্তাখানাকে লম্বা করার চেষ্টায় আছি, কিন্তু কিছুতেই পারচি না।"

বুদ্ধু বললে, 'আচ্ছা, আমি যদি এখুনি তক্তাখানাকে লম্বা ক'রে দিতে পারি?'

সে দেশের যিনি রাজা, তাঁর নাম হবুচন্দ্র। তিনি তাঁর মন্ত্রী গবুচন্দ্রের দিকে ফিরে গোঁফে মোচড় দিতে দিতে বললেন, 'ওহে মন্ত্রী, লোকটা পাগল নাকি?'

মন্ত্রী তাঁর গণেশদাদার মত নাদা পেটে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'সেকথা আর দুবার বলতে মহারাজ। এ রাজ্যের গণ্ডা গণ্ডা ষণ্ডা লোক মিলে যা করতে পারলে না, ও কিনা একলা সেই কাজ হাসিল করতে চায়? লোকটা নিশ্চয়ই কোন চোরের স্যাঙাৎ।'

রাজা হবুচন্দ্র তখন বুদ্ধুর দিকে ফিরে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, 'আচ্ছা, তুমিও না হয় একবার চেষ্টা ক'রে দেখ! কাঠখানাকে লম্বা করতে পারলে, তোমাকে আমি বিশ মোহর বখশিস দেব, নইলে কান দুটি করাত দিয়ে কুচ ক'রে কেটে নেব।'

বুদ্ধু তখন করলে কি জানো? আর একখানা কাঠ নিয়ে এসে, সেই কাঠখানার সঙ্গে পেরেক মেরে শক্ত ক'রে লম্বালম্বি জুড়ে দিলে। কাজেই আকারটা দুগুণ হয়ে গেল ব'লে, তখন সেই কাঠ দিয়ে সাঁকো তৈরি করতে আর কোনই বেগ পেতে হোলো না। রাজা হবুচন্দ্রও খুশি হয়ে বুদ্ধুর কান আর কেটে নিলে না, উল্টে নগদ বিশ মোহর বখশিস দিলেন।

বুদ্ধু মোহরগুলো সাবধানে কাছায় বেঁধে রেখে আবার হাঁটতে শুরু করলে। খানিকক্ষণ পরে একটা গাঁয়ে এসে দেখলে, এক জায়গায় একটা নতুন বাড়ি তৈরি হয়েছে, কিন্তু তার উপরে-নীচে কোথাও একটাও জানলা নেই। সেই বাড়ির সামনের সবুজ মাঠের উপরে একদল লোক কেবলই জাল গুটুচ্ছে আর ফেলছে।

বুদ্ধু আশ্চর্য হয়ে বললে, 'ওহে মাঠের ওপরে জাল ফেলে তোমরা সবাই ব্যাঙ ধরচ না গঙ্গাফড়িং ধরচ?'

তারা বললে, 'ঐ নতুন বাড়ির ভেতরে আলো ঢোকে না। তাই আমরা জাল ফেলে সূর্যের আলো ধ'রে ঐ বাড়ির ভেতরে নিয়ে যাবার চেষ্টায় আছি, কিন্তু কিছুতেই পারচি না।'

বুদ্ধু বললে, 'আচ্ছা, আমি যদি ঐ বাড়ির ভেতরে আলো যাবার বন্দোবস্ত ক'রে দি, তাহলে তোমরা আমাকে কি দেবে?'

বাড়ির কর্তা বললেন, 'নগদ একশো টাকা।'

বুদ্ধু তখন ছুতোর মিস্ত্রী ডাকিয়ে, সেই বাড়ির চারিদিকে গোটা-কতক জানলা ফুটিয়ে দিলে, আর দেখতে দেখতে সমস্ত ঘরেই সোনার জলের মত চিকমিকে রোদের আলো এসে পড়ল।

বাড়ির কর্তার কাছ থেকে নগদ একশোটা টাকা নিয়ে ট্যাকে গুঁজে, বুদ্ধু আবার পথ চলতে লাগল।

খানিকদূর গিয়েই দেখলে, এক জায়গায় দুজন স্ত্রীলোক একটা রামছাগলের শিং আর ল্যাজ ধ'রে টানাটানি করছে, কিন্তু ছাগলটা কিছুতেই এক পাও এগুতে রাজি হচ্ছে না।

বুদ্ধু বললে, 'ওগো বাছারা, শ্রীরামছাগল কেন যে তোমাদের সঙ্গে যেতে চাইচে না, তার খবর কিছু রাখো?'

তারা বললে, 'না।'

বুদ্ধু বললে, 'ঐ রামছাগলের মামাতো ভাই শ্যামছাগলের আজ যে বিয়ে। আর সেই বিয়েতে ওর যে নীতবর হবার কথা।'

তারা বললে, 'ওমা, তাই নাকি।'
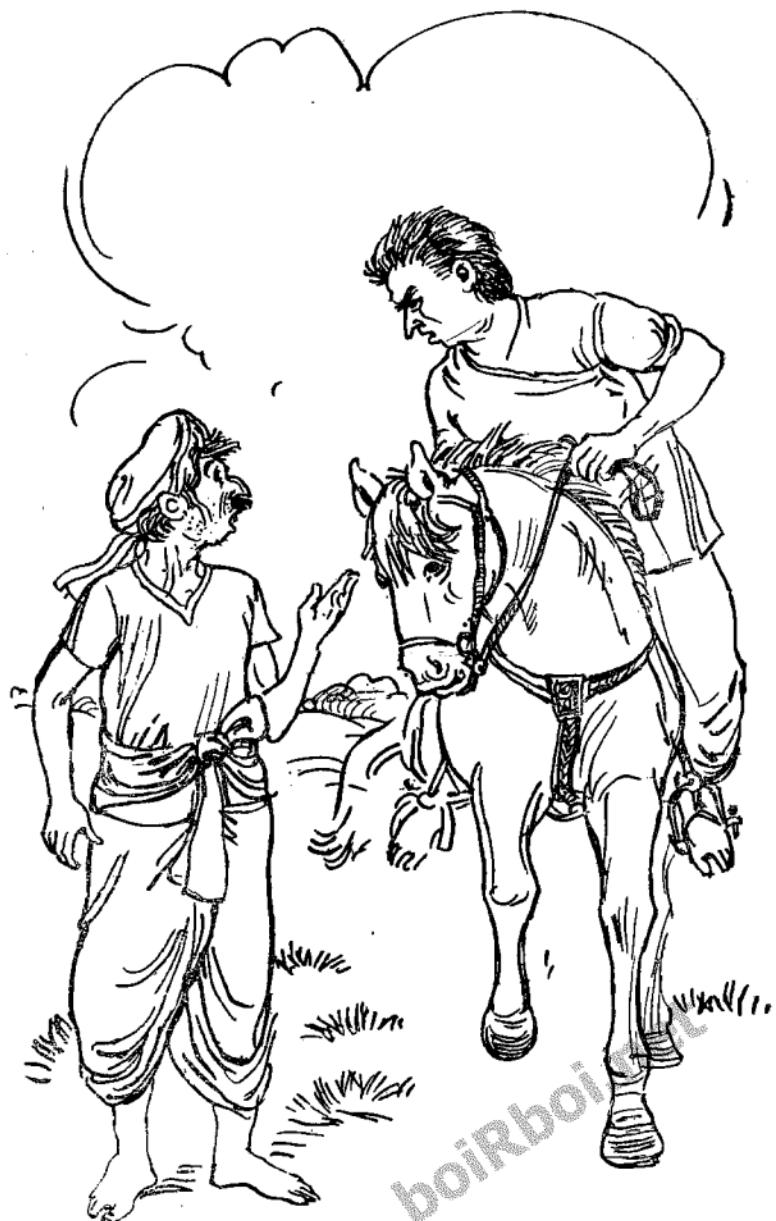
বুদ্ধু বললে, 'হ্যাঁ, সেইজন্যেই তো ওকে বিয়েবাড়িতে নিয়ে যাব ব'লে আমি এসেচি।'

শুনেই তারা রামছাগলকে বুদ্ধুর হাতে ছেড়ে দিলে। বিয়ে বাড়িতে নীতবর হয়ে যাচ্ছে– কিছু সাজগোছ চাই তো! কাজেই তাদের একজন নিজের গলা থেকে একছড়া সোনার হার খুলে নিয়ে রামছাগলের গলায় পরিয়ে দিলে।

বুদ্ধু ছাগল নিয়ে চলে গেল। তারপর একটু আড়ালে গিয়েই ছাগলের গলা থেকে হারছড়া খুলে নিয়ে, ছাগলটাকে দমাস ক'রে এক লাথি মেরে 'ভাগো হিঁয়াসে' ব'লে বিদায় করে দিলে।

এদিকে সেই স্ত্রীলোক দুটি বাড়িতে এসে সকলের কাছে শ্যাম-ছাগলের বিয়েতে রামছাগলের নীতবর হওয়ার গল্প করলে। শুনেই বাড়ির বুদ্ধিমান কর্তা লাফিয়ে উঠে বললেন, 'সর্বনাশ! নিশ্চয় একটা জোচ্চোর এসে তোমাদের হাদা মেয়েমানুষ পেয়ে ডাহা ঠকিয়ে গেছে।'

কর্তা তখনি একটা ঘোড়ায় চড়ে বুদ্ধুর খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন।

খানিকদূর গিয়েই দেখেন, একটা লোক মনের খুশিতে তুড়ি দিয়ে গলা

ছেড়ে টপ্পা গান গাইতে গাইতে পথ চলছে। সে বুদ্ধু।

কর্তা ঘোড়া থামিয়ে বললেন, 'ওহে ভাই, এ পথ দিয়ে রামছাগল নিয়ে একটা লোককে যেতে দেখেচ?'

বুদ্ধু তখনি ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে চটপট বললে, 'হুঁ, দেখেচি বৈকি! সে লোকটা এইমাত্র ঐ মাঠ পার হয়ে চলে গেচে। আপনি যদি তাকে ধরতে চান, তবে এইবেলা শিগ্‌গির দৌড়ে গিয়ে ধরুন।'

কর্তা বললেন, 'ঠিক বলেচ, না দৌড়লে তাকে ধরতে পারব না বটে। কিন্তু ঘোড়ায় চড়ে আমি নিজে দৌড়ব কেমন করে?'

বুদ্ধু বললে, 'বেশ তো, তার জন্যে আর ভাবনা কি! ঘোড়াটাকে ধ'রে আমিই না হয় এইখানে দাঁড়িয়ে আছি—আপনি শিগগির দৌড়ে যান।'

বুদ্ধুর হাতে ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে কর্তা উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে লাগলেন।

বুদ্ধুও অমনি একলাফে ঘোড়ায় চড়ে বাড়ির দিকে রওনা হ'ল।

বাড়ি ফিরে এসে বুদ্ধু হাসতে হাসতে তার বউকে বললে, 'বুঝেছিস বৌ, দুনিয়ায় তোদের চেয়েও বোকা লোক ঢের আছে। তাই আমি ফের বাড়ি ফিরে এলুম,—নইলে এতক্ষণে হয়ত ভস্ম মেখে সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয় পাহাড়ে চলে যেতুম।'

বাহাদুর হাবু

মনে মনে যে আঁক কষা হয়, তার নাম মানসাঙ্ক। এটা তোমরা নিশ্চয়ই জানো, কারণ তোমাদের সকলকেই মানসাঙ্ক কষতে হয় তো? তবে তোমরা যতই সেয়ানা হও না কেন, এদিকে আমাদের হাবুবাবুর মতন বাহাদুরী যে তোমাদের কেউ দেখাতে পারবে না, এ কথা আমি জাঁক ক'রে বলতে পারি।

সেদিন ইস্কুলের মাস্টারমশাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা হাবু,

ঝুড়ির ভেতরে যদি তিনটে আঁব থাকে—'

হাবু ভারি খুশি হয়ে চটপট বলে উঠল, 'কি আঁব স্যার, দিশী না ন্যাংড়া ?'

মাস্টার : আচ্ছা, না হয় ধরেই নাও ন্যাংড়া আঁব! এখন শোনো। তোমার মা যদি ঝুড়ির ভেতরে তিনটি ন্যাংড়া আঁব রেখে দেন, আর—

হাবু : বাঃ! তা কি ক'রে হবে স্যার? ন্যাংড়া আঁব তো এখনো ওঠেনি !

মাস্টার : আহা, মনে ক'রেই নাও না যে, আঁবগুলো ন্যাংড়া।

হাবু : (হতাশভাবে) তাহলে আঁবগুলো সত্যিই ন্যাংড়া না ?

মাস্টার : না।

হাবু : তবে কি আপনি দিশী আঁবের কথা বলছেন !

মাস্টার : না, না, আমি কোন আঁবের কথাই বলছি না। ধরে নাও, ঝুড়ির ভেতরে যেন তিনটে আঁব আছে।

হাবু : (আঁবের নামেই সে পকেট থেকে ছুরিখানা বার করেছিল, এখন সেখানা ফের মুড়ে পকেটের ভেতরে রাখলে) তাহলে আপনি সত্যিকার আঁবের কথাও বলছেন না ?

মাস্টার : না। ঝুড়ির ভেতরে যেন তিনটে আঁব আছে। এখন তোমার ছোট বোন যেন একটা আঁব খেয়ে চলে গেল—

হাবু : না স্যার, তিন-তিনটে আঁব থাকতে, মোটে একটা আঁব খেয়েই আমার বোন কখনো সেখান থেকে নড়বে না। সে আগে তিনটে আঁবই সাবাড় করবে, তবে যাবে। হুঁ, আমার বোনটির গুণের কথা তো আপনি জানেন না !

মাস্টার : আচ্ছা, মনে কর তুমিও সেখানে দাঁড়িয়েছিলে। তোমার ভয়ে সে একটার বেশী আঁব খেতে পারলে না।

হাবু : বাঃ, আমি সেখানে থাকলে আমার বোনকে একটা আঁবই বা খেতে দেব কেন ?

মাস্টার : আচ্ছা, মনে কর তোমার মা এসে যেন তাকে একটা আঁব খেতে দিলেন।

হাবু : তাই বা কি করে হবে? মা যে এখন মামার বাড়িতে গেছেন।

মাস্টার : (রেগে উঠে) হাবু, ওসব বাজে কথা রাখ! আমি এই শেষবার তোমায় জিজ্ঞাসা করছি, ঠিক উত্তর দাও। ঝুড়ির ভেতরে যেন তিনটে আঁব আছে। তোমার বোন একটা আঁব খেয়ে ফেললে। এখন বল ত দেখি, ঝুড়ির ভেতরে ক'টা আঁব রইল?

হাবু : একটাও না।

মাস্টার : একটাও না! কি রকম?

হাবু : আজ্ঞে, আমার বোন যদি সত্যিই একটা আঁব খেয়েই চ'লে যায়, তবে বাকি দুটো আঁব যে তখুনি আমিই খেয়ে ফেলব।

মাস্টার : (হাল ছেড়ে দিয়ে ক্লাসের অন্য ছাত্রদের ডেকে) তোমাদের ছুটি হলো, বাড়ি যাও। হাবু এখন পাঁচটা পর্যন্ত গাধার টুপি পরে একপায়ে বেঞ্চির ওপরে দাঁড়িয়ে থাকবে।

ছিদামের পাদুকা-পুরাণ

১

বেচারী ছিদাম! ভগবান তাকে রূপও দেননি, পয়সাও দেননি। জাতে ছিল সে কুমোর, সারাদিন বসে বসে হাঁড়ি-খুড়ি গড়াই ছিল তার ব্যবসা।

ছিদামের বউ থাকোমণির মুখ যদি একটু মিষ্টি হ'ত, তাহলেও ছিদাম বরং কতকটা খোশমেজাজে থাকতে পারত। কিন্তু ভগবান তার কপালে সে আরামটুকুও লেখেননি।

গায়ে গয়না পরতে পায় না ব'লে থাকোমণি উঠতে বসতে বরের সঙ্গে গায়ে পড়ে কোঁদল করে। যখন তখন গঞ্জনা দিয়ে বলে, 'যার এক পয়সা ট্যাঁকে নেই, তার আবার বিয়ে করার আস্বা কেন?'

ছিদামও বুঝত, তার মতন লোকের পক্ষে, বিয়ে করার আস্বাটা হচ্ছে কাঙালের ঘোড়া-রোগের মত। তাই সে ঘাড় হেঁট করে, বোবা-কালা ইস্কুলের ছেলের মতন একেবারে চুপ হয়ে বসে থাকত।

কিন্তু সেদিন তার ভালোমানুষিও থাকোমণির ধাতে আর সইল না। মুখ বেঁকিয়ে হাত নেড়ে সে বললে, 'ছাখ, তুমি এই লক্ষ্মীছাড়া ব্যবসাটা ছাড়বে কি না আমাকে আজ স্পষ্ট করে খুলে বল!'

ছিদাম আশ্চর্য হয়ে বললে, 'সে কি বৌ, জাত-ব্যবসা ছাড়লে যে পেটে দুটো ভাতও জুটবে না! তখন করব কি? ভিক্ষে?'

থাকো বললে, 'বুদ্ধির ছিরি দেখ না! পোড়া কপাল, ভিক্ষে করতে যাবে কেন? তুমি জ্যোতিষী হবে—লোকের হাত দেখে টাকা আনবে।'

ছিদাম ভয়ানক চমকে উঠে, কপালে চোখদুটো তুলে বললে, 'জ্যোতিষী? আমি কুমোরের ছেলে, আমি হব জ্যোতিষী? সে যে দুর্বোঘাসে পাকা লাঠি! বৌ, তুমি বল কি? তোমার মাথা খারাপ হয়ে যায়নি তো?'

থাকো বললে, 'আমি ঠিক কথাই বলচি। ঐ দেখ না কেন, পাড়ায় হরি মুকুয্যে জ্যোতিষী হয়ে কত টাকা রোজগার করে, আর তার বৌ গায়ে কত গয়না পরে!'

ছিদাম বললে, 'কিন্তু আমি মোটেই গুণতে শিখিনি যে।'

থাকো এবারে রেগে চেঁচিয়ে বাড়ি মাৎ ক'রে বললে, 'দেখ, তুমি আর আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না। যদি জ্যোতিষী না হও, আমি তাহলে আজকেই বাপের বাড়ি চলে যাব। তখন কে তোমাকে ডাল-ভাত ছত্রিশ তরকারি রেঁধে খাওয়ায়, তা দেখে নেব।'

ছিদাম বৌকে ভারি ভয় করত। কাজেই সে তখন কাঁচুমাচু মুখে

আস্তে আস্তে বললে, 'আচ্ছা, তাহলে আমি না হয় জ্যোতিষীই হব! কিন্তু গিন্নী, এর চেয়ে মানুষ খুন করাও ঢের সহজ বলে মনে হচ্চে।'

২

জ্যোতিষীরা যে পুঁথি বগলে ক'রে পথের ধারে বসে থাকে, ছিদাম তা দেখেছিল। কিন্তু ছিদাম হচ্ছে জাত কুমোরের ছেলে। তার কোন পুরুষে বই কেনেওনি, পড়েওনি— কাজেই তার ঘরেও বই-টই কিচ্ছুই ছিল না।

ছিদাম তখন বুদ্ধি খাটিয়ে, নিজের ছেঁড়া চটিজুতো জোড়া বেশ ক'রে প্রথমে কাপড়ে জড়িয়ে নিলে। তারপর পুঁথির মতন ক'রে সেই জুতোজোড়া বগলে পুরলে। সেই সঙ্গে কপালে একটা মস্ত তিলকও কাটতে ভুললে না।

কিন্তু বাড়ি থেকে বেরুতে তার বুকটা ভয়ে দমে গেল। শহরের সবাই তাকে চেনে। তার এই ভোল ফেরানো দেখলে লোকে বলবে কি?

যাহোক, অনেক করে মনকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শেষটা সে মরীয়া হয়ে যা থাকে কপালে বলে পথে বেরিয়ে পড়ল। তারপর আকাশের দিকে মুখ তুলে চেঁচাতে লাগল, 'আমি জ্যোতিষী! আমি জ্যোতিষী! চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্রের নাড়ীর খবর সমস্তই আমার এই পুঁথিতে লেখা আছে।

রাস্তার লোকজনরা সবাই তো হতভম্ব!

কেউ বললে, 'ছিদামের মাথা খারাপ হয়ে গেছে!'

কেউ বললে, 'ছিদাম বোধহয় ঠাট্টা করচে!'

কেউ বললে, 'ছিদাম, হাড়ি-খুড়ি গড়ায় তোমার কি অরুচি ধরে গেছে ভায়া?'

ছিদাম কিন্তু কারুর কথাই আমলে আনলে না। সে নিজের মনেই গড়গড় ক'রে হেঁকে যেতে লাগল, 'আমি জ্যোতিষী! আমি

জ্যোতিষী !'

ঠিক সেই সময়ে রাজার জহুরী পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রথমে তিনি রাস্তার গোলমালে কান পাতলেন না, —কারণ সেদিন তিনি ভারী একটা বিপদে পড়ে অন্যমনস্ক হয়েছিলেন। তাঁর ঘরে রাজার একখানা দামী মাণিক ছিল, কাল সেখানা চুরি গেছে! এখন রাজা যদি সেকথা জানতে পারেন, তাহলে তাঁর দশা কি হবে?'

হঠাৎ ছিদামের চিৎকার তাঁর কানে গেল। তিনি অমনি তাড়াতাড়ি তার কাছে এসে বললেন, 'সত্যিই কি তুমি জ্যোতিষী?'

ছিদাম বুকে ভয় মুখে সাহস নিয়ে বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর! আমার এই পাতুকা পুরাণে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান একেবারে হাতে ধরা আছে।'

জহুরী চুপি চুপি বললেন, 'দেখ আমার ঘর থেকে রাজার মাণিক চুরি গেছে। সেই মাণিক এখন কোথায় আছে যদি তুমি তা বলতে পার, তাহলে পাঁচ হাজার টাকা বখশিস পাবে। না পারলে জোচ্চোর বলে রাজার কাছে তোমাকে ধরিয়ে দেব। কাল সকালে আমার সঙ্গে দেখা ক'রে, তোমাকে সকল কথা বলতে হবে।

ছিদামের মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ল। সে বুঝলে থাকোমণির কথায় জাল-জ্যোতিষী সেজেই আজ তাকে এই বিষম মুস্কিলে ঠেকতে হল। আপনাকে সামলাতে না পেরে সে বলে বসল, 'ছি ছি, মেয়েমানুষ কি ভয়ানক জাত! নিজের স্বামীকে বিপদে ফেলতেও তাদের মনে দয়া হয় না। ধিক!'

আসল ব্যাপারটা কি জান? স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে তাঁকে জব্দ করবার জন্যেই জহুরীর স্ত্রী মাণিকখানা লুকিয়ে রেখেছিল। জহুরী ভুলেও একবার সে সন্দেহ করেননি! কিন্তু চোরের মন কি না! তাই জহুরী যখন বাইরে বেরিয়ে গেলেন, তখন তিনি থানায় খবর দেন কি না জানবার জন্যে জহুরীর স্ত্রী নিজের এক বিশ্বাসী দাসীকে স্বামীর পিছনে পিছনে পাঠিয়ে দিয়েছিল। দাসী এতক্ষণ ভিড়ের ভিতরে

লুকিয়ে থেকে ছিদাম আর জহুরীর কথাবার্তা শুনছিল। কিন্তু ছিদাম

যখন বললে, 'ছি ছি! মেয়েমানুষ কি ভয়ানক জাত,'—দাসী তখন মনে করলে, ছিদাম আসল চোরের কথা নিশ্চয়ই জানতে পেরেছে। সে আর দাঁড়াল না, একছুটে বাড়িতে ফিরে জহুরীর বৌকে সব কথা খুলে বলল।

জহুরীর স্ত্রীর বুকের রক্ত যেন শুকিয়ে গেল। ভয়ে শিউরে সে বলে উঠল, 'দাসী, উনি জানতে পারলে যে আর রক্ষে রাখবেন না! জ্যোতিষী নিশ্চয়ই কাল সকালে এসে সব কথা ওঁকে বলে দেবে। যা, যা,—তুই শিগগির একখানা পাল্কি ডেকে আন, আমি এখুনি জ্যোতিষীর বাড়ি যাব।'

ছিদাম ততক্ষণে বাড়ি ফিরে এসে, দাওয়ার উপরে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে। কাল তাকে জেলে যেতে হবে, এই ভাবনায় এখন থেকেই সে অস্থির হয়ে উঠেছে।

এমন সময় জহুরীর স্ত্রী এসে পাল্কি থেকে নেমে 'আমাকে বাঁচাও' বলে তার পায়ের কাছে আছড়ে পড়ল।

ছিদাম ভারি আশ্চর্য হয়ে বললে, 'কে আপনি?'

জহুরীর স্ত্রী তখন তাকে সব কথা খুলে বললে।

শুনে ছিদামের ধড়ে প্রাণ যেন আস্তে আস্তে আবার ফিরে এল। সে মস্ত ওস্তাদের মত মাথা নেড়ে বললে, 'হুঁ, আমি সব কথা জানতে পেরেছি বটে। আপনি আমার কাছে না এলে কাল সকালেই আমি জহুরী মশায়ের কাছে গিয়ে সমস্ত বলে দিতুম। আপনি যদি বাঁচতে চান, তবে এখুনি বাড়ি গিয়ে আপনার স্বামীর মাথার বালিশের নিচে মাণিকখানা রেখে দিন গে যান। নইলে আপনাকে আমি ধরিয়ে দেব।'

জহুরীর স্ত্রী তখন ছিদামকে অনেক টাকা বখশিস দিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাড়ি ফিরে গেল।

পরের দিন সকালে ছিদাম জহুরীর বাড়ি গিয়ে হাজির।

জহুরী বললেন, 'কি হে, খবর কি?'

ছিদাম 'পাদুকা-পুরাণে'র ওপরে হাত বোলাতে বোলাতে তিনবার ফুঁ দিয়ে বললে, 'হুজুর, মাণিক আপনার বালিশের নিচেই আছে।'

জহুরী অবিশ্বাস ক'রে বললেন, 'কি ! আমার সঙ্গে ঠাট্টা ?'

ছিদাম আপনার কাপড়ে মোড়া জুতো-জোড়া কপালে ছুঁইয়ে বললে, 'হুজুর, ছি ছি পাদুকা-পুরাণের কথা মিথ্যে হবার যো কি ! পেত্যয় না হয়, আপনি গিয়ে বরং স্বচক্ষে দেখে আসুন।'

জহুরী অগত্যা বাড়ির ভেতরে গেলেন। খানিক পরে আহ্লাদে আটখানা হয়ে ছুটতে ছুটতে ফিরে এসে বললেন, 'ওঃ, অবাক কারখানা ! ছিদাম, তোমার মত জ্যোতিষী এ রাজ্যে আর কেউ নেই !'

ছিদাম আসল কথাটা তুলে বললে, 'হুজুর, আমার বখশিসের পাঁচ হাজার টাকাটা—'

জহুরী বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আলবৎ ! এখুনি আনিয়ে দিচ্ছি।'

৩

দেশে দেশে জ্যোতিষী ছিদামের নামে ঢাক পিটে গেল। কিন্তু যত নাম-ডাক বাড়ে, ছিদামের ভয়ও ততই বাড়তে লাগল। কে জানে কোথা দিয়ে কখন আবার কি বিপদ ঘাড়ের ওপরে এসে পড়বে, তখন কি হবে ?

জ্যোতিষীর ব্যবসাটা ছেড়ে দিতে পারলে ছিদাম হাঁপ ছেড়ে বাঁচতে পারত। কিন্তু জহুরীর কাছ থেকে বখশিসের টাকা পেয়ে, থাকোমণির লোভ আরো দশগুণ বেড়ে গেছে। তার গায়ে অনেক গয়না হয়েছে বটে, কিন্তু তাতে তার আর মন উঠছে না। সে এখন প্রকাণ্ড সাতমহলা অট্টালিকায় দাস-দাসী নিয়ে বড়লোকের গিন্নীর মত থাকতে চায়। কাজেই ছিদাম জ্যোতিষীর কাজ ছাড়তে চাইলেই সেও শাসিয়ে বলে, 'তবে চললুম এই বাপের বাড়ি !'

এমনি সময়ে রাজবাড়িতে বিষম এক চুরি হয়ে গেল। রাজার মালখানায় চল্লিশ ঘড়া মোহর আর মণি-মুক্তো জমা করা ছিল, হঠাৎ

একদিন সকালে দেখা গেল ঘড়াগুলো আর ঘরের ভেতরে নেই! একদল চোর রাত্তিরে সিঁদ কেটে সেগুলো নিয়ে সরে পড়েছে।

রাজ্যময় হুলুস্থূল! রাজার বাড়িতে চুরি—সে তো বড় সোজা কথা নয়! চারিদিকেই সেপাই-সান্ত্রী ছুটছে—ধর-পাকড় হচ্ছে। কিন্তু আসল চোর ধরা পড়ল না, রাজার মেজাজও রেগে চটাং। শহর-কোটাল হাতে মাথা-কাটা যার কাজ সে চোর ধরতে পারলে না বলে রাজার হুকুমে তারই মাথা গেল ঘ্যাচ করে কাটা।

তারপর মন্ত্রীরও মাথাটি যখন যায় যায় হয়েছে মন্ত্রী তখন একবার শেষ চেষ্টা ক'রে জোড়হাতে বললেন, 'মহারাজ, শুনেছি শহরের ছিদাম জ্যোতিষীর ভারি হাত-যশ। একবার তাকে আনিয়ে দেখলে হয় না?'

জ্যোতিষে-ফোতিষে রাজা একতিলও বিশ্বাস করতেন না। তবু তিনি বললেন, 'আচ্ছা, এও আর বাকি থাকে কেন? নিয়ে এস ছিদামকে।'

খানিক পরেই একদল পাইক ছিদামকে ধরে হিড়হিড় ক'রে টানতে টানতে নিয়ে এল। সারা পথ বলিদানের পাঁঠার মত সে এমন ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে এসেছে যে, তার বগল থেকে পাদুকা-পুরাণখানা কখন কোথায় খসে পড়ে গেছে, তা সে টেরও পায়নি।

রাজার সুমুখে এসে ছিদামের ঘটে যেটুকু বুদ্ধি ছিল সেটুকুও গেল উবে। সে একেবারে রাজার দু' পা জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ ক'রে কঁাদতে কাঁদতে বললে, 'মহারাজ, মহারাজ, আপনার পাইকরা বিনি-দোষে আমাকে ধরে এনেছে।'

রাজা বললেন, 'আমার মালখানা থেকে চল্লিশ ঘড়া মোহর আর মণি-মুক্তো চুরি গেছে, তার খবর রাখ কিছু?'

ছিদাম ঢোক গিলে বললে, 'মহারাজ, আমি তো সেগুলো চুরি করিনি, আমাকে ছেড়ে দিতে আজ্ঞা হয়।'

রাজা বললেন, 'না, চুরি করনি বটে, কিন্তু তুমি জ্যোতিষী—তোমাকে গুণে চোর ধরে দিতে হবে। যাও, তোমাকে সাতদিন সময়

দিলুম। এর মধ্যে চোর ধরতে পারলে তোমাকে লাখ টাকা বখশিস দেব, না পারলে নেব গর্দান।'

আর সাতদিন! তারপরে? —ওঃ, বাপরে! ভাবতেও ছিদামের বুকটা ধড়াস ক'রে কেঁপে উঠল। সে ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে গেল।

ছিদামকে কাঁদতে কাঁদতে আসতে দেখে থাকোমণি বললে, 'ওকি, কাঁদছ কেন?'

ছিদাম ধুপ করে দাওয়ায় বসে পড়ে বললে, 'গর্দান যাবে শুনলে কার মুখে হাসি আসে?' এই বলে সে নিজের বিপদের কথা বউকে সব জানালে।

থাকো বললে, 'তার জন্যে আবার কচি খোকার মত কান্না কেন? গুণে-টুনে চোর ধরে দাও।'

ছিদাম বললে, 'ক খ পড়তে পারি না, আমি আবার গুণব? কুমোর যে গণক হয় না তা কি তুমি জান না? না গিন্নী, আমি গুণবও না, গর্দানও দেব না—আমি এদেশ ছেড়েই দেব লম্বা।'

থাকো খেঁকিয়ে উঠে বললে, 'পালাবে? ভারি আবদার যে! জানো তাহলে আমি নিজেই রাজবাড়িতে গিয়ে তোমার পালানোর খবর দিয়ে আসব।'

ছিদাম হাল ছেড়ে দিয়ে ফোঁশ ক'রে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'সিঁথের সিঁদুর যেদিন মুছবে, থানকাপড় যেদিন পরবে, মাছ-চচ্চড়ি যেদিন খেতে পাবে না, সেইদিন তুমি আমার দুঃখ বুঝবে—তার আগে না।'

৫

এদিকে চোরের দল বেজায় মুস্কিলে পড়ে গেছে। তারা মোহর আর মণিমুক্তো ভরা ঘড়াগুলো শহরের একটা পচা এঁদো পুকুরের ভেতরে লুকিয়ে রেখেছে বটে কিন্তু ধরা পড়বার ভয়ে সেগুলো নিয়ে

শহর থেকে আর পালাতে পারছে না।

তারপর চোরেদের সর্দার যখন শুনলে যে ছিদাম-জ্যোতিষীর হাতে চোর ধরবার ভার পড়েছে তখন ভয়ে তার পেটের পিলে গেল চমকে। সে সাত-পাঁচ ভেবে দলের একটা লোককে ডেকে বললে, 'ওহে আজ সন্ধ্যের সময়ে তুমি ছিদামের ঘরের পাশে লুকিয়ে থেকে আড়ি পেতে শুনবে—আমাদের কথা সে টের পেয়েচে কি না?'

সন্ধ্যের সময়ে একটা চোর গিয়ে ছিদামের ঘরের জানলার পাশে জুজুবুড়ির মতন গা-ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ছিদামের মাথায় তখন খালি এক কথাই ঘুরছে-ফিরছে—সাতদিন—মোটে সাতদিন—তারপরেই তার আশা-ভরসা সব ফরসা! বিশেষ সাতদিনই বা আর কোথায়? সাতদিনের একদিন তো আজকেই ফুরিয়ে গেল ব'লে।

থাকো তাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'কি গো অতখানি মস্ত হাঁ ক'রে ভাবচ কি? চুরির কথা?'

ছিদাম গুম হয়ে বললে 'হুঁ'। তারপর দিনগুলো মনে রাখবার জন্যে দেয়ালে সে খড়ি দিয়ে সাতটা দাগ কেটে একটা দাগ মুছে দিয়ে বললে, 'সাতের এক যেতে আর দেরি নেই, বাকি রইল ছয়।'

এখন দৈবগতিকে চোরের দলেও লোক ছিল মোট সাতজন। জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে চোরটা যখন শুনলে ছিদাম বলছে সাতের এক যেতে আর দেরি নেই তখন সে ভাবলে ছিদাম নিশ্চয়ই গণনা ক'রে তার কথা জানতে পেরে তাকে ধরতে আসছে। তার মনে ভারী ভয় হ'ল। সে একেবারে একদৌড়ে সর্দারের কাছে গিয়ে হাজির।

সর্দার বললে, কিরে হাপরের মতন অত হাঁপাচ্চিস কেন?'

চোর বললে, 'সর্দার, সর্দার! ছিদাম সব টের পেয়েছে! আর একটু হ'লেই আমি ধরা পড়েছিলুম আর কি?'

সর্দার বললে, 'বলিস কিরে? সব কথা খুলে বল তো শুনি?'

চোর তখন সব কথা খুলে বলল।

সর্দার বললে, 'উহুঁ আমার বিশ্বেস হচ্ছে না! হয়ত তুই ভুল শুনেছিস। আচ্ছা, কাল তোরা সন্ধ্যের সময়ে দুজনে গিয়ে ছিদামের ঘরের পাশে লুকিয়ে থাকবি।'

পরের দিন সন্ধ্যের সময়েও ছিদাম বিমর্ষ হয়ে ঘরের এককোণে বসে ভাবছিল আকাশ-পাতাল কত কি!

থাকো বললে, 'কিগো, এত যে ভাবছ কিনারা কিছু হোলো?'

ছিদাম দেয়ালের আর একটা খড়ির দাগ মুছে দিয়ে বললে, 'কিনারা আর কি করব, সাতের দুই যেতে আর দেরি নেই, বাকি রইল পাঁচ।'

যেমনি এই কথা শোনা, ছিদাম ধরতে আসছে ভেবে অমনি চোর দুজনও সে মুল্লুক ছেড়ে দে চম্পট।

সেদিনও সর্দারের মনের ধোঁকা গেল না। বললে, 'এতগুলো টাকা কি ফস ক'রে ছাড়া যায়? আর একবার দেখা যাক। কাল তোরা তিন জনে যাবি।'

সেদিনও ঐ ব্যাপার। সর্দার শুনলে যে, ছিদাম বলেছে, 'সাতের তিন যেতে আর দেরি নেই, বাকি রইল চার।'

আতঙ্কে সর্দারের অমন যে মোটাসোটা নাদুস-নুদুস ভুঁড়ি তাও চুপসে হয়ে গেল এতটুকু। সে কাঁপতে কাঁপতে বললে, 'বাবা প্রাণ থাকলে অমন ঢের টাকা রোজগার করতে পারব। চল ভাই সব, আমরা ছিদামের পায়ে ধ'রে মাফ চাই-গে চল।'

ছিদাম সেইদিন থেকেই শয্যা নিয়েছে—সে বুঝল আর তার বাঁচবার কোনই আশা নেই।

অনেক রাত্রে হঠাৎ সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হ'ল।

'মরছি নিজের জ্বালায় এত রাত্রে আবার কড়া নাড়ে কে রে বাপু!' এই ব'লে ছিদাম বিরক্ত হয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে সদর দরজা খুলে দিলে।

কিন্তু দরজা খুলেই ছিদাম দেখে সামনেই কালো-মুস্কো সাত-

সাতটা ষণ্ডা চেহারা।

সে আঁৎকে চেঁচিয়ে উঠল, 'ওরে বাপরে ডাকাত! চৌকিদার, চৌকিদার!'

কিন্তু চোরেরা সাতজনেই একসঙ্গে ছিদামের পা জড়িয়ে ধরে বললে, 'ছিদামবাবু! দোহাই আপনার চৌকিদার ডেকে আমাদের ধরিয়ে দেবেন না। আমরা আপনার কাছে মাফ চাইতে এসেছি।'

ছিদাম আশ্চর্য হয়ে বললে, 'মাফ? কেন?'

সর্দার একে একে সব কথা বললে।

ছিদাম যেন আকাশ থেকে পড়ল। কিন্তু মনের ভাব লুকিয়ে বুক ফুলিয়ে সে কড়া স্বরে বললে, 'তবে রে শয়তানদের দল। আমি ছিদাম-জ্যোতিষী—ছি ছি, পাদুকা-পুরাণের আগাগোড়া আমার মুখস্থ, আমার সঙ্গে চালাকি? বল শিগগির ঘড়াগুলো কোথায় লুকিয়ে রেখেচিস!'

সর্দার হাত জোড় ক'রে বললে, 'আজ্ঞে চণ্ডীতলার ঐ তালপুকুরের উত্তুর কোণে।'

ছিদাম বললে, 'এখন ভালো চাস তো এ রাজ্যি ছেড়ে সরে পড়। কিন্তু খবরদার ফের যদি সে টাকার ওপরে লোভ করিস তবে তোদের ডালকুত্তো দিয়ে খাওয়াব।'

৬

ভোর না হ'তেই ছিদাম গুটি গুটি রাজবাড়িতে গিয়ে উঠল।

রাজা বললেন, 'খবর ভালো?'

ছিদাম বললে, 'আজ্ঞে না মহারাজ! এ ক'দিন অষ্টপহর ছি-ছি-পাদুকা-পুরাণ ঘেঁটে আমি বুঝলুম যে, এ যাত্রা আপনি একসঙ্গে চোর আর চোরাই মাল দুই-ই পাবেন না। হয় চোর নয় ঘড়াগুলো—এ দুইয়ের কোনটা আপনি চান?'

রাজা বললেন, 'চোর ধরতে পারি তো ভালোই—নইলে সেই

মোহর আর মণিমুক্তো ভরা চল্লিশটা ঘড়াই আমি আগে চাই।'

ছিদাম বিড়বিড় করে কি পড়তে লাগল, 'ওঁ-ওঁ-ওং, হুসহুস—ভুস্‌ভুস্—বোঁ বনবন সোঁ সনসন—হিং টিং ফট আয় চটপট লাগে ভোজবাজি চোর বেটাদের কারসাজি, ঠিক দুপুরে রোদ্দুরে তাল-পুকুরের উত্তুরে—কার আঁজ্ঞে না পাদুকা-পুরাণের আঁজ্ঞে—মহারাজ! শিগগির লোক পাঠান, চণ্ডীতলার তালপুকুরের উত্তুর কোণে আপনার চল্লিশটা ঘড়াই পাবেন।'

তখনি দলে দলে সেপাই-সান্ত্রী চণ্ডীতলার তালপুকুরে ছুটল। খানিক পরেই তারা পুকুর থেকে সত্যিসত্যিই চল্লিশটা ঘড়া তুলে নিয়ে ফিরে এল।

ছিদামও হাঁপ ছেড়ে লাখ টাকা বখশিস নিয়ে ঘরের ছেলে ঘরের দিকে চলল—তার মুখে হাসি আর ধরে না।

গায়ে দু' সেট গয়না হল, সাতমহলা বাড়ি হল, দাসদাসী গাড়ি-ঘোড়া হল, তবু কিন্তু থাকোমণির সাধ মিটল না। যতদিন না রাজ-রাণী হয়, ততদিন তার মনে আর সুখ নেই।

কাজেই দুদিন না যেতে যেতেই সে আবার ছিদামকে গিয়ে বললে, দেখ, 'তোমাকে আরো টাকা রোজগার করতে হবে।'

ছিদাম বললে, 'কেন বল দেখি?'

থাকোমণি বললে, 'সেই টাকায় তুমি একটা রাজ্য কিনবে। তখন তুমি হবে রাজা আর আমি হব রাণী।'

ছিদাম বললে, 'একটা রাজ্য কেনবার মত টাকা আমি পাব কেমন করে?'

থাকোমণি বললে, 'কেন, আবার জ্যোতিষী হও।'

ছিদাম সে কথা হেসেই উড়িয়ে দিয়ে বললে, 'ঢের হয়েছে, গিন্নী, ওসব কথা ভুলে যাও। জ্যোতিষী-টোতিষী এ জীবনে আর হচ্ছি না।'

থাকোমণি চটে লাল হয়ে বললে, 'হবে না কি, হ'তেই হবে। নইলে এখুনি আমি বাপের বাড়ি চলে যাব।'

ছিদাম হাঁক দিলে, 'গঙ্গাফড়িং শিং! গঙ্গাফড়িং শিং! গিন্নী বাপের বাড়ি যাবে, পাল্কি আনতে বল।'

গঙ্গাফড়িং শিং দরোয়ান উত্তর দিলে, 'যো হুকুম হুজুর।'

ছিদাম আবার হাঁক দিলে, 'ওরে আর কে আছিস রে, শিগগির একটা ঘটক-টটক ডেকে আন।'

থাকোমণি বললে, 'কেন, ঘটক আবার কি হবে?'

রূপোর গড়গড়ার নলে ফুড়ুক ক'রে একটা টান মেরে ছিদাম বললে, 'তুমি তো বাপের বাড়ি চললে। কিন্তু আমি এত বড় বাড়িতে একলা থাকব কেমন করে? তাই তোমার বদলে আর একটা বিয়ে করব ভাবছি।'

থাকোমণির মুখ শুকিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি সে বলে উঠল, 'না না, আমি ঘাট মানচি আর কখনো বাপের বাড়ি যেতে চাইব না।'

আশার বাতি

১

স্বপন-সায়রে ঝিলের ঢেউ যেখানে দিন-রাত খালি আকাশে হাত তুলে উছলে উঠছে, ঠিক তারই কোল ঘেঁষে, তারই বুকে চঞ্চল ছায়া ফেলে, দাঁড়িয়ে আছে সেই মনোরম প্রাসাদখানি।

যেন পরীর হাতে মায়া-তুলিতে আঁকা, ঘুমপুরীর ছবিখানি। আগাগোড়া তার আর্শির মতন পালিশ-করা মার্বেল পাথর দিয়ে গড়া —হঠাৎ দূর থেকে দেখলে মনে হয়, চাঁদের আলো যেন সেখানে কার যাদুমন্ত্রে জমাট হয়ে আছে।

পুরীর ফটকের ওপরে জ্বলন্ত সোনার অক্ষরে বড় বড় ক'রে লেখা রয়েছে—"এর ভিতরে ঢুকে যে যা চাইবে, সে তাই পাবে।"

২

পথিক পথের ওপর দাঁড়িয়ে সেই সোনার লেখা পড়ে দেখলে। তার বয়স অল্প—ষোলর বেশী হবে না। লেখাগুলো পড়ে পথিকের মন লোভে ভরে উঠল। সে ফটকের ভিতর ঢুকতে যাচ্ছে, এমন সময় শুনলে, কে একজন হা হা হা হা ক'রে হেসে উঠল।

চমকে উঠে পথিক চেয়ে দেখে, ফটকের গায়ে ঠেসান দিয়ে থুথ্‌ড়ো এক বুড়ো মাটির ওপরে পা ছড়িয়ে বসে আছে। তার দাড়ি ঠিক যাত্রার নারদের দাড়ির মত ধবধবে সাদা। তার পোশাক ছেঁড়াখোড়া, তালিমারা, ময়লা। সেই বুড়োই তার দিকে চেয়ে হাসছিল।

পথিক রাগ ক'রে বললে, 'বুড়ো, আমাকে দেখে তুমি হাসচ বটে, কিন্তু তুমি হচ্ছ একটি আস্ত গাধা।'

বুড়ো হাসি থামিয়ে বললে, 'কেন বল দেখি বাপু?'

পথিক বললে, 'ফটকের নীচেই তুমি পথের ভিখারীর মত ধূলোয় বসে আছ—আর তোমার মাথার ওপরে রয়েছে ঐ সোনার লেখা, তা কি তুমি চোখে দেখতে পাচ্ছ না? তোমার কি কোন সাধ নেই?'

বুড়ো বললে, 'সাধ হয় তো আছে! কিন্তু ঐ বাড়িতে ঢুকে আমি আমার সাধ মেটাতে চাই না।'

পথিক একটু ভয় পেয়ে বললে, 'বুড়ো, সব কথা খুলে বল। এটা কি কোন রাক্ষসপুরী? লোভে পড়ে যে এর ভেতর ঢোকে, সে কি আর প্রাণ নিয়ে ফেরে না?'

বুড়ো মাথা নেড়ে বললে, 'না, না, তা কেন? তুমি স্বচ্ছন্দে এই প্রাসাদের ভেতরে যেতে পার। কেবল এইটুকু মনে রেখ, বিপদকে যে-ডাকে, বিপদ শুধু তার কাছেই ঘনিয়ে আসে।'

পথিক বললে, 'আমি আবার ফিরে আসতে পারব তো?'

বুড়ো বললে, 'হ্যাঁ, বাড়ির ভেতরে গিয়ে যদি তোমার মনে কোন লোভ না হয়।'

পথিক বললে, 'সে কি!'

বুড়ো বললে, 'তা জান না? লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু!'

৩

পুরীর সামনে গিয়ে পথিক দেখলে, তার দরজা দুটি জাফরি-কাটা চন্দন কাঠে তৈরি—কি চমৎকার তার ভুরভুরে গন্ধ!

দরজার ওপরে ঝুলছে এক পাকা সোনার ঘণ্টা, তার ভেতরে দুলছে এক মুক্তোর ঘুন্টি, হাঁসের ডিমের মতন বড়।

মুক্তোটি পাছে ভেঙে যায়, সেই ভয়ে পথিক খুব আস্তে আস্তে ঘণ্টাটি বাজালে। চন্দন কাঠের দরজা অমনি খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটি সুন্দরী মেয়ে এসে, হাতছানি দিয়ে পথিককে ডেকে গানের মতন মধুর সুরে বললে, 'পথিক ভেতরে এস!'

মেয়েটির পরনে ঝলমলে জরির কাপড়, মাথা থেকে পা পর্যন্ত হীরে-মাণিকের গহনা—রাত্তিরে ফুলের ঝোপে যেমন হাজার জোনাকের দেয়ালী জ্বলে—ঠিক তেমনি ধারাই ঝকমক করে উঠছে।

পথিক মোহিত হয়ে বললে, 'তুমি কি রাজকন্যে?'

সে মুচকি হেসে বললে. 'না, আমি তাঁর দাসী।'

পথিক অবাক হয়ে গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগল, যাঁর দাসীরই এত রূপ, এত গয়না—না জানি সেই রাজকন্যে দেখতে কেমন! সে বললে, 'রাজকন্যেকে গিয়ে বল, এক পথিক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

দাসী বললে, 'রাজকন্যে এখন হাওয়া খেতে গেছেন, ফিরতে রাত হবে। ততক্ষণ আপনি ভেতরে আসুন, সব দেখুন-শুনুন, বিশ্রাম করুন।'

পথিক বললে, 'তার নাম কি?'

দাসী বললে, 'কামনা দেবী।'

পথিক বললে, 'তাঁর বিয়ে হয়েছে?'

দাসী বললে, 'না, তিনি বিয়ে করবেন না।'

পথিক আশ্চর্য হয়ে বললে, 'সেকি! কিসের দুঃখে তিনি বিয়ে করবেন না?'

দাসী বললে, 'দুনিয়ার কারুকে তিনি ভালোবাসেন না।'

পথিক আরও আশ্চর্য হয়ে বললে, 'কারুকেই না ?'

দাসী বললে, 'কি মানুষ, কি দেবতা, কি যক্ষ-রক্ষ কারুকেই না।'

পথিক বললে, 'কেন ?'

দাসী বললে, 'মানুষের বুকের ভেতরে হৃদয় থাকে, আমাদের রাজকন্যের হৃদয় নেই।'

পথিক শিউরে উঠে বললে, 'হৃদয় নেই! রাজকন্যের বুকের ভেতরে তবে কি আছে ?'

দাসী বললে, 'পদ্মের রক্তে ডোবানো, বৃষ্টিতে ধোয়া পাথরের মতন কনকনে একখানি রাঙা টুকটুকে পদ্মরাগ মণি—ঠিক হৃদয়েরই মত তিন কোণা!'

৪

সে যে কি অপূর্ব প্রাসাদ, তা লিখে বলা যায় না। তার সমস্ত ঘরের দেয়ালগুলি ঝকমকে ঝিনুক দিয়ে বাঁধানো, তার ছাদের কড়ি-বরগাগুলো রূপো দিয়ে গড়া, তার মেঝেগুলি স্ফটিক দিয়ে তৈরি—চলতে গিয়ে পথিকের পা পিছলে যেতে লাগল। তার মনে হলো, সে যেন বরফের উপর দিয়ে চলছে।

সে বললে, 'দাসী, স্ফটিকের মেঝে দেখতেই ভালো, কিন্তু কোনই কাজের নয়।'

দাসী মুখ টিপে ফিক ক'রে একটুখানি হাসলে।

ঘরে ঘরে রূপোর শিকলে ঝোলানো হাজার হাজার প্রবালের ঝাড়ে, মরকতের ডোমে সার সার বিজলীর বাতি জ্বলছে, চারিদিকে যেন মোলায়েম রাঙা আলোর মালা দুলচে।

পথিক বললে, 'দাসী, দিনের বেলায় জানলা বন্ধ ক'রে তোমরা আলো জ্বেলে রেখেচ কেন ?'

দাসী বললে, 'সূর্যের আলোয় বড় তাত্—রাজকন্যের ননীর মতন গায়ে তা সইবে না তো।'

পথিক বললে, ‘কিন্তু জানলা বন্ধ ব’লে ঘরের ভেতরে যে খোলা হাওয়াও আসতে পারবে না।’

দাসী বললে, ‘বাইরের হাওয়ায় ধুলো-কুটো থাকে, রাজকন্যের ফোটা গোলাপের মত রং তাতে ময়লা হয়ে যাবে যে!’

পথিক বললে, ‘কিন্তু আমার যে হাঁপ ধরচে, গরমে প্রাণ যায় যায় হচ্চে!’

দাসীর ইশারায় অমনি তুজন লোক এসে পথিকের তু’পাশে দাঁড়িয়ে শুক্তির বাঁট লাগানো চামর ঢুলোতে শুরু করলে।

পথিক বললে, ‘চামরে হাওয়া হয়, কিন্তু প্রাণ ঠাণ্ডা হয় না।’

দাসী মুখ টিপে ফিক ক’রে একটুখানি হাসলে।

৫

পথিক এবার যে ঘরে ঢুকল, সে ঘরের মেঝেতে সাত হাত পুরু মোমের মতন নরম গালচে পাতা—সে গালচে লাখো লাখো প্রজা-পতির রঙিন পাখনা দিয়ে তৈরি করা।

পথিক দেখলে ঘরের আশেপাশে এ-কোণে সে-কোণে চারিদিকে মানুষের মতন মাথায় উঁচু দলে দলে সোনার পুতুল দাঁড়িয়ে আছে।

পথিক বললে, ‘এত সোনার পুতুল কেন?’

দাসী বললে, ‘ওরা আগে মানুষ ছিল, এখন অতি লোভের শাস্তি ভোগ করচে।’

পথিক বললে, ‘সে কি রকম?’

দাসী বললে, ‘ওরা এখানে এসে বর চেয়েছিল, ওরা যা ছোঁবে তাই যেন সোনা হয়ে যায়। কিন্তু লোকগুলো এমনি বোকা যে বর পেয়েই সবাই নিজের নিজের গা অজান্তে ছুঁয়ে ফেললে। কাজেই এখন ওরা সোনার পুতুল হয়ে আছে—না পারে নড়তে, না পারে চলতে, না পারে কথা কইতে।’

আর একটা ঘরে গিয়ে পথিক অবাক হয়ে দেখলে একদল বুড়ো

ঘরের মেঝেয় শুয়ে একসঙ্গে কান্নাকাটি করছে। তারা এমন ভয়ানক বুড়ো হয়ে পড়েছে যে, সকলেরই চোখে ধরেছে ছানি, মুখ হয়েছে ফোগলা, কানে লেগেছে তালা, আর গায়ের কোঁচকানো, মাংসগুলো একহাত ঝুলে পড়ে থলথল করছে।

পথিক ভয়ে ভয়ে বললে, 'এরা কারা ?'

দাসী বললে, 'এরা বর চেয়েছিল অমর হবার জন্যে। কিন্তু এদের তখন খেয়াল হয়নি যে, অমর হ'লে লোকে মরে না বটে, কিন্তু যতই দিন যায় চিরকাল ধ'রে ততই বেশী বুড়ো হয়েও বেঁচে থাকতে হয়। এরা দাঁড়াতে পারে না, কারণ পায়ে জোর নেই, এরা খেতে পারে না, কারণ হজমের জোর নেই, এরা হাসতে পারে না, কারণ মনে সুখ নেই। এরা তাই দিনরাত শুধু মাথা কোটে আর কেঁদে মরে।'

পাশের ঘরে ঢুকে পথিক দেখলে, একদল লোক মেঝের উপরে উপুড় হয়ে হুমড়ী খেয়ে আছে, আর তাদের প্রত্যেকের পিঠের ওপরে এক-একটা মস্ত বস্তা ! সেই বস্তার চাপে থেঁৎলে লোকগুলো থেকে থেকে বিষম চেঁচিয়ে ককিয়ে উঠছে !

পথিক বললে, 'এ আবার কি ব্যাপার ?'

দাসী বললে, 'এরা এখানে এক-একটা থলে কাঁধে ক'রে এসে বর মেগেছিল, যেন ওদের থলেগুলো মোহরে ভ'রে যায়। তাই হোলো। কিন্তু অমন মস্ত মস্ত থলে-ভরা বিশ-পঁচিশ মণ মোহর কাঁধে করতে গিয়ে, সেই যে ওরা ঘাড় গুঁজড়ে মাটিতে আছড়ে পড়েছে, আর উঠতে পারেনি।'

পথিক বললে, 'আহা, বেচারীদের বড় কষ্ট হচ্ছে তো ! তোমরা লোক এনে থলেগুলো ওদের পিঠ থেকে সরিয়ে দাও না কেন ?'

দাসী বললে, 'ওদের লোভ এত বেশী যে, প্রাণ যায় তা'ও স্বীকার, তবু মোহরের থলেগুলো ছাড়তে ওরা কিছুতেই রাজি হবে না !'

পথিকের চোখ হঠাৎ ঘরের আর-এক কোণে গেল। সেখানেও খাটের ওপরে মেয়ে মানুষের মত যেন কারা সব শুয়ে আছে, তাদের

দেখতে মানুষের মতও বটে, আবার মানুষের মত নয়ও বটে। তাদের মুখে চোখে-ঠোঁটে রূপের দেমাক যেন মাখানো রয়েছে!

পথিক হতভম্বের মত তাদের দিকে চেয়ে আছে দেখে দাসী বললে, 'ঐ মেয়েগুলি বর চেয়েছিল, পরমাসুন্দরী হবার জন্যে। ওরা রেশমের মতন নরম চুল চেয়েছিল, তাই ওদের মাথার চুলগুলো আসল রেশমই হয়ে গেছে। ওরা পটল-চেরা চোখ, বাঁশীর মতন নাক, মুক্তোর মতন দাঁত, আর সাদা ধবধবে রং চেয়েছিল, তাই ওদের চোখ হয়েছে বঁটিতে-চেরা পটলের মত, নাক হয়েছে কাঠের বাঁশীর মত, দাঁত হয়েছে গোল গোল মুক্তোর মত, আর গায়ের রঙও হয়েছে চূণকামের মত, ওরা যা চেয়েছে তাই পেয়েছে—কিন্তু দেখতে কি ভয়ানক!'

পথিক বললে, 'দাসী, রূপ তো সবাই চায়! তবে ওদের বেলায় এমন শাস্তি কেন?'

দাসী বললে, 'শুধু রূপ যারা চায়, তাদের কপাল অমনি খারাপ হয়। যার গুণ নেই তার রূপও নেই!'

এমন সময়ে একটি মেয়ে পথিকের দিকে চেয়ে, যেন হুকুম চালিয়েই বললে, 'শুনচ আমাকে একটু পাশ ফিরিয়ে দাও তো!'

পথিক বললে, 'দাসী, ওরা কি আপনা-আপনি পাশ ফিরে শুতেও পারে না?'

দাসী বললে, 'না! ওরা রূপের সঙ্গে আরো চেয়েছিল ভারি ভারি সোনার গয়নায় মাথা থেকে পা পর্যন্ত মুড়ে ফেলতে। তাই-ই হয়েচে। এখন গয়নার চাপে আর ভারে ওদের নড়ন-চড়নের ক্ষমতা নেই।'

পথিক যখন মেয়েটিকে পাশ ফিরিয়ে ভালো ক'রে শুইয়ে দিলে, মেয়েটি তখন চেরা-পটল-চোখ তুলে রূপের দেমাকে ঠোঁট ফুলিয়ে বললে, 'কি গো, এই এক-গা গয়নায় আমায় কেমন ভাখাচ্ছে বল দেখি?'

পথিক বললে, 'কিম্ভূতকিমাকার!'

মেয়েটি বললে, 'আমাকে তুমি বিয়ে করবে?'

পথিক ভয়ে চোখ বুজে ফেলে বললে, 'আগে মরে ভূত হই!'

ঘরে ঘরে এমনি সব ব্যাপার দেখে, পথিকের মন একবারে দমে গেল। সে কাতরভাবে বললে, 'দাসী, আর আমি এ-সব দেখতে পারচি না—আমার মন যেন নেতিয়ে পড়চে।'

দাসী বললে, 'পথিক, এস, এখন কিছু জলখাবার খেয়ে ঠাণ্ডা হবে চল।'

জলখাবার ঘরে গিয়ে পথিক দেখলে, চকচকে স্ফটিকের মেঝের ওপরে পোখরাজের চমৎকার কাজ-করা একখানি হাতির দাঁতের পিঁড়ি। সামনেই সোনার থালায় নানান রকমের খাবার সাজানো। সে-সব খাবারের এমন খাসা গন্ধ যে, প্রাণ যেন তর হয়ে যায়!

ক্ষিদের সময়ে এমন ভালো ভালো খাবার পেয়ে পথিকের মনটা ভারি খুশি হয়ে উঠল। সে তাড়াতাড়ি খেতে বসে, ছুটিখানি পোলাও ভেঙে মুখে দিল। কিন্তু তখুনি আবার থু থু করে ফেলে দিয়ে বললে, 'রাম! রাম! পোলাওয়ে চাল নেই, আছে শুধু গরম মশলা। কি তেঁতো—বাপ!' মাছভাজা খেতে গিয়ে দেখলে, সে মাছ তেলের বদলে আতর দিয়ে ভাজা—কার সাধ্যি জিভে ঠেকায়!

'আর খাবার খেয়ে কাজ নেই বাবা, শুধু জল খেয়েই ক্ষিদে মেটানো যাক'—এই ভেবে পথিক জলের সোনার গেলাসটা মুখে তুলেই 'ওয়াক' করে পিঁড়ি ছেড়ে উঠে পড়ল। গেলাসে ছিল খাঁটি গোলাপজল!

পথিক বললে, 'দাসী, তোমাদের জলখাবারে মনমাতানো গন্ধ আছে, কিন্তু এতে পেট ভরে না।'

দাসী মুখ টিপে ফিক ক'রে একটুখানি হাসলে।

পথিক হতাশভাবে বললে, 'দাসী, এখন আর কি করবার আছে?'

দাসী বললে, 'এখন শয়নাগারে বিশ্রাম করবে এস। তারপর কামনাদেবী এলে তাঁর কাছে বর চেয়ে নেবে।'

শয়নাগারের বারান্দায় সারি সারি রূপোর টবে, সোনার গাছে, পান্নার পাতায়, হীরে-চুনী-জহরতের হাজার হাজার রং-বেরং ফুল ফুটে

আছে—দেখতে সুন্দর, কিন্তু গন্ধ নেই একটুও। ভোমরারা পর্যন্ত সে-সব ফুলের কাছে ভুলেও এসে গুনগুন করে গান গায় না।

ঘরের ভেতরও সোনার পালঙ্কে ময়ূরপুচ্ছ মোড়া তোষকের ওপরে, হীরে-মোতির চুমকি বসানো, সোনার সূতোয় বোনা অপরূপ চাদর পাতা বিছানা রয়েছে।

'তবু ভালো, এখন একটু ঘুমিয়ে বিশ্রাম ক'রে বাঁচব।' এই ভেবে পথিক বিছানায় গিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে প'ড়ে বললে,—'আঃ, আঃ, কি আরাম!'

কিন্তু খানিকবাদেই ভিন্ন সুরে বললে—'ওঃ, ওঃ, কি আপদ!'

সে বিছানায় ঘুম তো দূরের কথা, চুপ ক'রে শুয়ে থাকাই অসম্ভব! সেই সোনার সুতোর চাদরে পথিকের গা ছ'ড়ে গেল, হীরে-মোতির চুমকীগুলো পট পট ক'রে তার পিঠে ফুটতে লাগল।

এতক্ষণে পথিক স্পষ্ট বুঝলে যে, ভগবান মানুষকে যে-ভাবে যে-অবস্থায় পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন, মানুষ যদি তাতে তুষ্ট না থাকে, তবে তাকে এমনি ক'রেই নাকাল হ'তে হয়।

পথিক ধড়মড় ক'রে উঠে পড়ে বললে, 'দাসী, আমি চললুম।'

দাসী বললে, 'সে কি, কামনাদেবীর সঙ্গে দেখা করবে না?'

পথিক বললে, 'কামনাদেবী আমার মাথায় থাকুন, আমি বর-টর কিছু চাই না।'

দাসী মুখ টিপে ফিক করে একটুখানি হাসলে।

পুরীর ভিতরে হীরে-মোতি সোনা-দানার মাঝখানে, পথিককে দ্যাখাচ্ছিল ছন্নছাড়া ভিখারীর মত, কিন্তু বাইরে আসবামাত্র চাঁদের আলোর ঝরনা চারিদিক থেকে ঝ'রে পড়ে, তার সর্বাঙ্গ মুড়ে দিলে মধুর রুপোলী সাজে। ফুলের গন্ধ নিয়ে বাতাস এসে পথিকের বুক জুড়িয়ে, তার গায়ে যেন ঠাণ্ডা হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগল।

ফটকের ধারে বসেছিল সেই বুড়ো। পথিককে দেখেই সে হা-হা-হা-হা ক'রে হেসে ব'লে উঠল, 'বাপু, আমি জানতুম, তুমি আবার ফিরে

আসবে! এই দ্যাখো, তোমার জন্যে আমি গাছ থেকে মিঠে ফল, নদী থেকে মিষ্টি জল এনে রেখেছি। ভগবানের দেওয়া এই জলখাবার লোক-দ্যাখানো জাঁকজমকের জন্যে নয়, এতে গরম মশলাও নেই, গোলাপজলও নেই, কিন্তু এ-সব খেলে পেট ভরে, প্রাণ বাঁচে। নাও, এখন খাও-দাও, প্রাণ ঠাণ্ডা কর!'

পথিকের খাওয়া শেষ হ'লে বুড়ো আবার বললে, 'ঐ দ্যাখো, তোমার জন্যে সবুজ ঘাসের গালচের ওপরে খড়ের তোষক বিছিয়ে, ফুল-পাতার চাদর পেতে রেখেচি। এতে সোনার সুতো আর হীরে-মোতির চুমকী নেই বটে, কিন্তু এর ওপরে ঘুম-পাড়ানী মাসি-পিসির হাত বুলোনো আছে,—শুতে-না-শুতেই ঘুমিয়ে পড়বে।'

পথিক জিজ্ঞাসা করলে, 'বুড়ো, তোমার নাম কি?'

বুড়ো বললে, 'সন্তোষ।'

বৃন্দাবনী চুটকী

১

বৃন্দাবনে এলেম এবার, মালাই খেলেম খুব দেদার,
হাঁসফাসিয়ে লম্বা হলেম দাদা, আমি, আর কেদার।
আচ্ছা করে জড়িয়ে ধরে আরাম ভরা নিদ্দেকে,
চক্ষু বুঁজে আমি যখন সাধচি শুয়ে নিদ্রেকে,
রাত্রি তখন অনেক হবে, শব্দ-টব্দ কিচ্ছু নেই !
হঠাৎ যেন—ও বাবা গো ! কামড়ালো কি বিচ্ছুতেই ?
ধড়মড়িয়ে লাফিয়ে উঠি—নয়তো এটা গোখরো সাপ ?
হাত বুলিয়ে পিঠের ওপর চেঁচিয়ে বলি বাপরে বাপ !
দাদা-টাদা জেগে উঠে বলেন, "ওরে হোলো কি ?"
হতাশভাবে বল্লুম, "দেখ, ভায়া তোমার মোলো কি !
পিঠের ওপর লতার ছোবল—জলদি জ্বালো পিদ্দিমে !"
"বলিস কিরে !"—বলেই দাদা জ্বাললে আলো টিমটিমে।

২

তারপরেতে দেখলুম যাহা, লাগল তাতে ধাঁধা হে !
ঘরের ভেতর উড়চে যেন চামচিকেরি গাদা হে !
হো হো হেসে বললে দাদা ডেকে কেদার বসাকে,
"বোঝা গেছে, সাপ ভেবেচে বৃন্দাবনী মশাকে !"
ওরে বাবা, মশা ওরা ? শুনেই চক্ষু চড়কগাছ !
মশা হোলেও নেইকো কোথাও মশার মতন ধরন-ধাঁচ !
বোঁ বোঁ করে আসচে তেড়ে শানিয়ে হুলের করাত যে,
শোঁ শোঁ করে রক্ত শোষে মন্দ ঠ্যাকে বরাত যে !

একটা মারি দশটা আসে, তার পিছনে দুশোটা,
ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, ঠিক যেন সে ঘুষোটা!
মারতে মশা নিজের গালে কষিয়ে দেদার চাপড়টা,
ধেৎ বলে ফের কেৎরে পড়ি, মাথায় দিয়ে কাপড়টা!

৩

মুড়ি দিয়েও নেই বাঁচোয়া, উল্টে বাড়ে পোঁ পোঁ বোল,
চাদর ফুঁড়ে আদর করে, নাকের ডগা হলো ঢোল!
"রোসতো" বলে লাফিয়ে উঠি, ঘুরিয়ে ছুঁড়ি ছাতাটা,
মশার তাতে বয়েই গেল, ফাটল দাদার মাথাটা।
দাদা এল পাকিয়ে ঘুষি, মশা এল শানিয়ে হুল,
চক্ষু চেয়ে পষ্ট দেখি, ফুটচে হাজার সর্ষে-ফুল!
ভড়কে আমি, বিছনা ছেড়ে তড়াক কোরে পগার পার
ঘুষির ভাবনা গেল বটে, রইল কিন্তু মশার সার!
মানুষ দেখে যত মশা খালি করে নর্দমা,
বাজিয়ে ভেঁপু পালে পালে নিতে এল গর্দানা!
মেঘের মত মশার ঝাঁকে ছিষ্টি কালো কিষ্টি হে,
স্মরণ করি ইষ্টিদেবে, ঝাপসা হোলো দিষ্টি হে!
শিকার পালায় দেখে তারা দিচ্ছে রুখে বাগড়া রে,
গায়ে যেন বসায় দাড়া সুমুদ্দুরের কাঁকড়া রে!
যাচ্ছি কোথা জানিনেকো--দক্ষিণে না উত্তুরে?
ওগো বাবা, খেলে বুঝি আজকে তোমার পুত্তুরে!
বৃন্দাবনে কৃষ্ণে দেখে পেলুম বুঝি কৃষ্ণে গো!
ওরে মশক, দে রে ছেড়ে, প্রাণটা কেড়ে নিসনে গো!
রক্ত বুকে উছলে ওঠে—মশার বাঁশী শুনে আজ,
কাছা-কোঁচা খুলে চোঁচা ছুট্‌চি সোজা নেইকো লাজ।

মুখ খিঁচিয়ে চুলকে গা-টা, ফুলে হলুম হস্তীটি !
উধাও ছুটে পেরিয়ে এলাম শহরের শেষ-বস্তিটি !
প্রাণটা তখন ওষ্ঠাগত পেয়ে হুলের নমুনা,
থমকে হঠাৎ চমকে দেখি, সামনে কালো যমুনা।
একটুখানি ভাবনা হোলো—ফিরি কিম্বা ঝম্ফ দি ?
ক্যাঁক করে ফের মশার কামড়—অমনি দিলাম লম্ফটি !

৪

নাক-বরাবর চোবাই জলে, এড়িয়ে মশার সীমানা,
যাচ্ছিল এক মালসা ভেসে মাথায় তুলি সেইখানা !
কালীয়-সাপের ছ্যানা আছে শুনেছিলুম জলেতে,
'ল্যাজ দিয়ে পাক জড়িয়ে' যদি দ্যায় সে আমার গলেতে ?
তারপরেতে—কাছিম-চাচা ? বলি, জেগে আছ কি ?
ঠ্যাঙের ওপর দাঁত বসাতে তুমিও তেগে আছ কি ?
নেক-নজরে চাইবে না কি, নইলে আমি যাই মারা,
রাখতে পারো, মারতে পারো, করবো কি আর নাই চারা !
একটা রাতের অতিথ আমি, গেছে সকল ভরসা-সুখ,
ভাগ্‌ব আমি দেখতে পেলেই সূয্যি-মামার ফরসা মুখ।
গোপীনাথজী সুখে থাকুন, মালপো ভোগে হোন মোটা,
মশারা সব লুটুক মজা, নয় সে বড় মন্দটা ;
চাইনে আমি মাখন-ননী, বাঁচে যদি আজ মাথা—
এক ছুটেতে টিকিট কেটে—এক দমেতে কলকাতা !

ডাকপেয়াদা

পাগলা ঝোড়ো ঝটকা মারে বাঁশের ডালে ঠকঠকি'—
আকাশ চিরে ফিন্‌কি তোলে ডাইনী-বুড়ীর চকমকি!
ঝমঝমিয়ে বিষ্টি পড়ে, নদীর জলে ডাকছে বান,
ঘুটঘটে ঐ আঁধার রাতে হি হি শীতে কাঁপছে প্রাণ।
ডাকপেয়াদা, এই বাদলে বাইরে হবে রাতকানা,
ঘরের ভেতর এসে ভায়া, নাও তাতিয়ে হাতখানা।

বনের পথে আছে বাঘা, চোখে আগুন গনগনে
হালুম ক'রে আসবে তেড়ে দেখলে তোমার লণ্ঠনে।

কালপ্যাঁচারা করছে চ্যাঁ-চ্যাঁ, গর্তে গ্যাঙায় ব্যাঙগুলো,
শেওড়া-ডালে দুলছে হুনো, হাত সরু তার ঠ্যাং ফুলো।
ডাকপেয়াদা, শুনছ দাদা? দেখছ তো ঐ অন্ধকার?
আজকে যে লোক হাঁটবে পথে কপাল ভারি মন্দ তার।

ঘ্যাঁঘোর গিন্নী নাকেশ্বরী পুকুরপাড়ে শিল কুড়োয়।
খোক্কসেরি বাচ্চা কাঁদে, পেঁচো এসে খিলখিলোয়।
গোরস্থানে ঢুলছে বসে মামদো-ভূতের বিশ পিসে,
বেহ্মদত্যি পৈতে মাজে, রংটা কালো মিশমিশে।
আজকে রাতে একানোড়ে নাচচে চড়ে তালগাছে,
ডাকপেয়াদা, ঘরে থাকো, আজ বাদে তো কাল আছে!

তার চেয়ে ভাই, জমবে এখন তোমার মুখের গল্পটা,
কত দেশেই বেড়িয়ে বেড়াও—নয় সে বড় অল্পটা।
আছে কি ভাই, নদীর পারে তেপান্তরের ঘুমপুরী?
রূপোর খাটে কন্যে ঘুমোয়,—সত্যি সে কি সুন্দুরী?
বলতে পারো, সাতভাই-চম্পা ফুটে আছে কোনখানে?
রাজার ছেলে কোন পথে যায় পক্ষীরাজের সন্ধানে?

আদর ছড়া

ও আমার!
ধিন্‌তাধিনা পাকা-নোনা,
নাচ ধরেছে খোকন-সোনা।
থাম রে তোরা, করিসনে গোল—
নইলে ভোঁদড় মারবে ঠোনা!
আয়রে ছুটে ভুঁড়ো-শেয়াল!
হ্যাংটা নাগার দেখ সে খেয়াল
দুলছে কেমন ফুলের মালা,
বাজছে কেমন জোড়া ঘুঙুর
ন্যাজ ঝোলারা ডালে বসে
শুনছে কেবল ঝুমুর ঝুমর।

ট্যাপাটোপা ট্যাপারিটি
গাল দুটি ঠিক গোলাপ-পাতা !
জোছনা-মাখা দাঁতগুলি যে
হেঁট করে দেয় চাঁদের মাথা !

দেখবে এস দাঁতে মিশি
বন-কাপাসী মাসী-পিসী !
বন থেকে আয় বেরিয়ে টিয়ে
খোপ থেকে আয় বকম্-বকম্
কদম ফুলের মৌমাছিরা
দেখ সে খোকার রকম-সকম !

ভুরু দুটি আলতো আঁকা
চোখদুটি ওর ঢুলুঢুলু
যাদুমণির হাসির সুরে
ফুটছে নদীর কুলু-কুলু !
ওরে আমার বুলবুলিটি !
নরম নরম ক্ষীর-পুলিটি !

ওরে আমার পুঁচকে মাতাল !
আবোল-তাবোল ময়না পাখি !
আমার ঘরে এলি মাণিক,
সাত-রাজাকে দিয়ে ফাঁকি !

শান্ত ছেলে

হুড়ুম-দড়াম, ঝন-ঝনা-ঝন ! বাপরে, একি ধুমধাড়াক্কা !
কাঁপছে বাড়ি, ঝরছে বালি—বুকের ভিতর ঢেঁকির ধাক্কা !
ঐ যাঃ ! বুঝি ভাঙল শার্সি,
গুঁড়িয়ে গেল দেয়াল আর্শি !
কে আছিস রে, ছাখরে গিয়ে ফাটল বুঝি মাথার খুলি !
শুনলুম শেষে হাবুবাবু খেলছেন ঘরে ডাণ্ডাগুলি !

হাবুবাবু ঠাণ্ডা ছেলে, বাপের খুরে পেন্সিল কাটেন,
পুরুতঠাকুর বসলে পূজোয় ক্যাচ কোরে তাঁর টিকি ছাঁটেন

লম্বা সুতোয় বড়শী গেঁথে
ছাদের ধারে ওৎটি পেতে,
হাবু আছেন ঘুপটি মেরে, পথ দিয়ে যায় ফিরিওলা,
ঝাঁকা থেকে অমনি তাহার ফল কি খাবার টেনে তোলা।

হাবুবাবু লক্ষ্মী ছেলে ঘরের মেঝেয় গাবু খোঁড়েন,
খোকার মাথায় লাট্টু ঘোরান, খুকীর পিঠে ধনুক ছোঁড়েন।
'এয়ার-গান'টা কাঁধে নিয়ে,
শিকার করতে সেদিন গিয়ে,
জলের কুমীর পেলেন নাকো, ছ্যালের গায়ে টিকটিকিটে,
মারতে তাকে, লাগল আমার চশমাটাতেই গুলির ছিটে!

হাবুর ফুটবল সেদিন গিয়ে পড়ল পাশের বাড়ির ভেতর,
কর্তা তাদের চটে বলেন—"বল দেব না আজকে রে তোর।

ছেলেপুলের ভাঙবে মাথা
ওরে গোঁয়ার, জানিস না তা?"
হাবু বলে কাঁদো-মুখে, "ভয় কি তোমার ছেলে গেলে?
একটি মোটে বল যে আমার, তোমার আছে সাতটা ছেলে।"

হাবুবাবুর ভরসা কত! চ্যাটালো তার বুকের পাটা!
দিনের বেলায় মারতে পারেন ভূতের টাকে দশটা চাঁটা!
বোনের পায়ে ল্যাং লাগিয়ে,
হারিয়ে তারে স্থান ভাগিয়ে—
সন্ধ্যে হলেই চক্ষু বুঁজে, একেবারে খুলে জামা
মায়ের বুকে লুকিয়ে বলেন, "ভূতের গল্প শুনব না মা!"

মানুষের প্রথম অ্যাড্‌ভেঞ্চার

প্রথম পরিচ্ছেদ

হাঁহাঁর ছেলে ধাঁধাঁর কাণ্ড

ঐতিহাসিকের জ্ঞান কত ক্ষুদ্র? পৃথিবীর জীবন-কাহিনী কত বৃহৎ!

অগ্নিময় পৃথিবী কবে অপর গ্রহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শূন্যপথে ছুটতে শুরু করলে, কোন ঐতিহাসিকই তার সঠিক তারিখ জানেন না। আন্দাজে হিসাব দেন ৩,০০০,০০০,০০০ বৎসর! সেই পৃথিবীর আগুন ধীরে ধীরে নিবে গেল শত শত যুগান্তরের পরে। পৃথিবীর বুকে হ'ল সাগর সৃষ্টি এবং সেই সাগরে হ'ল কোটি কোটি জীবাণুর সৃষ্টি! জীবাণুরা ক্রমেই বৃহত্তর আকার ধরতে লাগল, কেউ উঠল জল থেকে ডাঙায়, কেউ উড়ল ডাঙা থেকে শূন্যে! জীবেরা বাড়তে বাড়তে প্রায় চলন্ত পাহাড়ের মত হয়ে উঠল—যেমন ডাইনোসর! কিন্তু কোন ঐতিহাসিকই সেদিন জন্মগ্রহণ করেন নি।

প্রকৃতি বারংবার পরীক্ষার পর বুঝলেন, মস্ত মস্ত জীব গড়া মিথ্যা পণ্ডশ্রম, তারা পৃথিবীর উপযোগী নয়। তিনি একে একে অতিকায়, নির্বোধ ও হিংসুক জীবগুলোকে পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে লুপ্ত ক'রে দিতে লাগলেন। এবং নতুন গড়নের এক জীব তৈরি ক'রে নিযুক্ত হ'লেন পরীক্ষায়। এই নতুন জীবেরা ডাইনোসরদের দেহের তুলনায় নগণ্য, কিন্তু মস্তিষ্ক হ'ল তাদের অসাধারণ। তারা নিজেরাই নিজেদের নাম রাখলে, 'মানুষ'।

কবে যে তাদের প্রথম সৃষ্টি, মানুষরাই তা ঠিক জানে না! কেবল কেউ কেউ আন্দাজি হিসাবে বলে, দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার বছর ধ'রে মানুষ পৃথিবীতে বাস করছে। এ হিসাব মানলেও দেখি, আধুনিক

মানুষের ইতিহাস অতি কষ্টে মাত্র ছয় হাজার বৎসর আগে গিয়ে পৌঁছুতে পেরেছে। বাকি দুই লক্ষ চৌত্রিশ হাজার বৎসরের কোন হিসাবই নেই! অন্যান্য পণ্ডিতের মতে, মানুষ জন্মেছে আরো অনেক —অনেক কাল আগে। যাঁর যা খুশি বলছেন, কারণ ভুল ধরবার মত নির্ভুল স্পষ্ট প্রমাণ কারুর হাতেই নেই!

কিন্তু পৃথিবী নিজে তার দেহের মাটি ও পাথরের স্তরে স্তরে লিখে রেখেছে মানুষের চমৎকার গল্প। মানুষ এতদিন পরে সেই সব গল্প আবিষ্কার ক'রে ফেলেছে। আমি তারই কতক-কতক তোমাদের শোনাব।

মিশর, ব্যাবিলন, ভারত, চীন ও পারস্য প্রভৃতি দেশের সভ্যতা সব চেয়ে পুরানো, এ-কথা তোমরা জানো। কিন্তু আমি যে-সময়ের কথা বলছি, তখন কোন সভ্যতারই জন্ম হয় নি। সে যে কত হাজার বৎসর আগেকার কথা, তাও আমি বলতে পারব না।

ভারতবর্ষের তখন কোন নাম ছিল না। মানুষও তখন কোন দেশকে স্বদেশ ব'লে ভাবত না। তাদের সমাজও ছিল না। এক এক পরিবারভুক্ত মানুষরা কিছুদিন ধ'রে এক এক জায়গায় বাস করত। তখনো তারা চাষ-বাস করতে শেখেনি। বন থেকে ফল-মূল কুড়িয়ে বা শিকার ধ'রে এনে তারা পেটের ক্ষুধাকে শান্ত করত। তারপর সেখানে ফলমূলের বা শিকারের অভাব হ'লেই অন্য কোন দেশে গিয়ে হাজির হ'ত। পৃথিবীতে তখন হিন্দু বা অন্য কোন ধর্ম বা জাতি বা ভাষারও সৃষ্টি হয়নি। মানুষ কথা কইত বটে, কিন্তু তার কথার ভাণ্ডারে বেশী শব্দ ছিল না, তাই বেশী কথাও সে বলতে পারত না, ঠারে-ঠোরে ইশারাতেই অনেক কথার কাজ সারত। কেউ লিখতে জানত না। তখন শহর বা গ্রামের স্বপ্নও কেউ দেখেনি। যখন কেউ কোথাও স্থায়ী হয়ে বাস করে না তখন শহর বা গ্রাম বসাবার দরকারই বা কি? ঐ কারণেই আজও বেদুইন প্রভৃতি জাতির দেশে শহর বা গ্রামের বিশেষ অভাব।

উত্তর-পূর্ব ভারতে হিমালয়ের নিকটবর্তী এক দেশ।

এইখানেই উঁচু পাহাড়ের গুহায় একটি পরিবার বাস করে।

পরিবারের কর্তার নাম হাঁহাঁ। গিন্নীর নাম হুয়া। তাদের তিন ছেলে, দুই মেয়ে। ছেলে তিনটির বয়স যথাক্রমে চব্বিশ, কুড়ি ও আট বৎসর। বড় মেয়ের বয়স ষোল ও ছোট মেয়ের এক বৎসর। তাদের আরো ছেলে-মেয়ে হয়েছিল, কিন্তু তারা বেঁচে নেই।

গুহার ধারে একখানা বড় পাথরের উপরে ব'সে হাঁহাঁ সবিস্ময়ে দূর-অরণ্যের দিকে তাকিয়েছিল।

হাঁহাঁ মানুষ বটে, কিন্তু তাকে দেখলে ভয়ে তোমাদের বুক কেঁপে উঠবে। তার মাথায় বড় বড় রুক্ষ চুল—তেল ও জলের অভাবে কটা। কেবল মাথায় নয় সর্বাঙ্গেই রাশি রাশি বড় বড় চুল বা লোম। রং কালো কুচকুচে। কপাল ভয়ানক ছোট, ভুরুর উপরকার অংশটা আবার সামনের দিকে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। দুই চোখে তীব্র বন্য ভাব। নাক থ্যাবড়া। শিকারী জানোয়ারের মত বা ছবির রাক্ষসের মত ধারালো ও ভীষণ দাঁত। চিবুক নেই বললেই চলে। বিষম চওড়া বুক। হাতে এবং বুকের পাশে ও তলায় লোহার মতন কঠিন পেশীগুলো ঠেলে ঠেলে উঠছে। আজানুলম্বিত বাহু দেহের তুলনায় ছোট, মোটা মোটা পা-দুখানা বাঁকা, তাই তাকে হেলে-দুলে হাঁটতে হয় এবং হাঁটবার সময়ে সে পায়ের চেটো সমানভাবে মাটির উপরে ফেলতে পারে না। হাঁহাঁকে হঠাৎ দেখলে তোমরা গরিলা ব'লে মনে করবে, কিন্তু সে গরিলা নয়। কারণ লক্ষ্য করলেই দেখবে, সে কাপড় পরতে জানে—যদিও তার কাপড় হচ্ছে চামড়ার! আমরা যেমন ক'রে গামছা পরি, হাঁহাঁও কাপড় পরে সেই ধরনে। হাঁহাঁ হাসতে জানে, কথা কইতে পারে। কাপড় পরা এবং হাসতে ও কথা কইতে পারা হচ্ছে মনুষ্যত্বের লক্ষণ। য়ুরোপের পণ্ডিতরা তখনকার মানুষদের নাম দিয়েছেন 'নিয়ানডের্টাল মানুষ।'

হাঁহাঁ সবিস্ময়ে যে দূর-অরণ্যের দিকে তাকিয়ে ছিল, সেখানে দাউ

দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে ভীষণ দাবানল—আকাশের একটা দিক জুড়ে! লক্ষ লক্ষ শিখা-বাহু বাড়িয়ে দাবানল যেন আকাশকেও গ্রাস করতে চায়!

ঐ দাবানল জ্বলছে যে-বনে, ঐখানেই হাঁহাঁ বউ আর তার সন্তানদের নিয়ে একটি গুহায় বাস করত। কিন্তু দাবানলের কবল থেকে নিস্তার পাবার জন্যে সে এই নতুন বাসায় পালিয়ে এসেছে।

হাঁহাঁ মাঝে মাঝে এইরকম দাবানল দেখে বটে, কিন্তু তার রহস্য বুঝতে পারে না। সে তাকে জীবন্ত ক্ষুধার্ত ও ভয়াবহ কোন দেবতা ব'লে মনে করে। তার ভয়ও হয়, ভক্তিও হয়। দাবানলের অপূর্ব শক্তিও সে দেখেছে। যে-রাতের অন্ধকার তার জীবনের অভিশাপের মত, যে তার চোখ অন্ধ করে, বুকে বিভীষিকা জাগায়, একমাত্র দাবানলকে দেখলেই সে দূরে পালিয়ে যায়। অন্ধকারকে তাড়াবার কোন উপায়ই জানা নেই, কারণ সে আগুন সৃষ্টি করতে পারে না। তারপর ম্যামথ-হাতি, রোমশ গণ্ডার ও গুহা-ভাল্লুক প্রভৃতি হিংস্র ভয়ঙ্কর জন্তুরা ঐ দাবানলের কোপে পড়লে কত সহজে ছটফটিয়ে মারা যায়, সেটাও সে স্বচক্ষে দেখেছে।

হাঁহাঁ তাই দাবানলকে দেখতে দেখতে ভাবছিল, ওর খানিকটা যদি আমার হাতে পাই, তাহ'লে রাতের অন্ধকারকে আর সমস্ত জীবজন্তুকে আমি জব্দ করতে পারি!

হাঁহাঁ নীচের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলে, পাহাড়ের তলা দিয়ে দলে দলে ম্যামথ-হাতি, রোমশ গণ্ডার, বন্য বৃষ, বুনো কুকুর, নেকড়ে বাঘ ও হরিণ দাবানলের ভয়ে প্রাণপণে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে! সে চেঁচিয়ে বউকে ডাকলে, 'হুয়া! হুয়া!'

হুয়া গুহার ভিতরে ব'সে রাতের খাবার তৈরী করছিল। কতকগুলো বুনো গাছের থেঁতো করা শিকড়, গোটাকয়েক ফল আর পাঁচটা ইঁদুর। নতুন জায়গায় এসে হাঁহাঁ এখনো শিকারের সন্ধান পায়নি, তাই আজ আর এর চেয়ে ভালো খাবার হয়তো জুটবে না। ইঁদুরগুলোকে হুয়া নিজেই গুহার ভিতরে ধরেছে।

স্বামীর ডাক শুনে সে গুহার ভিতর থেকে ছোট মেয়েকে কোলে ক'রে বেরিয়ে এল। তারও চেহারা অনেকটা হাঁহাঁর মতই দেখতে বটে, কিন্তু আকারে আরো ছোট এবং তার মুখের ভাবও ততটা কঠোর নয়।

হাঁহাঁ শুধোলে, 'টুটু আর ঘটু কোথায়?'

টুটু আর ঘটু হচ্ছে হাঁহাঁর বড় ও মেজো ছেলের নাম।

হুয়া কোন উত্তর না দিয়ে বনের দিকে অঙ্গুলীনির্দেশ করলে। হাঁহাঁ বুঝলে, তারা বনে শিকার খুঁজতে গিয়েছে। তার মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল, কারণ বনে আজ দাবানলের ভয়ে অগুন্তি জন্তুর আমদানি হয়েছে, শিকারের পক্ষে সে-স্থান নিরাপদ নয়।

হুয়া হঠাৎ অস্ফুট কণ্ঠে আর্তনাদ ক'রে উঠল। হাঁহাঁ চমকে ফিরে দেখলে, হুয়া সভয়ে পাহাড়ের উপর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সেইদিকে তাকাতেই তার চোখে পড়ল, একটা প্রকাণ্ড গুহা-ভাল্লুক পাহাড়ের অনেক উঁচুতে দাঁড়িয়ে তাদের দিকেই কটমট ক'রে চেয়ে আছে!

হাঁহাঁ তাড়াতাড়ি পায়ের তলা থেকে বর্শাটা তুলে নিলে। একটা বাঁশের ডগায় চক্‌মকি-পাথরের ফলা বসিয়ে বর্শাটা তৈরি করা হয়েছে। তখনো পৃথিবীতে কেউ লোহা আবিষ্কার করতে পারেনি, কাজেই চকমকি-পাথর কেটেই অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করা হ'ত।

ঐ গুহা-ভাল্লুকই ছিল তখনকার মানুষদের সব-চেয়ে বড় শত্রু। তখনকার মানুষের মত সেকালের গুহা-ভাল্লুকরাও এখনকার ভাল্লুকের চেয়ে আকারে ঢের বেশী বড় হ'ত এবং মানুষের মাংস তারা ভালবাসত। হাঁহাঁর দুটি সন্তান ও একটি বউ তাদেরই পেটে গিয়েছে।

হাঁহাঁ উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, 'ধাঁধাঁ কোথায়?' ধাঁধাঁ তার ছোট খোকার নাম।

হুয়া বললে, 'ঝরনায়।'

হাঁহাঁ ইশারায় হুয়াকে গুহার ভিতরে যেতে ব'লে নিজে চলল ধাঁধাঁর খোঁজে। ঝরনা বেশী দূরে নয়, ঝরনার কাছে ব'লেই হাঁহাঁ এই গুহাটিকে পছন্দ করেছিল।

হাঁহাঁ কিছুদূর অগ্রসর হয়েই শুনতে পেলে, তার ছোট ছেলে খিল-খিল ক'রে সকৌতুকে হাসছে!

হাঁহাঁ অবাক হয়ে ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলল, ধাঁধাঁর এত হাসির ঘটা কেন?

কিন্তু পাহাড়ে-পথের মোড় ফিরতেই হাঁহাঁ যা দেখলে, তা কেবল

আশ্চর্য নয়—কল্পনাতীত! তার পা আর চলল না, সে থ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল!

ঝর-ঝর ক'রে ঝ'রে পড়ছে ঝরনার রূপোলী ধারা। তার পাশেই পাহাড়ের উপরে হাঁটু গেড়ে ব'সে আছে ধাঁধাঁ। এবং তারও ওষ্ঠাধর দিয়ে ঝ'রে পড়ছে খুশিভরা কলহাস্যের ধারা!

কিন্তু তার সামনেই ওটা কি, ওটা কি?

হাঁহাঁ খুশি হবে, কি ভয় পাবে, বুঝতে পারলে না এবং নিজের চোখকেও সে বিশ্বাস করতে পারলে না,—হঠাৎ প্রচণ্ড স্বরে চেঁচিয়ে উঠে প্রকাণ্ড এক লম্ফ ত্যাগ করলে!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

খোকা-আগুনের আগমন

হাঁহাঁ যা দেখলে তা হচ্ছে এই:

পাহাড়ের এক অংশ সিঁড়ির মতন ধাপে ধাপে উপরে উঠে গিয়েছে। এবং সেই সব ধাপ দিয়ে লাফাতে লাফাতে ও ঝর্ঝর-গীত গাইতে গাইতে নেমে আসছে ছোট্ট একটি ঝরনা,—শিশুর মতন সকৌতুকে! অস্তোন্মুখ সূর্যের রঙিন আলো তার নাচের ভঙ্গীর সঙ্গে ঝলমল ক'রে উঠছে।

ডানপাশে পাহাড়ের কতক-সমতল একটা জায়গায় ব'সে আছে ধাঁধাঁ, তার সামনেই একরাশ শুকনো ঘাস ও লতাপাতা—ঝোড়ো বাতাসে উড়ে এসে সেখানে জড়ো হয়েছে।

সর্বপ্রথমে হাঁহাঁ দেখলে, সেই শুকনো ঘাস লতাপাতাগুলোর উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে আশ্চর্য একটা আগুনের ঢেউ! হাঁহাঁর মনে হ'ল, দূর-অরণ্যের দিকে তাকিয়ে এতক্ষণ সে আকাশের কোল-জোড়া

যে বিরাট দাবানল দেখছিল, এই ছোট্ট আগুনটা যেন তারই নিজের খোকা। ছুটোছুটি-খেলা খেলতে খেলতে সে যেন বাপের কাছ থেকে এখানে পালিয়ে এসেছে!

কিন্তু সে দাবানলকেই দেখেছে—বিরাট রূপ ধ'রে যে আকাশকে গিলে ফেলতে চায়, বাতাসকে তাতিয়ে তোলে, ফল-মূলের লোভে বড় বড় অরণ্যকেই গ্রাস ক'রে ফেলে, বনের জীব-জন্তুদের পিছনে পিছনে বিষম ধমক দিতে দিতে তাড়া ক'রে আসে! একটু-খানিক জায়গায় এমন খোকা-আগুনকে হাঁহাঁ কোন দিন নাচতে দেখেনি!

একটু আগেই সে দাবানলকে দেখে ভেবেছিল, 'ওর খানিকটা যদি আমার হাতে পাই, তাহ'লে রাতের অন্ধকারকে আর সমস্ত জীবজন্তুকে আমি জব্দ ক'রে দিতে পারি!'

এখন ভাবলে, এই তো আগুন-খোকাকে হাতে পেয়েছি! এখন আমি যদি একে ধ'রে ফেলি?

কিন্তু পর-মুহূর্তেই আর এক স্বপ্নাতীত দৃশ্য দেখে সে ভয়ানক চমকে উঠল।

তাঁর ছেলে ধাঁধাঁ ওখানে দুই হাঁটু গেড়ে ব'সে ও কী করছে?

ধাঁধাঁর দুই হাতে দুটো ছোট ছোট গাছের ডাল। সে মহা আনন্দে খিলখিল ক'রে হাসতে হাসতে ডালের উপরে ডাল রেখে ঘষছে, আর যে লতা-পাতা-ঘাসগুলো তখনো জ্বলেনি, সেগুলোও দপ-দপ ক'রে জ্ব'লে উঠছে!

হাঁহাঁর চোখ কি ভুল দেখছে? না, তা তো নয়! সত্যসত্যই ধাঁধাঁ নতুন নতুন খোঁকা-আগুন সৃষ্টি করছে যে! তার ছেলের এত শক্তি!

এই দেখেই হাঁহাঁ বিপুল উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠে লম্ফত্যাগ ক'রেছিল!

তার পরেই সে তীরবেগে দৌড়ে সেইখানে গিয়ে ধুপ ক'রে ব'সে পড়ল এবং তাড়াতাড়ি আগ্রহ-ভরে আগুনকে দুইহাতে ধরতে গেল—

এবং সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ ক'রে সেখানে থেকে ছিটকে দূরে

স'রে এল।

অ্যাঃ! এই খোকা-আগুনও এত জোরে কামড়ে দেয়!

হাঁহাঁ খানিকক্ষণ সভয়ে জ্বলন্ত আগুনের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর দুই হাত ঝাড়তে ঝাড়তে ডাকলে, 'ধাঁধাঁ!'

—'বাবা!'

—'খোকা আগুনকে কোথায় পেলি?'

ধাঁধাঁ তার হাতের ডাল দুটো তুলে দেখালে। হাঁহাঁ তার কাছে গিয়ে অতি-কৌতূহলে ডাল দুটো নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল। সে আগে যে দেশে ছিল সেখানে এ-জাতের গাছের ডাল দেখেনি। বুঝলে, এ হচ্ছে কোন নতুন গাছের ডাল।

শুধোলে, 'এ ডাল কোথায় পেলি?'

ধাঁধাঁ আঙুল দিয়ে পাহাড়ের একটা গাছ দেখিয়ে দিলে।

সেইদিকে এগিয়ে গিয়ে দেখে হাঁহাঁ বুঝলে, হ্যাঁ, এ নতুন গাছই বটে!

তারপর ছেলের কাছ থেকে যে আশ্চর্য বিবরণ সংগ্রহ করলে সংক্ষেপে তা হচ্ছে এই:

ধাঁধাঁ নিজের মনে এখানে খেলা করছিল। হঠাৎ তার কি খেয়াল হয়, ঐ গাছের দুটো ডাল ভেঙে পরস্পরের সঙ্গে ঠোকাঠুকি ও ঘষাঘষি করতে থাকে, আর হঠাৎ অম্‌নি আগুনের ফিনকি দেখা দেয়।

হাঁহাঁ ছেলের কথা শুনতে শুনতে ফিরে তাকিয়ে দেখে, ঝরনার পাশে আর খোকা-আগুনের কোন চিহ্নই নেই! কোথায় পালালো সে?

দ্রুতপদে ছুটে এসে দেখে, সেখানে আগুনের বদলে প'ড়ে রয়েছে খালি একরাশ ছাই!

হাতে পেয়েও আবার যাকে হারালে, তার শোকে হাঁহাঁ মাটির উপরে হতাশভাবে ব'সে পড়ল, কাঁদো-কাঁদো মুখে!

ধাঁধাঁ বাপের দুঃখের কারণ বুঝলে। সে তখনি হাঁহাঁর হাত থেকে ডালদুটো নিয়ে মাটির উপরে ব'সে আবার ঠুকতে ও ঘষতে লাগল।

খানিক পরেই আগুনের ফিনকি দেখা দিলে, কিন্তু পলাতক খোকা-আগুন আর ফিরে এল না! ধাঁধাঁ এর রহস্য ধরতে পারলে না। সে জানে না যে একটু আগে দৈবগতিকে এখানে কতকগুলো শুকনো ঘাস ও লতা-পাতা ছিল ব'লেই ফিনকির ছোঁয়ায় আগুন সৃষ্টি করেছিল!

কিন্তু ধাঁধাঁর চেয়ে তার বাপ হাঁহাঁর বুদ্ধি বেশী হওয়াই স্বাভাবিক। দুঃখিতভাবে ব'সে ব'সে ছেলের বিফল চেষ্টা দেখতে দেখতে ধাঁ ক'রে তার মাথায় এক বুদ্ধি জাগল। তাড়াতাড়ি উঠে প'ড়ে এদিক-ওদিক থেকে সে এক রাশ শুকনো লতাপাতা ও ঘাস কুড়িয়ে আনলে। তারপর যেখানে তার ছেলে আগুনের ফিনকি জাগাচ্ছে সেইখানেই সেইগুলি নিয়ে রেখে দিলে। অল্পক্ষণ পরেই হ'ল আবার খোকা-আগুনের আবির্ভাব!*

আজ বিশ-শতাব্দীর তোমরা হয়তো ভাবছ, আগুনের ফিনকির মুখে শুকনো লতা-পাতা রাখলে যে জ্ব'লে উঠবে, এ সোজা বুদ্ধি তো খুব সহজেই সকলের মনে আসে! হাঁহাঁ তো আর মায়ের কোলের খোকা নয়, এটুকু সে আন্দাজ ক তে পারবে না কেন?

কিন্তু এই উপন্যাস পড়তে পড়তে তোমরা সর্বদাই মনে রেখো, আমি অজানা অনেক হাজার বৎসর আগেকার গল্প বলছি। আজকের পাঁচ বৎসর বয়সের শিশুরা যা জানে, তখনকার বুড়োমানুষদেরও সে জ্ঞান ছিল না। বিশেষ এ জাতের গাছের ডালে ডালে ঘষাঘষির ফলে আগুনের জাগরণ হয়, এবং তার সাহায্যে শুকনো লতা-পাতা-ঘাসে স্থায়ী আগুনের উৎপত্তি হয়, এ জ্ঞান এখনকারও বনমানুষ বা গরিলা প্রভৃতির নেই। বেশী কথা কি, তারা আজও আগুন ব্যবহার করতে শেখেনি। তারা আজও পৃথিবীর আদিম অন্ধকারেই বাস করছে।

আমাদের সুদূর অতীত যুগের পূর্বপুরুষদের জন্ম, সেই আদিম অন্ধকারের গর্ভেই বটে, কিন্তু তারা মানুষ ব'লেই মস্তিষ্ক চালনা ক'রে বুঝতে পেরেছিল যে, আগুনের ফিনকি শুক্‌নো লতা-পাতাকে

* আজও বহু অসভ্য মানুষ এই উপায়েই আগুন জ্বালে। ইতি—লেখক

প্রজ্জ্বলিত করতে পারে। সেই অন্ধকার-যুগের এই আবিষ্কার একালের যে কোন বড় আবিষ্কারেরও চেয়ে বড়। মানুষের মাথায় ঐ-শ্রেণীর মস্তিষ্ক যদি না থাকত, তাহ'লে আজ তোমাকে আমাকে গরিলা, ওরাং ও শিম্পাঞ্জীর মত গাছের ডালে-ডালেই নগ্নদেহে লাফালাফি ক'রে বেড়াতে হ'ত।...

শুকনো লতা-পাতা-ঘাসে আবার সেই আগুনের শিখা নেচে নেচে উঠল, হাঁহাঁ অমনি প্রচণ্ড আনন্দে ধাঁধাঁকে কাঁধে তুলে নিয়ে নৃত্য করতে করতে চেঁচিয়ে উচ্ছ্বসিত স্বরে বললে, 'ধাঁধাঁ, ধাঁধাঁ, ধাঁধাঁ! তুই দেবতা, আমার ঘরে শিশু হয়ে এসেছিস্। তোর মন্ত্রেই খুশি হয়ে আগুন-ভগবান আজ আমাকে দয়া করলেন।'

অনেকক্ষণ নৃত্য ক'রে হাঁহাঁর সাধ যখন মিটল, তখন সে ধাঁধাঁকে কোল থেকে নামিয়ে আগে সেই গাছের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর দেখে দেখে খুব ভালো দেখে গাছকয়েক ডাল ভেঙে নিয়ে বললে, 'ধাঁধাঁ রে, এগুলো নিয়ে কি হবে বুঝেছিস?'

ধাঁধাঁ বললে, 'উঁহু!'

—'এরা খোকা-আগুনকে ডেকে আনবে। খোকা-আগুন অন্ধকারকে বধ করবে।'

আলো দিয়ে যে মানুষ অন্ধকার জয় করতে পারবে, সে-যুগে এও একটা মস্তবড় কল্পনা। আজ বিদ্যুৎকে বন্দী ক'রে রাতকে তোমরা দিন ক'রে ফেলেছ, সেকালের রাত্রি-বিভীষিকা তোমরা কিছুতেই আন্দাজ করতে পারবে না! শহর নেই, ঘর-বাড়ি নেই, পাড়া-প্রতিবেশীর সাড়া নেই, কোথাও কোনরকম আলোর চিহ্ন নেই, হু-হু ক'রে কাঁদছে ভীরু বাতাস, মর্-মর্-মর্-মর্ ক'রে কঁকিয়ে উঠছে মহা-অরণ্য, হুঙ্কার তুলে বিজন বনের পথে বিপথে হানা দিচ্ছে রক্তলোভী ভয়াবহ জন্তুরা—এবং তাদের সকলকে ঢেকে শব্দমাত্রসার ক'রে রেখে চোখের সামনে বিরাজ করছে অনন্তরহস্যময় মৃত্যুর মতন ভীষণ, চিরমৌন, দয়ামায়াহীন পৃথিবীব্যাপী অন্ধকার—অন্ধকার—অন্ধকার।

তারই মধ্যে শীতার্ত রাতে কাঁপতে কাঁপতে ও দুশ্চিন্তায় কুঁকড়ে প'ড়ে প্রতি মুহূর্তে সাক্ষাৎ-মরণের স্বপ্ন দেখছে একটি অসহায় মানুষপরিবার! নিরেট আঁধারের কষ্টিপাথর ফুঁড়ে থেকে থেকে জ্ব'লে উঠছে আর নিবে যাচ্ছে কী ওগুলো? রোমশ গণ্ডার, গুহাভাল্লুক, নেকড়ে-বাঘের চোখ! শুকনো ঝরা-পাতার বিছানার উপর দিয়ে ক্রমাগত খড়মড় খড়মড় খড়মড় শব্দ জাগিয়ে যেন এগিয়ে আর এগিয়েই আসছে, কী ওটা রে? সর্পরাজ অজগর।

তখন বন্দুক জন্মায়নি, কোনরকম ধাতুতে গড়া অস্ত্রের কথাও কেউ জানেনা, মানুষের দুর্বল হাতের সম্বল কেবল লাঠি, পাথরের বর্শা, ছোরা-ছুরি! অন্ধকারের জন্যে তাও ছুঁড়ে আত্মরক্ষা করবার উপায় নেই, কারণ কারুকেই চোখে দেখা যায় না! কেবল জ্বলন্ত চক্ষু, স্পষ্ট পদশব্দ—এবং প্রায়ই অতর্কিতে ভয়ঙ্কর দন্তনখরের সাংঘাতিক স্পর্শ। ......তারপরেই হয়তো শোনা গেল, কোলের খোকার কাতর চিৎকার! মা আকুল হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল আঁধার-সমুদ্রের মধ্যে, কিন্তু খোকার বদলে হাতে পেলে শক্ত মাটির বুক! তার অন্ধকারে অন্ধ দৃষ্টি কিছুই খুঁজে পেলে না—নীরব অন্ধকারের গর্ভে খোকার কণ্ঠ চিরদিনের মত নীরব হয়ে গেল!...

আজকের আসন্ন সন্ধ্যায় পাহাড়ের উপরে সেই ভয়াল অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। বহুদূরের তাণ্ডব নৃত্যশালা ছেড়ে অরণ্যচারী দাবানলের শিখা যে এখানে এসে অন্ধকারদৈত্যকে হত্যা করতে পারবে না, হাঁহাঁ তা জানত। কাজেই সে সময় থাকতে সাবধান হয়ে ছেলের হাত ধ'রে গুহার দিকে ফিরতে লাগল।

হাঁহাঁ আকাশের দিকে তাকিয়ে এই ভাবতে ভাবতে অগ্রসর হচ্ছিল, ঐ সূর্য নিশ্চয়ই খুব ভালো ঠাকুর! মানুষকে তিনি ভালোবাসেন! তার অন্ধকার-শত্রুকে নিপাত করবার জন্যে তিনি রোজ সকালে পৃথিবীতে আসেন। কিন্তু সন্ধ্যে হ'লেই আবার পালিয়ে

যান কেন ?…

ঝরনার ঝির-ঝিরে গান ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল দূরে। বাতাসও ধীরে ধীরে যেন ঝিমিয়ে পড়ছে। অরণ্যও যেন মৌনব্রত অবলম্বন করবার চেষ্টা করছে।

পশ্চিমে রঙমহলের আলো ক্রমে ক্রমে নিভে যাচ্ছে। পাহাড়ের আনাচ-কানাচ থেকে নিশাচর পাখীদের নিদ্রাভঙ্গের সাড়া।

আচম্বিতে তীব্র এক আর্তরবে আকাশ যেন বিদীর্ণ হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে শোনা-গেল ক্রুদ্ধ গুহা-ভাল্লুকের ঘন ঘন গর্জন।

হাঁহাঁ তখনি বুঝতে পারলে, এ হচ্ছে তার বউ হুয়ার কান্না। গুহা-ভাল্লুক গর্জন করছে আর হুয়া কাঁদছে।

ধাঁধাঁ সভয়ে লাফ মেরে বাপের কাঁধের উপরে চ'ড়ে বসল। চক্‌মকি-পাথরের বর্শটা প্রাণপণে চেপে ধ'রে হাঁহাঁ গুহার দিকে ছুটল, ঝড়ের মত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভাল্লুক আর ভাল্লুক বউ

কাঁধে খোকা-ধাঁধাঁ, এক হাতে চকমকি-পাথরের বর্শা এবং আর-এক হাতে আগুন-গাছের ডালের গোছা,—হাঁহাঁ ধেয়ে চলেছে গুহার দিকে।

কী তার রুদ্র মূর্তি, কালভৈরবের কল্পনাও হার মানে। মাথার রুক্ষ কটা চুলগুলো ফণা-তোলা সাপের মত লাফিয়ে লাফিয়ে ছিটকে উঠছে, গায়ের বড় বড় লোমগুলো উত্তেজনায় সজারু-কাঁটার মতন থেকে থেকে খাড়া হয়ে উঠছে এবং স্বভাবত বন্য ড্যাবডেবে চোখদুটো আর বিকশিত হিংস্র দাঁতগুলো সাংঘাতিক ক্রোধে চকচকিয়ে উঠছে—

পুরাণে যে-সব ভীষণ দৈত্য-দানবের গল্প পড়া যায়, হাঁহাঁ যেন তাদেরই একজন! দারুণ আক্রোশে হাঁহাঁ ফুলে যুলে যেন দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে!

হাঁহাঁ প্রাণপণে ছুটছে বটে, কিন্তু আধুনিক মানুষের মত দ্রুত ছোটা তার পক্ষে সম্ভব নয়! কারণ তার পায়ের চেটো সমানভাবে মাটিতে পড়ে না, তাই হেলে-দুলে ট'লে ট'লে ছুটতে হচ্ছে তাকে।

সূর্যহারা অস্তাচলে মস্ত একখানা ব্যস্ত মেঘ এসে সমুজ্জ্বল রক্তাক্ত আকাশকে যেন কোঁৎ ক'রে গিলে ফেললে। পৃথিবীর শেষ আলোর আভাটুকুও যেন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল। দূরে বহুদূরে অরণ্যব্যাপী দাবানলের লক্ষ লক্ষ ক্রুদ্ধ শিখা তখনও তাথৈ-তাথৈ নৃত্য করছে বটে, কিন্তু সে আলো এখানকার অন্ধকারকে তাড়াতে পারে না।

গুহার কাছ বরাবর এসেই হাঁহাঁ দেখতে পেলে, পাহাড়ের নীচের দিক থেকে তার বড় ও মেজো ছেলে টুটু আর ঘটু চিৎকার করতে করতে বর্শা উঁচিয়ে তাড়াতাড়ি উপরে উঠে আসছে। হাঁহাঁ কতকটা নিশ্চিন্ত হ'ল. তা'লে গুহা-ভাল্লুকের সঙ্গে তাকে একা লড়াই করতে হবে না।

তারপরেই সে বিস্ফারিত চোখে দেখলে, গুহার ঠিক সামনেই ভয়ে দুই হাতে মুখ ঢেকে হুয়া হাঁটু গেড়ে ব'সে ঠক ঠক ক'রে কাঁপছে, এবং তার গলা দুইহাতে জড়িয়ে ধ'রে মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে আছে ছোট খুকী।......ওদিকে বেগে ছুটতে ছুটতে তাদের দিকে তেড়ে আসছে ভয়াবহ গুহা-ভাল্লুক—তার মস্ত-বড় দেহটা যেন পুরু অন্ধকার দিয়ে গড়া, আর তার অতি-তীব্র চক্ষু দুটো যেন অগ্নি দিয়ে তৈরি! তীক্ষ্ণ লম্বা লম্বা দাঁত খিঁচিয়ে মাঝে মাঝে হেঁড়ে মুখ তুলে সে চীৎকার ক'রে উঠছে, যেন কালো মেঘে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বাজ ডাকছে! ভাল্লুক তখন হুয়ার কাছ থেকে মাত্র চৌদ্দ-পনেরো হাত দূরে।

হঠাৎ হাঁহাঁর আবির্ভাবে ভাল্লুক থমকে দাঁড়িয়ে প'ড়ে আরো তেড়ে গর্জন ক'রে উঠল এবং তার উত্তরে হাঁহাঁর কণ্ঠেও জাগল আর এক বিষম গর্জন! হিংস্র জন্তুর সঙ্গে হিংস্র মানুষের গর্জনের পাল্লা! এবং

সে-যুগে মানুষের গর্জনও জন্তুদের গর্জনের চেয়ে কম-ভয়ানক ছিল না!

তুচ্ছ মানুষ তাকে চেঁচিয়ে ধমক দিতে চায় দেখে ভাল্লুক ভারি খাপ্পা হয়ে উঠল। সে হুয়াকে ছেড়ে হাঁহাঁর দিকে এগুতে লাগল মনে-মনে এই ভাবতে ভাবতে—'রোস্ হতভাগা, আগে মট ক'রে তোর ঘাড় ভাঙি, তারপর তোর বউ আর মেয়েকে ধ'রে পেটে পুরে হজম করতে কতক্ষণ?'

হাঁহাঁ চট ক'রে ধাঁধাঁকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিয়ে বললে, 'যা, আমার পিছনে লুকিয়ে থাক! তারপর সে ভাল্লুকের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে, হাতের বর্শা মাথার উপরে জোর-মুঠোয় চেপে ধ'রে খুব সাবধানে পাঁয়তাড়া কষতে লাগল।

সেকালকার সেই অতিকায় গুহা-ভাল্লুকের সুমুখে হাঁহাঁকে কী নগণ্যই দেখাচ্ছে! একালের ভাল্লুকেরও সামনে কোন আধুনিক মানুষই তুচ্ছ একটা চকমকি-পাথরের ভঙ্গুর বর্ষা নিয়ে এমন বুক ফুলিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়াতে সাহস করত না। কিন্তু সে-যুগের মানুষকে বনে বনে সর্বদাই ঘুরে বেড়াতে হ'ত বিশালকায় রোমশ হাতি, রোমশ গণ্ডার, ভাল্লুক ও ভয়ানক সব বন্য জন্তুর সঙ্গে। তাদের অধিকাংশই ছিল মানুষের চেয়ে আকারে ও বলবিক্রমে অনেক বড়, কিন্তু ঐ-সব হিংস্র বন্যজন্তুও ছিল তার খাদ্য। মানুষ তখন চাষবাষ করতে শেখেনি, মাংস না খেতে পেলে তার জীবনধারণ করাই চলত না। যদিও শিকার করতে গিয়ে মানুষদের প্রায়ই বন্যজন্তুদের উদরে স্বশরীরে প্রবেশ করতে হ'ত, তবু ভাল্লুক প্রভৃতিকে দেখলে আজ নগরবাসী আমরা যতটা ভয় পাই, সেকালকার বনবাসী মানুষরা ততটা পেত না। জানোয়ারদের তারা মনে করত, বিপদজনক খাবার মাত্র!

ভাল্লুক পায়ে পায়ে এগুচ্ছে, হাঁহাঁর হাতের বর্শার দিকেই তার উদ্বিগ্ন তীক্ষ্ণদৃষ্টি! একবার আর একটা দুষ্ট মানুষ ঐ-রকম একটা জিনিস ছুঁড়ে তাকে মেরেছিল এবং পায়ে চোট খেয়ে তাকে যে দুই-তিন মাস খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে ভাল্লুক-সমাজে হাস্যাস্পদ হ'তে হয়েছিল, সে-

গভীর লজ্জার কথা আজও সে ভুলতে পারে নি। ভাল্লুক বুঝে নিলে, ঐ জিনিসটাকে সামলাতে পারলেই যুদ্ধে জয় অনিবার্য। নইলে মানুষ তো ছার, এক চড়েই কুপোকাৎ হয়!

হাঁহাঁ বর্শা তুলে ভাবছে, ভাল্লুকটা আরো কাছে এলে তার কোনখানটায় আঘাত করা উচিত, এমন সময়ে হঠাৎ তার দুই পাশে এসে দাঁড়াল টুটু আর ঘটু! বয়স চব্বিশ ও বিশ—বিরাট-স্কন্ধ, কবাট-বক্ষ, সিংহ-কটি, দীর্ঘ-বাহু, লৌহ পেশী! শক্তিচঞ্চল যৌবনের নিখুঁত প্রতিমূর্তি। তারাও সুমুখের দিকে বাঁ পা বাড়িয়ে বুক চিতিয়ে চকমকি-বর্শা শূন্যে তুলল! পাহাড় ভেঙে এতখানি পথ ঊর্ধ্বশ্বাসে পার হ'য়ে এল, তবু তারা একটুও হাঁপাচ্ছে না—এমনি তাদের দম!

ভাল্লুক থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সে গোঁয়ারও নয়, নির্বোধও নয়। ভাবতে লাগল, শত্রুর সংখ্যা তিনজন, আর কি অগ্রসর হওয়া উচিত?

আচম্বিতে তার নাকের ডগায় এসে পড়ল ঠকাস্ ক'রে একটা বড় পাথর! সে আর দাঁড়াল না, কোনদিকে তাকালেও না, বিশ্রী একটা গর্জন ক'রেই চটপট দৌড়ে পাহাড়ের উপরে উঠতে লাগল এই ভাবতে ভাবতে, পাথরটা ছুঁড়লে কোন বদমাইস? ইস, নাকটা থেবড়ে গেল নাকি?

পাথরটা ছুঁড়েছিল হুয়া। স্বামী আর ছেলেদের দেখে তার সাহস ফিরে এসেছে।

হাঁহাঁ হাঁপ ছেড়ে দেখলে, ভাল্লুকটা ক্রমেই অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে।

অকস্মাৎ আরো উপর থেকে আর একটা গর্জন শোনা গেল। অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে যেন আর-একটা চলন্ত অন্ধকার নীচে নেমে আসছে! ভাল্লুকী?

হাঁহাঁ সবাইকে ইশারা করলে, গুহার ভিতরে গিয়ে ঢুকতে।

পৃথিবীতে তখন আলোকের মৃত্যু হয়েছে। গাছে গাছে ভীত বাতাসের কান্না। বনে বনে কোন জন্তুর নির্দয় শিকার-সঙ্গীত, কোন জন্তুর কাতর আর্তনাদ। ঝোঁপে ঝোঁপে জ্বলন্ত চক্ষু—দিকে দিকে আতঙ্কের আবছায়া।

হাঁহাঁ এধারে-ওধারে তাকাতে তাকাতে নিজেও গুহার ভিতরে প্রবেশ করল। এত বিপদেও বাঁ-হাতে সে আগুন-কাঠের গোছা ঠিক চেপে ধরে আছে!

ওদিকে গুহার খানিক উপরে ভাল্লুকের সঙ্গে দেখা হ'ল ভাল্লুকীর।

ভাল্লুকী নিজের নাক দিয়ে ভাল্লুকের আহত রক্তাক্ত নাক একবার শুঁকলে। তার মুখ দিয়ে কি-একটা শব্দ বেরুলো— ভাল্লুক-ভাষায় বোধ হয় জিজ্ঞাসা করলে, 'এ কী কাণ্ড?'

ভাল্লুকও যেন লজ্জিতভাবে কি-একটা শব্দ করলে! বোধহয় বললে, 'গিন্নী, মানুষের হাতে মার খেয়েছি।'

ভাল্লুকী স্বামীর নাকের রক্ত চেটে দিতে লাগল, সস্নেহে।

খানিকক্ষণ কাটল। ভাল্লুক অস্ফুট গর্জন ক'রে যেন বললে, 'চল গিন্নী, আবার আমরা গুহার দিকে যাই। পাজি মানুষগুলো অন্ধকারে দেখতে পায় না। এই ফাঁকে প্রতিশোধ নিয়ে আসি।' তারা আবার নীচে নামতে লাগল।

হাঁহাঁদের উপরে তাদের রাগের আর একটা কারণ ছিল। দিন-তিনেক আগে হাঁহাঁদের গুহা ছিল ভাল্লুকদেরই গুহা। ভাল্লুকেরা দিন-দুয়েকের জন্যে দূর-বনে শিকার করতে গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখে, তাদের বাসা ঘৃণ্য মানুষদের হস্তগত হ'য়েছে! এমন অত্যাচার কে সইতে পারে?

আকাশ যখন কষ্টিপাথরের মতন কালো-কুচকুচে, সন্ধ্যাবেলাকার সেই মেঘখানা যখন আরো নিবিড় হয়ে পাহাড়ের উপর ছুটে আসছে এবং সমস্ত অরণ্য যখন জানোয়ারদের বীভৎস-চ্যাঁচামেচি ও হানাহানিতে পরিপূর্ণ, ভাল্লুক ও ভাল্লুকী তখন পা টিপে টিপে গুহার দরজার কাছে

এসে হাজির হ'ল। চন্দ্রহীন রাত্রি বনজঙ্গল পাহাড়কে নিজের কৃষ্ণাম্বরীর অঞ্চলে একেবারে ঢেকে ফেলেছিল বটে, কিন্তু জানোয়ারি চোখ আঁধার ফুঁড়েও দেখতে পায়।

ভাল্লুক দু' পা এগিয়ে কান পেতে শুনলে, মানুষগুলো কি করছে?

গুহা স্তব্ধ। সবাই নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে।

আরো দু' পা এগিয়ে গিয়েই সে কিন্তু থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল। এবারে যেন কেমন একটা অদ্ভুত শব্দ শোনা যাচ্ছে—যেন কাঠে কাঠে ঘষাঘষির শব্দ, সঙ্গে সঙ্গে গুহার অন্ধকার যেন থেকে থেকে আলো-হাসি হাসছে।

ঘোঁৎ ঘোঁৎ ঘোঁৎ ঘোঁৎ! এমনি শব্দ করতে করতে গুহা-ভাল্লুক বিপুল বিস্ময়ে আবার দু' পা পিছিয়ে এল! এতকাল ভাল্লুকীকে নিয়ে সে এই গুহায় বাস করেছে, কিন্তু ওখানকার অন্ধকার তো কখনো এমন বেয়াড়া বেমক্কা হাসি হাসেনি!

স্বামীর রকম-সকম দেখে ভাল্লুকীও এগিয়ে এসে থ হয়ে গেল। এ-সব কী!

আচম্বিতে অন্ধকার অত্যন্ত অসম্ভব-রকম আলো-হাসি শুরু ক'রে দিলে—এ হাসি আর যেন থামতেই চায় না! গুহার দেওয়ালে দেওয়ালে, ছাদের তলায়, মেঝের উপরে হাসি খালি নেচে নেচে খেলে বেড়াতে লাগল। এবং ভাল্লুক শাস্ত্র-বহির্ভূত এমন আজগুবি ব্যাপার দেখে হতভম্ব স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। কী যে তারা করবে, ভেবেই পায় না!

তারপরেই চকিতে একরাশি আলো-হাসি শূন্যে অজস্র আগুন-ফুল ঝরিয়ে ফুলঝুরির মত ভাল্লুক ও ভাল্লুকীর সর্বাঙ্গে এসে পড়ল! এ হাসি যে শত শত বিছার মত কামড়ে দেয়—গা, হাত, পা, মুখ জ্বলিয়ে দেয়! বিকট চিৎকারে চতুর্দিক কাঁপিয়ে তারা বিষম ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেল!

গুহার ভিতরে তখন হাঁহাঁ বউ-ছেলে-মেয়েদের হাত-ধরাধরি

ক'রে মহা উল্লাসে তাণ্ডব-নৃত্য আরম্ভ ক'রে দিয়েছে!

মানুষের সঙ্গে আজ থেকে হ'ল আগুনের মিতালী। আগুন বন্ধুর মত মানুষের হাতের খেলনা হয়ে তাকে বিশ্বজয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে চলল।

কেবল কি বন্ধু? অগ্নি আজ থেকে হ'ল মানুষের দেবতা। হিন্দু ও পার্সীরা আজও অগ্নিদেবের পূজার মন্ত্র ভোলেনি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আদিম কালের বরযাত্রী

খোকা আগুনকে ঘরে পেয়ে হাঁহাঁর আনন্দের আর সীমা নেই! আজ তার মনে হচ্ছে, সমস্ত পৃথিবীকে সে শাসন করতে পারবে। গুহা-ভাল্লুক শায়েস্তা হয়েছে, এইবারে খোকা-আগুনকে নিয়ে অন্যান্য শত্রুদেরও জব্দ করতে হবে।

কিছুদিন যেতে-না-যেতেই খোকা-আগুনকে বরাবর বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে হাঁহাঁ বুদ্ধি খাটিয়ে একটা ফন্দি বার ক'রে ফেললে।

তাদের গুহার মুখেই ছিল একটা দু'হাত গভীর ও ছ'-সাত হাত চওড়া গর্ত। হাঁহাঁ চারিদিক থেকে শুকনো ঘাস পাতা ও কাঠ কুটো-এনে গর্তের অনেকখানি ভরিয়ে ফেললে এবং তার ভিতরেই করলে আবার খোকা-আগুনের সৃষ্টি। দেখতে দেখতে খোকা-আগুন মস্ত-বড় হয়ে উঠল!

হাঁহাঁ ছেলে-মেয়ে-বউকে হুকুম দিলে, যে যখন গুহার ভিতরে থাকবে, মাঝে মাঝে যেন গর্তে দু-একখানা কাঠ ফেলে দিতে ভুলে না যায়। এই উপায়ে গর্তের মধ্যে অগ্নি-দেবতাকে সে সর্বদাই বন্দী ক'রে রেখে দিলে।

সন্ধ্যার পরে গুহার ভিতরে-বাহিরে জাগে আঁধার-দানব, তবু হাঁহাঁর আর ভয় হয় না। কারণ গুহার মধ্যে কুণ্ডে যখন অগ্নি-দেবতা নাচতে নাচতে রাঙা হাসি হাসতে থাকেন, আঁধার-দানব তখন বাইরে পালিয়ে যেতে পথ পায় না।

কেবল আঁধার-দানব নয়, দুষ্টু শীতও দস্তুরমত টিট্ হয়ে গেছে! একবার গুহায় ঢুকে কুণ্ডের পাশে এসে বসতে পারলেই হ'ল,—ব্যাস্, শীতের কাঁপুনি অমনি বন্ধ! কী মজা! কী আরাম!

গুহাবাসী ভাল্লুক-ভাল্লুকী সেদিনকার অপমান সহজে হজম করতে রাজি হয়নি। ক্ষুদ্র মানুষের এত-বড় স্পর্ধার কথা ভাল্লুক-সমাজে কে কবে শুনেছে? এর প্রতিশোধ না নিলেই নয়! বিশেষত সেইদিন থেকে ভাল্লুকীও যেন তার স্বামীর প্রতি কতকটা তাচ্ছিল্য প্রকাশ করতে শুরু করেছে! ভীষণ ভাল্লুক-বংশে জন্মগ্রহণ ক'রেও যে দুর্বল-মানুষের কাছ থেকে তাড়া খেয়ে লম্বা দেয়, সে স্বামী নামেরই যোগ্য নয়, ভাল্লুকীর মনে বোধহয় এই ধরনের একটা ধারণা জন্মেছে; কারণ ভাল্লুক ধমক দিলে ভাল্লুকীও আজকাল দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উল্টো-ধমক দিতে ছাড়ে না। এমন অবাধ্য বউ নিয়ে কি ঘর-সংসার করা চলে? চটপট এর একটা প্রতিবিধান না করলেই নয়!

গুহা-ভাল্লুক খুব-একটা ঘুটঘুটে রাতে পা টিপে টিপে গুহার কাছে খবরাখবর নিতে এল। মনে মনে এঁচে এসেছিল, একটু যদি ফাঁক পায়, তাহ'লে গুটিকয় চপেটাঘাত ক'রে একটা মানুষেরও মুণ্ড আর আস্ত রেখে আসবে না—হুঁ!

কিন্তু সেদিনও গুহার কাছে গিয়ে দেখলে, ভিতরকার অন্ধকার ঠিক সেদিনকার মতই বিদঘুটে হাসি হাসছে! খুব-উঁচু হয়ে উঁকি-ঝুঁকি মেরে ভাল্লুক মহাবিস্মিতের মত দেখলে, গুহার মুখেই দাউ-দাউ ক'রে আগুন জ্বলছে! বনের দাবানলের সঙ্গে তার পরিচয় আছে, গুহার দরজায় এসে প্রহরী হয়েছে সেইই! ও-পাহারা ভেদ ক'রে ভিতর ঢোকা অসম্ভব বুঝে ভাল্লুক আবার স'রে পড়ল মানে মানে।

কি জানি বাবা, সেদিনকার মত মানুষগুলো আবার যদি আগুনকে লেলিয়ে দেয়!

আরো কয়েকবার গুহার কাছে গিয়ে সে দেখে এল সেই একই অগ্নিকাণ্ডের ব্যাপার। ভাল্লুক লুপ্ত গৌরবকে আর উদ্ধার করতে পারলে না। ভাল্লুকীর ধমক খেয়েও মুখ বুঁজে থাকে।

মানুষের কাছে বনের পশু সেই যে জব্দ হ'তে আরম্ভ করলে আজও তার সমাপ্তি হয়নি। তবে তখন জ্বলত কেবল কাঠের আগুন, আর এখনকার আগুন জ্বলে বন্দুকের মুখে।

আরো কিছুদিন যেতে-যেতেই আর এক অপূর্ব আবিষ্কার। এবং এবারকার আবিষ্কারের জন্যে বাহাদুরি নিতে পারে, ধরতে গেলে হাঁহাঁর বউ হুয়াই। ব্যাপারটা একটু খুলেই বলি।

প্রথম পরিচ্ছেদেই বলেছি, হাঁহাঁ হচ্ছে 'নিয়ান্‌ডের্টাল' জাতের মানুষ এবং এজাতের মানুষরা চাষ-বাস করতে শেখেনি। তারা জীবন-ধারণ করত প্রধানত শিকার ক'রে এবং যেদিন শিকার জুটত না, ক্ষুধা মেটাতো ফল-মূল খেয়ে।

একদিন হাঁহাঁর বরাত খুব ভালো। টুটু আর ঘটু দুই ছেলের সঙ্গে বনে বেরিয়ে শিকার ক'রে আনলে মোটাসোটা মস্ত এক বুনো মহিষ। মহিষটাকে দেখেই হুয়া, তার বড় মেয়ে নিনি ও ছোট খোকা ধাঁধাঁ আনন্দে নৃত্য করতে লাগল। কারণ এমন একটা প্রকাণ্ড মহিষের মাংস তাদের পেটের ভাবনা ভুলিয়ে দেবে অন্তত দিন-কয়েকের জন্যে। সেই আদিম যুগের মানুষরা মাংস কোন জন্তুর এবং তা পচা কি টাটকা, এ-সব বাছ-বিচার করত না একটুও! বহুৎ দুঃখে, বহু দিনের পর এক-একটা বড় শিকার মেলে। মাংস টাটকা রাখবার উপায় তখন কেউ জানত না এবং এমন দুর্লভ জিনিস পচা ব'লে ফেলে দেওয়াও ছিল অসম্ভব। সাত-আটদিনের পচা মাংসও তখন যে কেউ খেত না, এ-কথাও জোর ক'রে বলা যায় না!

হুয়া আর নিনি মায়ে-ঝিয়ে চকমকি পাথরের ছুরি নিয়ে মাংস

কাটতে ব'সে গেল মহা-উৎসাহে এবং খোকা ধাঁধাঁ করতে লাগল তাদের সাহায্য। তখন থেকেই মেয়েরা গৃহস্থালীর এ-সব কাজ ক'রে নিয়েছিল নিজস্ব।

সেদিন একটু শীত প'ড়েছিল। হাঁহাঁ অগ্নিকুণ্ডের কাছে গিয়ে মেঝের উপরে লম্বা হয়ে শুয়ে প'ড়ে কিঞ্চিৎ আরামের চেষ্টা করতে লাগল।

টুটু আর ঘটুর জোয়ান বয়স, তাদের এখনি বিশ্রামের দরকার হ'ল না। তারা গুহার বাহিরে গিয়ে চকমকি পাথরের অস্ত্র তৈরি করতে বসল। তখন লোহা বা অন্য কোন ধাতুর অস্তিত্বও কেউ জানত না। চকমকি পাথরের সাহায্যেই চকমকি পাথর কেটে বা ঘ'ষে অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করা হ'ত। আজ কত হাজার বৎসর পরে পৃথিবীর মাটি খুঁড়ে সেই-সব অস্ত্রশস্ত্র আবার খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। যাদুঘরে গিয়ে তোমরা সে-সব দেখে আসতে পারো স্বচক্ষে।

সংসারের কর্তাকে সব-চেয়ে ভালো খাবার দেবার রীতি প্রচলিত হয়েছিল তখন থেকেই। নইলে সে-যুগের অসভ্য কর্তারা স্ত্রীর মাথায় মারত ডাণ্ডা, আর এ-যুগের কর্তারা মনের রাগ জানিয়ে দেন কেবল মুখভার ক'রেই, নিতান্ত সভ্যতার অনুরোধেই!

খুব-বড় ও খুব-ভালো একখণ্ড মাংস নিয়ে হুয়া চলল স্বামীকে খেতে দিতে। মাংস না রেঁধেই খেতে দেওয়ার কথা শুনে তোমরা কেউ অবাক হয়ো না। মনে রেখ, গৃহস্থালীতে বশীভূত আগুনের সৃষ্টি হয়েছে তখন সবে। আগুন দিয়ে যে আবার রান্না হয়, এটা ছিল তখন কল্পনাতীত।

গুহামুখে অগ্নিকুণ্ডের পাশ দিয়ে যাতায়াতের পথ ছিল অতিশয় সংকীর্ণ। সেইখান দিয়ে যেতে গিয়ে হুয়া হঠাৎ প'ড়ে গেল। নিজেকে কোন রকমে আগুনের কবল থেকে সামলে নিলে বটে, কিন্তু তার হাত ফস্কে মাংসটা পড়ল গিয়ে একেবারে জ্বলন্ত কুণ্ডের মধ্যে।

হাঁহাঁ ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।

—'করলি কি বৌ! অমন মাংসটা নষ্ট করলি?'

হুয়া তাড়াতাড়ি উঠে ব'সে ভয়ে-ভয়ে অপ্রতিভভাবে বললে, 'আমাকে মাফ কর!' তারপর দুই খণ্ড কাঠ দিয়ে মাংসটা অগ্নিকুণ্ডের গর্ভ থেকে তোলবার চেষ্টা করতে লাগল।

হাঁহাঁ বললে, 'থাক, আর তুলে কাজ নেই। ও মাংস নষ্ট হয়ে গেছে, আমি খাব না।'

হুয়া বললে, 'হোক-গে নষ্ট! ও-মাংস আমিই খাব, তোমাকে ভালো মাংস এনে দিচ্ছি।'

হাঁহাঁ আবার শুয়ে পড়ল। খানিকক্ষণ চেষ্টার পর হুয়া মাংসটাকে আগুনের ভিতর থেকে উদ্ধার করলে। তারপর সেটাকে সেইখানে রেখে স্বামীর জন্যে নতুন মাংস আনতে ছুটল।

অল্পক্ষণ পরেই হাঁহাঁ তার খাবার পেল। এবং হুয়াও স্বামীর পাশে ব'সে সেই আধ-পোড়া মাংসের উপরে মারলে এক কামড়।

দাঁত দিয়ে খানিকটা মাংস ছিঁড়ে নিয়ে চিবোতে চিবোতে হুয়া বিস্মিত স্বরে বললে, 'ওগো!'

হাঁহাঁর বড় বড় দাঁতগুলো তখন মড়-মড় শব্দে হাড় চিবোচ্ছিল। জড়িত স্বরে সে বললে, 'কি?'

—'এই মাংসটা একটু খাবে?'

—'ধেৎ!'

—'না, একটু খেয়ে দেখ! কী চমৎকার লাগছে!'

—'বাজে কথা!'

—'এক টুক্‌রো চিবিয়ে দেখ! এমন মাংস কখনো খাও নি!'

—'হাঁহাঁও খাবে না, হুয়াও ছাড়বে না! স্ত্রীর আবদারে বাধ্য হ'য়ে শেষটা সে অত্যন্ত নারাজের মত এক টুকরো আধ-পোড়া মাংস নিয়ে চেখে দেখলে। সঙ্গে-সঙ্গে তার মুখ-চোখের ভাব হয়ে গেল অন্যরকম!

হুয়া বললে, 'কি?'

—'আশ্চর্য!'

—'চমৎকার নয় ?'

—'আর-একটু দে !'

হুয়া দাঁত দিয়ে আর এক টুকরো মাংস ছিঁড়ে নিজের হাতে স্বামীর মুখে পুরে দিলে। হাঁহাঁ তারিয়ে তারিয়ে চিবোতে চিবোতে অভিভূত স্বরে বললে 'খাসা !'

হুয়া বললে, 'কাল থেকে আমি এইরকম মাংসই খাব !'

হাঁহাঁ বললে, 'কাল থেকে কেন ? আমার এই মাংসটা আজকেই ঐখানে ফেলে দে দেখি !'

হুয়া আবার অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে হাঁহাঁর মাংস ফেলে দিলে। কিছুক্ষণ পরে দুই খণ্ড কাঠের সাহায্যে সেটাকে তুলে নিয়ে হাঁহাঁর হাতে দিয়ে বললে, 'চেখে দেখ !'

হাঁহাঁ সেই মাংসের খানিকটা মুখে পুরে উত্তেজিত স্বরে বললে, 'চমৎকার, চমৎকার ! আগুন-ঠাকুরের জয় হোক ! হুয়া, আয় আমরা দেবতাকে গড় করি !'

হাঁহাঁ এবং হুয়া সেই অগ্নিকুণ্ডের সামনে মাটিতে মাথা রেখে সানন্দে প্রণাম করলে ! অগ্নিদেবতা কেবল শত্রুর কবল থেকে ভক্তকে রক্ষা করেন না, কেবল আঁধার-দানবকে দূরে তাড়িয়ে দেন না, সেইসঙ্গে উদরের খোরাককেও সুধার মতন মধুর ক'রে তোলেন। না-জানি দেবতার আরো কত গুণ আছে !

হাঁহাঁ সানন্দে চিৎকার ক'রে ডাকলে, 'ওরে টুটু, ঘটু, নিনি, ধাঁধাঁ ! আয়রে তোরা সবাই ! নতুন খাবার খাবি আয় !'

সেইদিন থেকে হ'ল মানুষের গৃহস্থালীতে রন্ধন-শিল্পের আবিষ্কার ! সাধারণ জানোয়ারদের শ্রেণী ছেড়ে মানুষ উঠল আর-এক ধাপ উঁচুতে।

হাঁহাঁ আর হুয়ার আদরের বড় মেয়ে নিনি, বয়স তার ষোলো বৎসর। বাপ-মা বলে, নিনির চেয়ে সুন্দর মেয়ে দুনিয়ায় আর জন্মায় নি। কিন্তু তোমরা তাকে দেখলে ও-কথা মানতে রাজি হ'তে না

নিশ্চয়ই। প্রথম পরিচ্ছেদেই হাঁহাঁর চেহারার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। নিনি সেই বাপেরই মেয়ে তো, বাপের চেহারার বর্ণনা পড়লেই মেয়ের চেহারা খানিকটা আন্দাজ করতে পারবে।

নিনি হ'চ্ছে আদিম যুগের বনের মেয়ে, তার সর্বাঙ্গ দিয়ে দুর্দান্ত বলিষ্ঠতা ও বন্য স্বাস্থ্যের ভাব ফুটে উঠছে। তোমাদের একালের দুই-তিনজন যুবা একসঙ্গে চেষ্টা ক'রেও গায়ের জোরে নিনিকে বশ মানাতে পারত না।

বনবালা নিনি আজকাল ভারি বিপদে পড়েছে। ঝরনার ধারে যখন জল আনতে যায় রোজই দেখতে পায়, পাথরের উপরে পা ছড়িয়ে ব'সে থাকে এক ছোকরা। বনে-জঙ্গলে যখন কাঠ বা ফল-মূল কুড়োতে যায়, আনাচে-কানাচে দেখা যায় সেই ছোকরাকেই।

ছোকরাকে দেখতে তার ভালোই লাগে। সে যে তাকে বিয়ে করতে চায়, এটাও নিনি বুঝতে পারে। তবু বিয়ের নামেই তার ভয় হয়। সেকালের বিয়ে, বর তাকে জোর ক'রে ধ'রে কোথায় নিয়ে যাবে, বাপ-মাকে দেখতে পাবে না আর জন্মের মত। বাপ-মা ভাই-বোনকে ছেড়ে সে থাকবে কেমন ক'রে? তাই ছোকরাকে দেখলেই ভীরু হরিণীর মত ছুটে পালিয়ে আসে।

তোমরা জানোনা বোধহয়, সেকালের বিয়েতে বাপ-মা বা ঘটক-ঠাকুরের হাত থাকত না প্রায়ই। কোন মেয়েকে পছন্দ হ'লে বর জোর ক'রে তাকে ধ'রে বা চুরি ক'রে নিয়ে স'রে পড়ত। আজও কোন কোন অসভ্য সমাজে এই নিয়ম বজায় আছে। মহাভারত প্রভৃতি কাব্য পড়লে দেখবে, ভারতবর্ষ যখন সভ্য তখনও বিবাহের জন্যে কন্যাহরণ নিষিদ্ধ ছিল না। মহাবীর অর্জুনও করেছিলেন সুভদ্রাকে হরণ এবং রুক্মিণীকে হরণ করেছিলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ।

সেদিন বৈকালে হাঁহাঁ সকলকে নিয়ে কুণ্ডের চারিপাশে ব'সে আগুন পোয়াচ্ছে, কেবল নিনি গেছে ঝরনায় জল আনতে।

হঠাৎ নিনি একরাশ এলোচুল হাওয়ায় উড়িয়ে বেগে ছুটতে ছুটতে

গুহার ভিতরে ঢুকে পড়ল এবং বাপের পায়ের কাছে ব'সে প'ড়ে অত্যন্ত হাঁপাতে লাগল।

হাঁহাঁ সবিস্ময়ে বললে, 'কি রে নিনি?'

—'তারা আমাকে ধরতে আসছে!'

—'তারা? কারা?'

—'যারা আমাকে বিয়ে করবে।'

হাঁহাঁর দুই চোখ জ্ব'লে উঠল। সগর্জনে বললে, 'কি করবে? বিয়ে?'

—'হ্যাঁ বাবা! সে রোজ একলা আসে। আজ অনেক লোক নিয়ে এসেছে।'

—'কোথায় তারা?'

—'বাইরে। বোধহয় এইখানেই আসছে।'

হাঁহাঁ, টুটু, ঘটু একসঙ্গে এক এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠল, এক একটা পাথরের ফলাপরানো বর্শা হাতে ক'রে। যদিও এই ভাবেই তখনকার অধিকাংশ বরই বউ সংগ্রহ করত, তবু কোন বাপই সহজে নিজের মেয়েকে পরের হাতে বিলিয়ে দিতে রাজি হ'ত না। এইজন্যে আদিম যুগের বিবাহের সময়ে প্রায়ই রক্তারক্তি ও খুনোখুনি কাণ্ডের অবতারণা হ'ত, অনেক সময়ে বরও মারা পড়ত এবং কন্যাপক্ষের আক্রমণে বর-যাত্রীরা করত প্রাণপণে পলায়ন।

হাঁহাঁ তার দুই ছেলেকে নিয়ে প্রচণ্ড স্বরে চিৎকার করতে করতে মাথার উপরে বর্শা নাচাতে নাচাতে এবং বড় বড় লাফ মারতে মারতে বাইরে বেরিয়ে গেল। হুয়া তার মেয়েকে বুকের ভিতর জড়িয়ে ধ'রে ভয়ে-দুঃখে কান্না শুরু ক'রে দিলে। মেয়ের বিয়েতে মায়ের প্রাণ আজও কাঁদে—কত-যুগ-যুগান্তরের বেদনা সেখানে সঞ্চিত আছে।

গুহার বাইরে গিয়ে হাঁহাঁ দেখে, ব্যাপার বড় গুরুতর। আঠারো-বিশজন লোক কেউ লাঠি কেউ বর্শা আস্ফালন করতে করতে হৈ-হৈ রবে পাহাড়ের উপরে তাদের দিকে উঠে আসছে!

তারা তিনজনে, এই দলে-ভারী বরযাত্রীদের ঠেকাবে কেমন ক'রে?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ফুস-মন্তর

সব-আগে আসছে সেই ছোকরা, নিনিকে যে বিয়ে করতে চায়।

আগেই বলেছি, নিনিরও পছন্দ হ'য়েছে এই ছোকরাকে।

কিন্তু কী দেখে যে পছন্দ হয়েছে, আমরা একালের লোক তা বুঝতে বা বলতে পারব না। নিনির পছন্দসই এই বরটির প্রায় গরিলার মত মুখ, জঙ্গলের ক্ষুদ্র সংস্করণের মত রাশীকৃত গোঁফ-দাড়ি এবং সর্বাঙ্গে বন্য জন্তুর মত বড় বড় লোম দেখলে একালের যে-কোন মহা-কুৎসিত মেয়েও 'মাগো' ব'লে লম্বা দৌড় মেরে দেশছাড়া হ'য়ে পালাবে।

তবে এইটুকু মনে রেখ, নিনি জীবনে যত মানুষ দেখেছে তাদের সকলেরই চেহারা ঐ-রকম। একালেও ভারতের কোন বউই আফ্রিকার কাফ্রি বা হটেনটট বরকে বিয়ে করতে চাইবে না। কি কাফ্রি বা হটেন্‌টট্‌দের মুল্লুকে সেই বরকেই হয়তো অপরূপ কার্তিক ব'লে মনে করা হয়।

নিনির বরের নামটিও বেশ। ঢুঁঢুঁ।

রূপের কথা ছেড়ে দি, কিন্তু ঢুঁঢুঁর দেহের দিকে তাকালে তারিফ ক'রে বলতে হয়—হ্যাঁ, সত্যিকার পুরুষের চেহারা বটে! ইয়া চওড়া বুকের পাটা, তার উপরে পড়লে পাথরও যেন ভেঙে যায়! ইয়া দুই আজানুলম্বিত বাহু, তাদের লোহার মত কঠিন পেশীগুলো থেকে থেকে ফুলে ফুলে উঠছে!

বরযাত্রীদের পল্টন দেখে রীতিমত ভড়কে গিয়ে হাঁহাঁ, টুটু আর ঘটু পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। তারা সবাই বুঝলে, ওদের বাধা দিতে যাওয়া আর আত্মহত্যা করা একই কথা। শেষ-

পর্যন্ত নিনিকে ওরা ধ'রে নিয়ে যাবেই।

কিন্তু বিনাবাক্যব্যয়ে এতদিনের পালন-করা মেয়েকে কি হাতছাড়া করা যায়? অতএব হাঁহাঁ মুখসাবাসি দেখিয়ে খুব চিৎকার ক'রে ব'লে উঠল, 'হো! কে রে তোরা?'

টুঁটুঁ বললে, 'আমরা আসছি বাঘ-বন থেকে, সেই যেখানে খাঁড়া-দেঁতোরা থাকে।'

—'কী চাস রে?'

—'তোর জামাই হব রে।'

—'আমার জামাই হবি? হা-হা-হা-হা।'

—'অত হাসছিস যে?'

—'তুই হবি নিনির বর? ও হো হো হো হো।'

—'কেন হব না রে? আমার হাতের এই ডাণ্ডাটা দেখছিস তো?'

—'কি রে, ভয় দেখাচ্ছিস নাকি? ডাণ্ডা বুঝি আমাদের নেই?'

ততক্ষণে বরযাত্রীরা আরো কাছে এসে পড়েছে। হঠাৎ তাদের ভিতর থেকে একজন খুব লম্বা-চওড়া লোক সব-চেয়ে বেশী এগিয়ে এল। তার কাঁচা-পাকা মাথার চুলের উপরে রঙিন পালকের চূড়ো; তার গলায় দুলছে সাদা ধব-ধবে হাড়ের মালা; তার একহাতে পাথরের বর্শা, আর এক হাতে পাথরের কুঠার; ভাবভঙ্গী ভারিক্কি,—দলের সর্দারের মত।

হাঁহাঁ শুধোলে, 'তুই আবার কে রে বুড়ো?'

—'আমি টুঁটুঁর বাপ হুঁ হুঁ রে।'

—'তোর মতলব কি?'

—'আমি ব্যাটার বউকে নিয়ে যেতে এসেছি।'

—'আবদার নাকি?'

—আবদার নয় রে, দাবী। দে বউকে শীগগির বার করে।'

হাঁহাঁ রাগ সামলাতে না পেরে ধাঁ করে একখানা পাথর ছুঁড়লে! কিন্তু টুঁটুঁর বাপ হুঁহুঁ সাঁৎ ক'রে একপাশে স'রে গিয়ে পাথরখানা ব্যর্থ

ক'রে দিলে।

বরযাত্রীরা হৈ-হৈ ক'রে উঠল, তারপর খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসতে লাগল এবং এগিয়ে আসতে-আসতেই পাহাড় থেকে পাথর কুড়িয়ে ছুঁড়তে লাগল ক্রমাগত।

হঠাৎ কি একটা কথা মনে ক'রে হাঁহাঁ হো-হো রবে চ্যাঁচাতে ও তড়াক তড়াক ক'রে লাফাতে লাগল। এক-একটা লাফ তিন-তিন ফুট উঁচু! একখানা বড়-সড় পাথর তার পায়ে এসে লাগল, তবু তার চ্যাঁচানি আর নাচ বন্ধ হয় না!

টুটু আর ঘটু বুঝলে, তাদের বাপ হঠাৎ পাগল হ'য়ে গেছে!

টুঁটুঁর বাপ হুঁহুঁ আশ্চর্য হ'য়ে বললে, 'ওটা অত চ্যাঁচায় আর লাফায় কেন রে?'

টুঁটুঁ বললে, 'বোধ হয় তুকতাক করছে।'

হুঁহুঁ বললে, 'ডাণ্ডার চোটে সব তুকতাক ঠাণ্ডা ক'রে দেব। এগিয়ে চল, এগিয়ে চল!'

টুটু বাপের বাঁ হাত জোরে চেপে ধ'রে বললে, 'ও বাবা, তোর ঘাড়ে কি ভূত চাপল?'

ঘটু বাপের ডান হাত পাকড়ে বললে, 'আর নাচিস নে রে বাবা!'

হাঁহাঁর দুই হাত ধ'রে ঝুলছে দুই ছেলে, সে কিন্তু সেই অবস্থাতেও লাফাবার চেষ্টা করতে লাগল!

—'বাবা, বাবা, ওরা যে এসে পড়ল!'

—'আসুক রে, আসুক!'

—'সে কি বাবা, তুই এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাচবি, আর ওরা এসে আমাদের মেরে ফেলবে?'

—'তারপর নিনিকে নিয়ে পালাবে?'

হঠাৎ হাঁহাঁ নাচ থামিয়ে গম্ভীর-স্বরে বললে, 'চল, আমরা নিনির কাছে যাই।'

—'লড়াই করবি না?'

—'না ?'

—'নিনিকে ওদের হাতে তুলে দিবি ?'

—'না।'

—'তবে ?'

—'আমার সঙ্গে আয়।'

হাঁহাঁ গুহার দিকে দৌড় মারলে।

বাপের কাপুরুষতায় বিস্মিত ও মর্মাহত হয়ে টুটু বললে, 'ঘটু!'

—'কি রে টুটু ?'

—'স্ত্রীলোকের মত গর্তে গিয়ে ঢুকবি, না এইখানে দাঁড়িয়ে মরদের মত লড়বি ?'

—'মরদের মত লড়ব।'

—'হ্যাঁ, মরব —তবু নড়ব না।'

—'আমার হাতে বর্শা—'

—'আমার হাতে কুড়ুল।'

তারা বর্শা আর কুঠার নিয়ে পাঁয়তাড়া শুরু করলে, এমন সময়ে গুহার ভিতর থেকে হাঁহাঁর ডাক এল—টুটু! ঘটু!'

—'বাবা!'

—'শীগগির এখানে আয়!'

—'যাব না!'

বজ্রকঠোর কণ্ঠে হাঁহাঁ বললে, 'আমার হুকুম। এদিকে আয়!'

মান্ধাতার আমলেরও আগেকার কথা। তখনও ছেলেরা বাপের কথার অবাধ্য হ'তে শেখেনি হয়তো।

টুটু বললে, 'ঘটু!'

—'কি রে টুটু ?'

—'বাপ ডাকে।'

—'হুঁ। না গেলে মারবে।'

আবার হাঁহাঁর স্বর—'টুটু! ঘটু! এখনো এলি না ?'

—'যাই বাবা!'

—'দৌড়ে আয়!'

টুটু আর ঘটু গুহার দিকে দৌড়তে লাগল।

বরযাত্রীরা এসে পড়ল।

ঢুঁঢুঁ বললে, 'ভীতুগুলো লড়বে না। পালালো।'

হুঁহুঁ বললে, 'কিন্তু পালিয়েই কি বাঁচবে?'

—'এখন আমরা কি করব রে?'

—'গুহায় ঢুকব।'

—'যদি সেখানে ওরা লড়ে?'

—'ওরা তিনজন, আমরা আঠারো জন। টিপে মেরে ফেলব।'

—'চল তবে।'

মহা হট্টগোল তুলে সবাই গুহার দিকে ছুটল। ঢুঁঢুঁ আর হুঁহুঁ সকলের আগে গুহার মুখে গিয়ে দাঁড়াল। চেঁচিয়ে নিজেদের লোক-জনদের ডেকে বললে, 'আয় রে তোরা ছুটে আয়!'

তারপর গুহার দিকে ফিরে ঢুঁঢুঁ বললে, 'ওরে বুড়ো শ্বশুর! আমার বউ দে!'

হুঁহুঁ বললে, 'বউ দে রে, আমার ব্যাটার বউ দে!'

গুহার ভিতর থেকে হাঁহাঁ জবাব দিলে, 'এই নে রে, এই নে!'

পর-মুহূর্তে, দুখানা জ্বলন্ত চ্যালা-কাঠ গুহার ভিতর থেকে সাঁ সাঁ ক'রে উড়ে এল—একখানা পড়ল ঢুঁঢুঁর চ্যাটালো বুকের উপরে এবং আর একখানা লাগল গিয়ে হুঁহুঁর মস্ত মুখের উপরে!

এবং তার পর-মুহূর্তে গুহামধ্য থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল ক্রমাগত জ্বলন্ত কাঠের পর জ্বলন্ত কাঠ! হাঁহাঁ, টুটু, ঘটু, ধাঁধাঁ, হুয়া আর নিনি,—এই আগুনখেলায় যোগ দিয়েছে প্রত্যেকেই। নিনির বিশেষ লক্ষ্য, ঢুঁঢুঁর দিকেই! তার ছোঁড়া একখানা কাঠের আগুনে ঢুঁঢুঁর গোঁফ-দাড়ির ভিতরে সৃষ্টি করলে ফিনকির ফুলঝুরি।

খিল-খিল ক'রে হেসে সকৌতুকে হাততালি দিয়ে নিনি ব'লে উঠল,

'পালিয়ে যা রে বর, পালিয়ে যা !'

পালিয়েই গেল। খালি নিনির বর নয়, সবাই। আর সে কি যে-সে পালানো? এত চটপট মানুষ যে পালাতে পারে, নিনি তা জানত না। তাদের কান্নায় আর সভয় চিৎকারে উপর-পাহাড়ে গুহা-ভাল্লুকের ঘুম গেল ভেঙে। ব্যাপার কি দেখবার জন্যে সে পাহাড়ের ধারে এসে মুখ বাড়ালে।

দেখলে একদল মানুষ পাগলের মত দৌড় মারছে এবং তাদের পিছনে পিছনে ছুটছে হাঁহাঁ, টুটু আর ঘটু—প্রত্যেকেরই দু' হাতে দু'খানা ক'রে জ্বলন্ত কাঠ!

বুদ্ধিমান ভাল্লুক ব্যাপারটা আন্দাজ ক'রে নিলে। হাঁহাঁদের কেউ পাছে তাকেও দেখে ফেলে, সেই ভয়ে সে চট ক'রে পাহাড়ের ধার থেকে স'রে এল। সুমুখের দুই পায়ে ভর দিয়ে থেবড়ি খেয়ে ব'সে ভাবতে লাগল অনেকক্ষণ ধ'রে। ভেবে ভেবে শেষটা স্থির করলে, এই অভিশপ্ত পাহাড় যে-কোন ভদ্র ভাল্লুকের বাসের অযোগ্য। এখানে যে-সব কাণ্ড ঘটতে শুরু হয়েছে, তার একটুও মানে হয় না। কালই অন্য দেশে যাত্রা করতে হবে।

একটা পাহাড়ে-গাছের ছায়ায় ব'সে ভাল্লুকী তখন চোখ বুঁজে থাবা দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল পরম আরামে। স্বামীর পায়ের শব্দে কুঁৎকুঁতে চোখদুটি খুললে।

ভাল্লুকীর নাকে নিজের নাক লাগিয়ে ভাল্লুক ঘোঁৎ-ঘোঁৎ ক'রে উঠল। আমরা—অর্থাৎ মানুষরা বড়-জোর অন্যের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কথা বলি। কিন্তু ভাল্লুক বউয়ের নাসিকায় নিজের নাসিকা সংলগ্ন ক'রে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করলে কেন, বলতে পারি না। হয়তো এই উপায়ে তাদের কথা কইবার সুবিধা হয়।

স্বামীর ঘোঁৎঘোঁতানি শুনে ভাল্লুকীও করলে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ। বোধহয়, বললে 'ওমা, তাই নাকি?'

এবার ভাল্লুকের ঘোঁৎ-ঘোঁৎ। বোধহয় বললে, 'হ্যাঁ, গিন্নী। এ

পাহাড় আর নিরাপদ নয়। মানুষের সঙ্গে আগুনের ভাব হয়েছে। এস, লম্বা দি।'

ভাল্লুকীর আপত্তি হ'ল না। এ-পাহাড়ে যত মৌচাক লুঠে সব মধু সে শেষ করেছে। এখন নতুন দেশের খবর নেওয়াই ভালো।

গুহা-ভাল্লুক বউ আর দুটি বাচ্চা নিয়ে যখন দেশত্যাগী হ'ল, ঠিক সেই সময়ে ঢুঁঢুঁর বাপ হুঁহুঁ দলবল নিয়ে একটা মস্তবড় বুড়ো বটগাছের তলায় গিয়ে ব'সে পড়ল। তাদের কারুরই হাতে আর একটা অস্ত্রও নেই। সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র তারা হাঁহাঁদের গুহার সুমুখে ফেলে পালিয়ে এসেছে।

হুঁহুঁ মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে ভাবতে বললে, 'ওরে ঢুঁঢুঁ!'

—'কি রে বাবা?'

—'আমরা কি স্বপ্ন দেখলুম?'

—'স্বপ্ন নয়, সত্যি। স্বপ্ন কামড়ে দিলে কি গোঁফ-দাড়ি পুড়ে যায়? গায়ে ফোস্কা হয়?'

—'কেন তোর বউ আনতে এলুম রে ঢুঁঢুঁ, জ্বলে-পুড়ে মলুম যে!'

—'আগুন-দেবতা যার হাতের মুঠোয়, সে যে এইবারে পৃথিবী জয় করবে! আর আমাদের রক্ষে নেই।'

—'ঢুঁঢুঁ, তুই তখন ঠিকই বলেছিলি রে! তখন ও-বেটা পাগলার মতন লাফিয়ে সত্যি সত্যিই তুক করছিল।'

—'ওর ফুস-মন্তরে আগুন-ঠাকুর বশ মেনেছে।'

—'হুঁ। কিন্তু ও-মন্তরটা আমরাও কি শিখতে পারি না?'

—'কেমন ক'রে শিখবি বাবা? ফুস-মন্তর কি কেউ কারুকে শেখায়?'

—'ওর বেটিকে তুই যেমন ক'রে পারিস বিয়ে করে ফ্যাল। ওর বেটিও নিশ্চয় বাপের কাছ থেকে মন্তর-তন্তর শিখেছে।'

—'গড় করি বাবা, আর আমি ও-মুখো হই?…ঐ ছাখরে বাপ, আবার ওরা এসেছে!'

ছেলের দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে হুঁহুঁ সচমকে দেখলে, তাদের খুব কাছেই এসে দাঁড়িয়েছে হাঁহাঁ, তুই পাশে টুটু আর ঘটুকে নিয়ে। কখন যে তারা নীল অরণ্যের যবনিকা ভেদ ক'রে এত কাছে এসে আবির্ভূত হ'য়েছে, হুঁহুঁর দলের কেউই তা টের পায় নি। কেবল তাই নয়, তাদের তিনজনেরই বাঁ-হাতে এক-খানা ক'রে জ্বলন্ত কাঠ এবং ডান হাতে একগাছা ক'রে বর্শা। প্রত্যেকের কোমরেও ঝুলছে কুঠার।

একে হুঁহুঁদের সবাই অস্ত্রহীন, তার উপরে আবার এই অগ্নি-বিভীষিকা! তারা সবাই প্রাণের আশা ছেড়ে দিলে, কারণ পালাবার আগেই ওরা আক্রমণ করবে!

হাঁহাঁ মুখ টিপে টিপে বিজয়-হাসি হাসছিল। হাসতে-হাসতেই বললে, 'কি রে ঢুঁঢুঁর বাপ হুঁহুঁ! আমার মেয়েকে কেড়ে নিয়ে যাবি তো এগিয়ে আয়!'

ঢুঁঢুঁ বললে, 'রক্ষে কর, আমার বিয়ের সখ নেই!'

হুঁহুঁ হাত জোড় ক'রে বললে, 'আমি মাফ চাইছি রে!'

—'কি শর্তে মাফ করব, বল।'

—'আজ থেকে তুই হলি আমাদের প্রভু রে, আর আমরা হলুম তোর দাস।'

—'আজ থেকে আমি যা বলব, শুনবি?'

—'শুনব।'

—'আমি যদি মরতে বলি?'

—'মরব।'

—'সূর্যি-ঠাকুরের নাম নিয়ে দিব্যি গাল।'

পশ্চিম গগনের প্রদীপ্ত রক্ত-গোলকের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে হুঁহুঁ বললে, 'ঐ সূর্যি-ঠাকুর সাক্ষী রইল, তুই প্রভু—আমরা দাস। আমরা বিপদে পড়লে তোকে কিন্তু আগুন-মন্তরে রক্ষা করতে হবে!'

—'রক্ষা করব।'

—'বিপদ আমাদের শিয়রে জেগেই আছে। আমাদের বাঘ-বনে

খাঁড়াদেঁতোদের বিষম উপদ্রব। তুই তাদের তাড়াতে পারবি?'

—'পারব।'

—'আমাদের পাশের বনে অনেক-রকম ভয় আছে। তুই তাদের দূর করতে পারবি?'

—'কেন পারব না রে? গুহা-ভাল্লুক, খাঁড়া-দেঁতো বাঘ, ভূত-প্রেত সকল রকম ভয় দূর হয়ে যায় আমার এই আগুন-মন্তরে! এই মন্তরে অন্ধকারকে মেরে রাতকে আমি দিন করতে পারি! আজ থেকে আমি রইলুম তোদের শিয়রে দাঁড়িয়ে, কোন শত্রুই আর তোদের কাছে আসবে না!'

এই কথা শুনেই হুঁহুঁর দলবল গায়ের সব জ্বালা ভুলে গেল, তারা এক এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠে সমস্বরে চিৎকার ক'রে উঠল, 'জয়, জয়! হাঁহাঁ সর্দারের জয়!' তারপর তেমনি চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে হাঁহাঁকে বেষ্টন ক'রে সবাই মণ্ডলাকারে তাণ্ডব-নৃত্য করতে লাগল, বিপুল উল্লাসে!

সেই আদিম যুগের আদিম মানুষদের আদিম আনন্দের নৃত্যছন্দ আজকের আমাদের বুকে আর বাজে না, সুতরাং তার গভীরতাও আমরা আর বুঝতে পারব না।

সেই উচ্ছ্বসিত আনন্দের শিহরণ গিয়ে লাগল গহন-বনের গাছে গাছে পাতায় পাতায় এবং সেই আনন্দের অনাহত ভাষা মুখে নিয়ে আদিম প্রতিধ্বনি কৌতুকলীলায় ছুটে গেল পাহাড়ের শিখরে শিখরে দূরে দূরান্তরে!

পশ্চিম আকাশের রঙিন প্রাসাদের অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন আলোক-সম্রাট সূর্যদেব। সন্ধ্যা আসন্ন। এখনি জাগবে অন্ধকার এবং সঙ্গে সঙ্গে জাগবে তার শত শত অনুচর—শত শত বিভীষিকা, শরীরী দুঃস্বপ্ন!

কিন্তু ওদের নাচ তবু থামল না, তার মত্ততা ক্রমে ক্রমে আরো বেড়ে উঠল!

আজ আর অন্ধকার ও বনবাসী শত্রুর ভয় নেই। মানুষ যে বিশ্ব-

জয়ের প্রধান অস্ত্র অগ্নিকে লাভ করেছে। হো হো! চালাও নাচ! জোরে চালাও—আরো, আরো দুন-তালে!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বুড়ো-খাঁড়াদেঁতো

হাঁহাঁদের পাহাড় থেকে মাইল-খানেক তফাতে আর-একটা ছোট পাহাড়, তারই উপরে দুটো বড় বড় গুহার মধ্যে হুঁহুঁদের আস্তানা।

সেই পাহাড়ের পর থেকেই আরম্ভ হয়েছে বাঘবন! দুর্গম ও নির্জন বন, কেবল মানুষ নয়, সমস্ত জীবজন্তুর পক্ষেই ভয়াবহ। সে বনের ভিতরে অন্য কোন জীব ঢোকে না, এবং আলোও ঢোকবার পথ খুঁজে পায় না। আমাদের সেই মধুলোভী গুহা-ভাল্লুকী একবার সেই বনে মৌচাক খুঁজতে গিয়ে বাঘের এমন বিষম চড় খেয়ে পালিয়ে এসেছিল যে, আর কোন দিন ওমুখো হবার ভরসা করে নি!

আলোর অভাবে বাঘবনের ভিতরে সর্বদাই বিরাজ করে সন্ধ্যার কালো ছায়া। দেহে লতা-গুল্মের জাল জড়িয়ে অনেক বড়-বড় বনস্পতি আকাশ-ছোঁয়া ঝাঁকড়া মাথাগুলো শূন্যে দুলিয়ে মর্মর-চিৎকারে সবাইকে যেন সর্বদাই সাবধান ক'রে দিচ্ছে—সাবধান, সাবধান! এ বনে ভুলেও কেউ এস না!

সেখানকার চিরস্থায়ী কালো ছায়ার উপরে ভীষণা রাত্রি এসে যখন আরো-পুরু কালিমা মাখিয়ে দেয়, বিশ্বব্যাপী নিশীথিনীর লক্ষ লক্ষ জোনাকী-চক্ষুগুলো যখন পিট-পিট করতে থাকে অশ্রান্ত ভাবে, বাঘবনের ঝোপে ঝোপে জাগে তখন শুকনো পাতার উপরে অদৃশ্য মৃত্যুর পদধ্বনি এবং হিংস্র, রক্তলোভী কণ্ঠের গভীর গর্জনের পর গর্জন।

আমরা একেলে বাঘ দেখি, আর তাকেই ভয় করি যমের মত!

কিন্তু তাদের যে-সব পূর্বপুরুষ এই বাঘবনের ছায়ায় ও অন্ধকারে বিচরণ করত, তারা যে কেবল আকারেই আরো বড় ছিল তা নয়, চেহারায় ও স্বভাবেও ছিল আরো ভয়ঙ্কর! সবচেয়ে করাল ছিল তাদের চোয়ালের তুই পাশে ঝুলে-পড়া বাঁকা তলোয়ারের মত তুটো সুদীর্ঘ দন্ত! তারা মুখ বন্ধ করলেও দাঁত তুটো হাতির দাঁতের মত বাইরে বেরিয়েই থাকত। এই জন্যেই তাদের খাঁড়াদেঁতো বাঘ ব'লে ডাকা হয়। আধুনিক মানুষের পরম সৌভাগ্য যে, খাঁড়াদেঁতোদের বংশ লোপ পেয়েছে অনেককাল আগেই। নইলে কেবল মানুষ প্রভৃতি জীব নয়, আজকের সুন্দরবনের প্রসিদ্ধ 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' ও আফ্রিকার বিখ্যাত সিংহ পর্যন্ত খাঁড়াদেঁতোদের জলখাবারে পরিণত হ'ত।

খাঁড়াদেঁতোদের ভয়ে বাঘবন থেকে অতিকায় ম্যামথহাতিরাও দল বেঁধে স'রে প'ড়েছিল। বাঘবনে বাস করত কেবল হায়েনা প্রভৃতি তু-চারটে ছোট ছোট জাব, খুব-সাবধানী ও অতি-দ্রুতগামী ব'লে খাঁড়া-দেঁতোদের দন্ত-নখরকে ফাঁকি দিয়ে তারা নিরাপদ ব্যবধানে স'রে পড়তে পারত।

বাঘবনে রাজার মত ছিল একটা বাঘ, হুঁহুঁ যার নাম রেখেছিল 'বুড়ো-খাঁড়াদেঁতো।' অন্যান্য বাঘরা নিজেদের বন ছেড়ে রোজ রাতে বেরিয়ে নানা দিকে যেত, নানা জীব শিকার করবার জন্যে। কিন্তু ঐ বুড়ো-খাঁড়াদেঁতোর ভারি শখের খাবার ছিল, মানুষ। সে প্রায়ই এসে হানা দিত হুঁহুঁদের আস্তানায়, আর বাগে পেলে প্রায়ই এক-একজন মানুষকে ধ'রে মুখে তুলে নিয়ে ফিরে যেত নিজের আড্ডায়। হুঁহুঁ আগে অনেক লোকের উপরে সর্দারী করত, কিন্তু-খাঁড়াদেঁতোর শখ মিটিয়ে মিটিয়ে তার দল এখন যথেষ্ট হালকা হয়ে পড়েছে। তাদের চকমকি-পাথরের বর্শা প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র ঐ বুড়োকে মোটেই ব্যতিব্যস্ত করতে পারত না, কারণ একে সে এত চটপটে যে কেউ অস্ত্র তোলবার সময় পর্যন্ত পেত না, তার উপরে পাথরের বর্শার পক্ষে বুড়োর চামড়া ছিল যথেষ্ট পুরু। তবে হ্যাঁ, একবার হুঁহুঁর ছেলে টুঁটুঁ এমন একটা

মস্ত পাথর তার হেঁড়ে মাথায় ধড়াস ক'রে ছুঁড়ে মেরেছিল, যার ফলে বুড়োকে বেশকিছুদিন ভুগতে হয়েছিল দারুণ মাথা-ধরা রোগে।

সেই সময়ে তার সুয়োরাণী বাঘ-বৌ (বুড়োর দুই বিয়ে কিনা) ব'লেছিল, 'ওগো কর্তা, বুড়ো বয়সে রোগে ধরল, এখন কাচ্চা-বাচ্চাদের মানুষ করি কি ক'রে বল দেখি?'

বুড়ো রেগে কটমটিয়ে তাকিয়ে খাঁড়া-দাঁত উঁচিয়ে বললে, 'হালুম! কে বলে রে আমি বুড়ো? পাজি মানুষ-জন্তুগুলো আমাকে বুড়ো ব'লে ডাকে ব'লে তুই বুড়ীও আমাকে বুড়ো ব'লে ডাকতে চাস নাকি? আমার মতন জোয়ান এ-তল্লাটে কে আছে রে?'

চালাক দুয়োরাণী বাঘ-বৌ তাড়াতাড়ি এগিয়ে বুড়োর গায়ে গা ঘষতে ঘষতে আদর-মাখানো স্বরে বললে, 'হুম-হুম ঘ্যাঁক-ঘ্যাঁক গোঁ-গোঁ-গাঁ-গাঁ!' অর্থাৎ—'কে বলে গা তোমাকে বুড়ো। বড় গিন্নি যেন কী! কিন্তু তোমার মাথাটা অমন ফুলল কেন কর্তা?'

বুড়ো বললে, 'মাথা ধরলেই মাথা ফোলে!' তুচ্ছ মানুষের হাতে মার খেয়ে যে মাথার অমন দুরবস্থা, এ-কথাটা চেপে গেল।

কিন্তু সেইদিন থেকে বুড়ো হ'ল আরো বেশী সাবধান। এমন চুপিসাড়ে সে মানুষ চুরি করে যে, হুঁহুঁর দল তার টিকি পর্যন্ত দেখতে পায় না। (তোমরা হয়তো ভাবছ, বাঘের আবার টিকি কি? কিন্তু বাঘের টিকি হচ্ছে, ল্যাজ। বিশেষত সেকালের খাঁড়াদেঁতোদের ল্যাজ ছিল এত খাটো যে, টিকি ছাড়া অন্য কোন নামে তাকে না ডাকাই উচিত।)

হুঁহুঁ এই বুড়ো-খাঁড়াদেঁতোকে টিট করবার জন্যেই হাঁহাঁর কাছে ধর্না দিয়ে পড়েছে।

কিন্তু হাঁহাঁর কিঞ্চিৎ অসুবিধা হচ্ছে।

সে বিলক্ষণ জানে, একমাত্র অগ্নিদেবের মহিমাই তার মান-সম্ভ্রম বাড়িয়ে তুলেছে এতখানি। এরা বশ মেনেছে ভালোবেসে নয়, ভয়ে। এই ভয় যেদিন দূর হবে, এরা তাকে কীটপতঙ্গের মত টিপে মেরে

ফেলতে ইতস্তত করবে না।

সুতরাং এদের এই ভয়কে জাগিয়ে রাখা দরকার অষ্টপ্রহর।

তাকে সর্বদাই লক্ষ্য রাখতে হবে, হুঁহুঁরা যাতে কিছুতেই আগুন সৃষ্টি করবার গুপ্তরহস্য জানতে না পারে।

আসল গুপ্তকথা হাঁহাঁ কারুকে বলেনি—ছেলেদেরও না, বউকেও না। সে যে শুকনো পাতার গাদায় ডালে ডালে ঘ'ষে আগুন তৈরি করে, তার পরিবারবর্গ বড়-জোর এইটুকুই দেখেছে। কিন্তু বিশেষ একজাতের গাছের ডাল না হ'লে যে অগ্নি উৎপাদন করা অসম্ভব, এটুকু বুদ্ধি নেই তাদের কারুর ঘটেই, তারা অবাক হয়ে ভাবে, এ-সব ফুস-মন্তরের লীলাখেলা!

হাঁহাঁও সব কথা চেপে গিয়েছে চালাকের মত। প্রতিজ্ঞা করেছে, আসল ব্যাপার কারুর কাছেই ভাঙবে না। যতদিন সবাই থাকবে অন্ধকারে, ততদিনই তার জয়-জয়কার!

কিন্তু সকলের সঙ্গে বাঘবনে গিয়ে প্রকাশ্যে আগুন জ্বালবে সে কেমন ক'রে? সেইটেই হয়েছে এখন তার সমস্যা!

অবশেষে ভেবে ভেবে একটা উপায় বার করলে। ছেলেদের ডেকে বললে, 'ওরে টুটু, ওরে ঘটু! বাঘবনে তোরা আমার সঙ্গে যাবি রে! শোন, কেমন ক'রে আমার কাছে খোকা-আগুন আসে, সে কথা কারুকে বলিস নে!'

তারা বললে, 'বলব না রে বাপ!'

অবশ্য বললেও খুব বেশী ক্ষতি ছিল না। কারণ টুটু-ঘটু তো জানে না, তাদের বাপের হাতের ডালদুটো কোন গাছের! এমন কি তারা নিজেরাও যা তা গাছের ডাল নিয়ে চেষ্টা ক'রে দেখেছে, আগুন জ্বলে না।

তবু হাঁহাঁ সব ব্যাপারটাই রহস্যের মত রাখতে চায়। কারণ সাবধানের মার নেই।

পরদিন দুপুরেই হুঁহুঁ আর ঢুঁঢুঁ তাদের দলবল নিয়ে এসে হাজির।

হুঁহুঁ এগিয়ে এসে হাঁহাঁর সুমুখে হাঁটু গেড়ে ব'সে প'ড়ে বললে,

'চলরে সর্দার ! বাঘবন জয় করবি চল !'

হাঁহাঁ তার বর্শাটা মাটিতে ঠুকে সদম্ভে বললে, 'যাবই তো! বাঘবন জয় ক'রে পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দিয়ে আসব রে !'

—'বুড়ো-খাঁড়াদেঁতো ভারি ধড়িবাজ। মানুষ দেখলেই ঘাড়ে ঝাঁপ খায় !'

—'রাখ রে রাখ্ ! বুড়ো ঝাঁপ খায় তোদের ঘাড়ে ! তাকে দেখলে আমারই ফুস-মন্তর ঝাঁপ খাবে তার ঘাড়ে। চল দেখবি চল !'

দেবতার পানে লোকে যেমনভাবে তাকায়, হাঁহাঁর গর্বিত মুখের দিকে সদলবলে হুঁহুঁ তাকিয়ে রইল তেমনি ভক্তিভরে—না, শুধু ভক্তি নয় তার মধ্যে ভয়ের ভাবও ছিল বৈকি !

চলল সবাই বাঘবনের দিকে। যেপথ ধ'রে তারা অগ্রসর হ'ল তোমরা যদি সেখানে থাকতে, তাহ'লে নিশ্চয়ই বলতে, 'আহা, আহা, কি চমৎকার !'

সত্যি, চমৎকারই বটে ! অতুল ! সেকালকার জীবজন্তুদের চেয়ে একালের জীবজন্তুদের আকৃতি প্রকৃতি হয়তো উন্নত হয়েছে, কিন্তু তখনকার নিসর্গ-দৃশ্য এখনকার তুলনায় শ্রেষ্ঠতার দাবী করতে পারে নিশ্চয়ই। আকাশের নিবিড় নীলিমাকে তখন শহর আর কলকারখানার কালো ধোঁয়া ময়লা ক'রে দিতে পারত না, নদীর বুকে ছুটত না তখন কর্কশ পোঁ বাজিয়ে বিশ্রী ইষ্টিমার এবং ঘনশ্যামল ক্ষেতের বুক চিরে ভীষণ চিৎকারে কান ফাটিয়ে ও বিষম শব্দে মাটির প্রাণ কাঁপিয়ে ধেয়ে চলত না ভয়াবহ লৌহ-অজগরের মত সুদীর্ঘ রেলের গাড়ী!

চারিদিকে সুন্দর শান্তির রাজ্য ! সোনা-রোদের আলোয় নীলাম্বর করছে ঝলমল-ঝলমল এবং গাঢ়-সবুজ বনে বনে ফল-ফুল লতা-পাতার সভায় গিয়ে আলো আর ছায়ায় মিলে খেলছে মনোরম ঝিলমিল-ঝিলমিল খেলা। কোথাও মেঘের সঙ্গে ভাব করবার জন্যে বিপুল শূন্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে বিরাট পর্বত এবং তার কালো বুকে দুলছে কলকৌতুক-হাসিতে ভরা ঝরনার রূপোলী হার, কোথাও ঘাসের সবুজ সাটিনে

নরম বিছানা পেতেও ঘুমোতে না চেয়ে ছুটে চলেছে দুষ্টু নদী-মেয়ে কুলকুল গান গেয়ে। হরিণ চরছে, পাখী ডাকছে, নামহীন ফুলেরা মৌমাছি-প্রজাপতিদের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছে মন-মাতানো গন্ধদূতদের।

কিন্তু হাঁহাঁ ও হুঁহুঁ প্রভৃতি সেকালকার আদি মানুষরা এ-সবের মাধুর্য নিজেদের অজান্তেই প্রাণে-প্রাণে অনুভব করলেও, এদের সৌন্দর্য নিয়ে হয়তো আজকালকার কবিদের মত ভাষায় আলোচনা করতে শেখেনি। শিখলেও সে আলোচনার সময় সেদিন ছিল না।

কারণ পথ চলতে চলতে টুঁটুঁর বাপ হুঁহুঁ সেদিন কেবলই ভাবছে, হাঁহাঁ-সর্দারের ফুস-মন্তর যদি ফস্কে যায়, বুড়ো-খাঁড়াদেঁতো তা'হলে আগে তার দিকেই নজর দেবে, না, আগে আমাকেই গপ ক'রে গিলে ফেলতে আসবে?

আর হাঁহাঁ ভাবছে ক্রমাগত, বাঘ-বনে বাঘ আছে অগুন্তি, একা খোকা-আগুন যদি তাদের সবাইকে সামলাতে না পারে, তাহ'লে ফিরে এসে আর সর্দারী করতে পারব কি?

আরো খানিকটা এগিয়ে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিয়ে হুঁহুঁ বললে, 'ঐ ছাখ রে সর্দার, ঐ বাঘবন!'

হাঁহাঁ এদিকে ওদিকে তাকিয়ে, পাশের একটা জঙ্গলের ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বললে, 'খবর্দার, তোরা কেউ আমার সঙ্গে আসিস নে!'

—'কেন সর্দার?'

—'আমি ফুস-মন্তর ঝাড়তে যাচ্ছি।'

—'তা আমরা যাব না কেন?'

—'আমি এখন মন্তর প'ড়ে অগ্নিদেবকে ডাকব। সে-সময়ে অন্য কেউ কাছে থাকলে দেবতার কোপে মারা পড়বে!'

এমন বিষম যুক্তির উপরে কথা চলে না। হুঁহুঁ তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এল!......

হাঁহাঁ সেই যে বনের ভিতরে গিয়ে ঢুকল, আর বেরুবার নাম নেই। এই আসে এই আসে ক'রে ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হুঁহুঁদের পা করতে

লাগল টন টন।

হুঁহুঁ শেষটা হাঁড়িপানা মুখ ক'রে টুটুকে ডেকে বললে, 'এই! তোর বাপটা লম্বা দিলে নাকি?'

টুটু বুক ফুলিয়ে বললে, 'কী যে বলিস ঢুঁঢুঁর বাপ! তোদের মত আমাদের বাপ পালায় না রে!'

—'তবে সে গেল কোথা?'

—'বাবা ফুস-মন্তর আউড়ে পুজো করছে!'

—'ছাই করছে!'

হঠাৎ ঢুঁঢুঁ উত্তেজিত স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'বাবা, বাবা!'

—'কি রে, কি রে?'

—'অগ্নিদেব!' ঢুঁঢুঁ জঙ্গলের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলে।

হুঁহুঁ চমৎকৃত হয়ে দেখলে, জঙ্গলের উপরে ধোঁয়ার কুণ্ডলী এবং ভিতরে পাতার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে দাউ-দাউ আগুন!

সে সভয়ে অথচ সানন্দে চেঁচিয়ে বললে, 'জয় অগ্নিদেব! জয় অগ্নিদেব! জয় অগ্নিদেব! জয়, জয়, জয়!'

তারপরেই দেখা গেল, জঙ্গলের ভিতর থেকে সদর্পে পা ফেলতে ফেলতে বেরিয়ে আসছে হাসিমুখে হাঁহাঁ-সর্দার, তার দুই হাতে দুইখানা জ্বলন্ত কাঠ!

হাঁহাঁ কাছে এসেই বললে, 'যা রে তোরা সবাই, ঐ জঙ্গলে যা! ওখানে এমনি আগুন-কাঠ আরো অনেক আছে, তোরা সবাই দুখানা ক'রে কাঠ কুড়িয়ে নিয়ে বাঘবনে ছুটে চল! যা, যা, দেরি করিস নে, অগ্নিদেব তাহ'লে পালিয়ে যাবেন!'

হাঁহাঁর ফুস-মন্তরের প্রভাব দেখে টুটু-ঘটু ছাড়া বাকি সকলেই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। অগ্নিদেবের পালাবার সম্ভাবনা আছে শুনে তাদের চমক ভাঙল এবং সবাই একছুটে জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

দুয়োরাণী বাঘ-বৌয়ের দুই খোকা আর এক খুকি হয়েছিল, সে তাদের নিয়েই ব্যস্ত হয়ে আছে। খুকিকে দুই থাবা দিয়ে চেপে ধ'রে গা চেটে দিচ্ছে এবং টিকির মত ছোট্ট ল্যাজটা নেড়ে নেড়ে খোকা-বাচ্চা দুটোর সঙ্গে খেলা করছে।

সুয়োরাণী প্রতিদিন যা করে, সেদিনও তাই করছিল, অর্থাৎ বরের সঙ্গে ঝগড়া।

—'দুদিন আজ শিকারে যাও নি, সংসারে যে খাবার বাড়ন্ত সে হুঁস আছে?'

ছায়া যেখানে প্রায় অন্ধকারেরই মত ঘন, সেইখানে একরাশ শুকনো পাতার বিছানায় কুঁকড়ে-সুকড়ে পরম আরামে শুয়ে বুড়ো-খাঁড়াদেঁতো একটি দীর্ঘ নিদ্রা দেবার আয়োজন করছিল। সেই অবস্থাতেই অস্পষ্ট স্বরে সে বললে, 'ঘ্যানর ঘ্যানর করিস নে বলছি। কেন থাবা খেয়ে মরবি?'

দুয়োরাণী খুকির গা-চাটা থামিয়ে স্বামীর পক্ষ নিয়ে বলল, 'ক্ষিধে যদি পেয়ে থাকে দিদি, নিজেই গিয়ে পাহাড় থেকে একটা মানুষ ধ'রে নিয়ে এস না! কর্তাকে আর জ্বালাও কেন?'

বুড়ো-খাঁড়াদেঁতো হঠাৎ মাথাটা একটু তুলে বললে, 'ছোটগিন্নী, তুই মানুষের নাম করতেই নাকে যেন মানুষের গন্ধ পাই!'

সুয়োরাণী খাঁড়া-দাঁত খিঁচিয়ে বললে, 'বুড়োর ভীমরতি হয়েছে! বাঘবনে মানুষের গন্ধ! কী যে বলে!'

সে কথা কানে না তুলে বুড়ো তাড়াতাড়ি চার পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। একদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, 'বনের ওখানটা নড়ছে কেন?'

সুয়োরাণী চটপট বরের একপাশে এসে দাঁড়িয়ে বললে, 'শুকনো পাতার ওপরে খড়-মড় শব্দ হচ্ছে কেন?'

দুয়োরাণী চটপট স্বামীর আর এক পাশে এসে দাঁড়িয়ে বললে, 'বনের ভেতর ধোঁয়া উঠছে কেন?'

বুড়ো-খাঁড়াদেঁতো হা হা হা হা ক'রে হেসে উঠে বললে, 'দেখতে পেয়েছি। বড় গিন্নীর ভারি বরাত-জোর, বাঘবনে খাবার নিজেই এসে হাজির হয়েছে! আরে, আরে, একটা নয়—ছুটো নয়, অনেকগুলো খাবার যে! হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ!' ভীষণ গর্জনে বাঘবনের গাছ-পাতা কাঁপিয়ে সে প্রকাণ্ড এক লম্ফত্যাগ করলে!

প্রথম লাফের পর দ্বিতীয় লাফ, তারপর সে যখন তৃতীয় লাফ মারবার উপক্রম করছে, জঙ্গল ভেদ ক'রে হ'ল হাঁহাঁর আবির্ভাব এবং পর-মুহূর্তেই সে বুড়োকে একে একে দুখানা জ্বলন্ত কাঠ ছুঁড়ে মারলে!

বুড়ো চট ক'রে স'রে প্রথম কাঠখানা এড়িয়ে গেল। দ্বিতীয় কাঠখানা ফটাং ক'রে তার পিঠের উপরে এসে পড়ল বটে, কিন্তু তার গতি রোধ করতে পারলে না, অগ্নিদাহের যন্ত্রণায় বিকট চিৎকার ক'রে মহাক্রোধে সে তৃতীয় লাফ মেরে একেবারে হাঁহাঁর সামনে গিয়ে প'ড়ে তুললে তার প্রচণ্ড থাবা!

হাঁহাঁর সর্দারি সেইখানেই ফুরিয়ে যেত, কিন্তু চকিতে হুঁহুঁর বেটা টুঁটুঁ পিছন থেকে সুমুখে এসে, বুড়োর মুখের উপরে ভয়ানক জোরে বসিয়ে দিলে জ্বলন্ত কাঠের আর এক ঘা—আবার এক ঘা!

অসহ যাতনায় পাগলের মত বুড়ো চারিদিকে ছুটোছুটি করে গাঁ-গাঁ রবে, আর থেকে থেকে নিজের মুখ-চোখের উপরে দুই থাবা ঘষে। তার এলোমেলো দৌড় দেখে কারুরই আর বুঝতে বাকি রইল না যে, টুঁটুঁর কাঠের আগুনে পুড়ে খাঁড়াদেঁতোর দুই চক্ষুই হয়েছে অন্ধ!

তখন চারিদিক থেকে তার উপরে জ্বলন্ত কাঠি বৃষ্টি হ'তে লাগল—সেই সঙ্গে বড় বড় পাথরও! দেখতে দেখতে তার ছটফটানি স্থির হয়ে এল এবং ক্ষীণ হয়ে এল তার গর্জন ও আর্তনাদ তারপর খাঁড়াদেঁতোর দেহ একেবারে নিশ্চেষ্ট।

সুয়োরাণী ও দুয়োরাণী প্রভৃতি এই কল্পনাতীত অগ্নিকাণ্ড দেখে ভড়কে গিয়ে, অনেকক্ষণ আগেই টিকির মত ছোট ল্যাজ তুলে দিয়েছে লম্বা ভোঁ-দৌড়!

হুঁহুঁ আহ্লাদে আটখানা হয়ে হাঁহাঁকে দুই হাতে জড়িয়ে ধ'রে বুকে তুলে নিয়ে নাচতে নাচতে বললে, 'ওরে আমাদের হাঁহাঁ-সর্দার। তোকে আমরা পুজো করব রে!'

হাঁহাঁ বললে, 'আরে ছাড় ছাড়, এখনো আমার কাজ বাকি আছে!'

হাঁহাঁকে নামিয়ে দিয়ে হুঁহুঁ বললে, 'বুড়ো তো অক্কা পেয়েছে রে, আবার কি কাজ বাকি?'

—'বুড়ো মরেছে বটে, কিন্তু বাঘবনে কি আর বাঘ নেই?'

হুঁহুঁ মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, 'তা আছে বৈকি!'

—'আজ তাদের সবাইকে হয় মারব, নয় তাড়াব!'

—'দূর সর্দার, অসম্ভব!'

—'অগ্নিদেবতার দয়া হ'লে কিছুই অসম্ভব নয়।······ভাইসব, বনের তলটা শুকনো পাতায় ছেয়ে আছে, কাঠের আগুনে ধরিয়ে দে পাতাগুলো!'

হাঁহাঁর ফন্দী ব্যর্থ হ'ল না! ঘণ্টা-চার পরে দেখা গেল, বাঘবনের মধ্যে বহুদূরব্যাপী দাবানলের তাণ্ডব-নাচ শুরু হয়েছে এবং তার লক্ষ লক্ষ লকলকে রক্তশিখা যেন মহাক্ষুধায় অস্থির হয়ে দিকবিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে চীৎকার করতে করতে।

এবং বনের মধ্যে সর্বত্র জেগে উঠেছে খড়গদন্ত ব্যাঘ্রদের আর্তধ্বনি! আগুনের বেড়াজালে ধরা প'ড়ে কত বাঘ যে মাটিতে আছড়ে-পিছড়ে মারা পড়ল তার আর সংখ্যা নেই। বাকি বাঘগুলো সে বন ছেড়ে কোথায় স'রে পড়ল, তা কেউ বলতে পারে না! তখন থেকে ব্যাঘ্র-বনে হ'ল ব্যাঘ্রের অভাব। মানুষরা হাপ ছেড়ে বাঁচল।

হাঁহাঁ একগাল হেসে বললে, 'কি রে হুঁহুঁ! আমার বাহাদুরিটা দেখলি তো?'

হুঁহুঁ কৃতজ্ঞ স্বরে বললে, 'কি আর বলব সর্দার! দে, তোর পায়ের

ধুলো নি।'

হুঁহুঁর দলবল একসঙ্গে চিৎকার ক'রে বললে, 'জয়, জয় হাঁহাঁ-সর্দারের জয়!'

হাঁহাঁ নিজের নামে জয়ধ্বনি শুনতে শুনতে খানিকক্ষণ কি ভাবলে। তারপর ফিরে ডাকলে, 'টুঁটুঁ।'

—'সর্দার!'

—'আজ তুই না থাকলে আমি মারা পড়তুম। না রে?'

টুঁটুঁ চুপ ক'রে রইল।

—'সাবাস জোয়ান তুই।'

—'সর্দার, আমি তোর ছেলের মত।'

—'তুই আমার নিনিকে বিয়ে করতে চাস?'

টুঁটুঁ ঘাড় নেড়ে সায় দিলে। গুরুজনদের সামনে সেকালের বর বা বউ কারুরই সঙ্কোচ ছিল না।

—'শোন হুঁহুঁ! তোর বেটা আজ আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে। তাই নিনিকে আমি তার হাতে দেব। আজ রাতেই এদের বিয়ে হবে।'

...'আজ রাতে? অন্ধকারে?'

—'দূর বোকা! আমার ঘরে আছেন যে অগ্নিদেব! গুহা-ভাল্লুক আর খাঁড়াদেঁতোর মত অন্ধকারকেও আমি যে দূর ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছি! নে, এখন চল! বুড়ো-খাঁড়াদেঁতোর লাসটাকেও নিয়ে চল, বিয়ের ভোজে কাজে লাগবে!'

—'ঠিক বলেছিস সর্দার! খাঁড়াদেঁতো রোজ আমাদের খেত, আজ আমরা ওকেই খাব। ওহো, কি মজা!'

বাঁশবনের বিরাট অগ্নি-উৎসবের লাল আভায় রঞ্জিত পথ দিয়ে সকলে হাসিমুখে ফিরল, বিয়ের ভোজের কথা ভাবতে ভাবতে!

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আদিম মানুষদের কথা

মানুষের পুরানো কাহিনী বলতে বলতে এইবারে গল্প থামিয়ে ছোট্ট একটি আলোচনা করব।

তোমরা হয়তো ভাবছ, এতক্ষণ ধ'রে মানুষের যে ইতিহাস বললুম তা কাল্পনিক কথা। মোটেই নয়। নৃতত্ত্ববিদ অর্থাৎ নরবিদ্যায় যাঁরা পণ্ডিত, তাঁরা ঠিক সুচতুর ডিটেকটিভের মতই নানা প্রমাণ দেখে মানুষের সত্যিকার ইতিহাস আবিষ্কার করেছেন। এ-সব বিষয় নিয়ে আজীবন নাড়াচাড়া ক'রে তাঁরা এতটা পাকা হয়ে উঠেছেন যে, প্রাচীন মানুষদের মাথার খুলির বা চোয়ালের ভগ্নাংশ দেখেই ব'লে দিতে পারেন, সম্পূর্ণ অবস্থায় তাদের মুখের গড়ন ছিল কিরকম।

তাদের আচার-ব্যবহারও নানা উপায়ে জানা গিয়েছে। একটা উপায়ের কথা বলছি। ধর, আদিম মানুষদের দ্বারা ব্যবহৃত একটা গুহা আবিষ্কৃত হ'ল। সে গুহায় ঢুকে প্রথমটা কিছুই হয়তো দেখা যাবে না; কারণ দশ-পনেরো-বিশ হাজার বৎসরের পুঞ্জীভূত ধূলা-জঞ্জাল কঠিন মাটিতে পরিণত হয়ে গুহার ভিতরকার সমস্ত দ্রষ্টব্যকেই কবর দিয়েছে। পণ্ডিতরা তখন গুহার মেঝে খুঁড়তে আরম্ভ করলেন। মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেল মানুষের খুলি বা কঙ্কালের সঙ্গে ম্যামথ হাতির দাঁত। কঙ্কালাবশেষ এবং বল্গা হরিণ (rein deer), রোমশ গণ্ডার, ভাল্লুক ও ষাঁড় প্রভৃতি জন্তুর হাড়, চকমকি পাথরের অস্ত্র-শস্ত্র আর অন্যান্য জিনিস।

পণ্ডিতরা মানুষের খুলি বা কঙ্কালের কাঠামোর উপরে প্লাষ্টার চাপিয়ে আগে তার চেহারা আবিষ্কার করলেন। তারপর চিন্তা ক'রে বুঝলেন, ঐসব অস্ত্রশস্ত্র ও জিনিসপত্তর তারা ব্যবহার করত এবং যেসব জন্তুর মাংস তারা ভক্ষণ করত ঐ হাড়গুলো তাদেরই। মাংস খাবার পর হাড়গুলো তারা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। হাড়গুলো দেখে আরো

বোঝা গেল, ঐ জাতের মানুষদের যুগে কোন কোন জীব পৃথিবীতে বিচরণ করত।

নর-বিদ্যায় এখনকার সবচেয়ে বড় পণ্ডিত Sir Arthur Keith বলেন, মানুষের পূর্বপুরুষ হচ্ছে বানর। কিন্তু অন্যান্য অনেক পণ্ডিতের মতে, মানুষের পূর্বপুরুষ হচ্ছে এমন কোন জীব, যে ঠিক বানরও নয়, ঠিক মানুষও নয়। কিন্তু সে যে কিরকম জীব তা কেউ জানে না, কারণ তার কোন কঙ্কাল আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

পৃথিবীর সমস্ত ইতিহাস লেখা আছে পৃথিবীর বুকের ভিতরেই। আজ পর্যন্ত যত জীবজন্তু ও উদ্ভিদ জন্মে আবার চিরবিদায় নিয়েছে, পৃথিবীর মাটির স্তরে স্তরে তাদের অধিকাংশেরই চিহ্ন লুকোন আছে। এক-একটি বিশেষ স্তরে পাওয়া যায় এক-একটি বিশেষ জাতের জীবজন্তু বা উদ্ভিদের চিহ্ন। সকলের আগে যারা জীবজগৎ থেকে বিলুপ্ত হয়েছে, পৃথিবীর সর্বনিম্ন স্তরে পাওয়া যায় তাদেরই চিহ্ন। এইরকম এক-একটি স্তরকে এক-একটি বিশেষ যুগ ব'লে ধরা হয়। এক-একটি স্তর পড়তে কত কাল লাগে, ভূতত্ত্ববিদরা তারও একটা মোটামুটি হিসাব ক'রে ফেলেছেন। এই হিসাবের ওপর নির্ভর ক'রেই বলা হয়, কত হাজার বৎসর আগে হয়েছে কোন কোন জীবের আবির্ভাব।

পৃথিবীতে এক সময়ে ছিল তুষার-যুগ। খুব সম্ভব সেই সময়েই হয় প্রথম মানুষের আবির্ভাব। মানুষের সবচেয়ে-পুরানো কঙ্কালাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে ভারতবর্ষের প্রতিবেশী দেশ যবদ্বীপে বা জাভায়। কঙ্কাল পরীক্ষা করবার পর তার আকৃতি-প্রকৃতির অনেক কথাই জানা গিয়েছে। তাকে বানর-মানুষ ব'লে ডাকা হয়। তার মাথার খুলির গড়ন গিবন-বানরের মত। কিন্তু সে মানুষের মত দুই পায়ে ভর দিয়ে হাঁটত, ছুটত এবং মুঠোয় লাঠি ধরতে পারত, তবে কাপড়-চোপড় পরত না। খুব সম্ভব, সে কথাবার্তা কইতেও জানত না। আর তার মস্তিষ্কের শক্তি বনমানুষের তুলনায় উন্নত হ'লেও আধুনিক মানুষের তুলনায় বিশেষ উন্নত ছিল না। পণ্ডিতদের মতে, এই সময়েই অন্যান্য

জন্তুদের সঙ্গে ভয়াবহ খাঁড়াদেঁতো বাঘরা ছিল মানুষের সহচর। আমরা যে-যুগে খাঁড়াদেঁতোদের সঙ্গে মানুষের সংঘর্ষ দেখিয়েছি, সেযুগে হয়তো তাদের অস্তিত্ব ছিল না। তবে কোন একটা জন্তু একযুগেই নিঃশেষে লুপ্ত হয়ে যেতে পারে না। খাঁড়াদেঁতোদের শেষ বংশধররা দলে হালকা হ'লেও পরবর্তী যুগেও যে পৃথিবীর দু-এক জায়গায় বিচরণ করত না, একথা কে জোর ক'রে বলতে পারে? যেমন ভারতীয় সিংহদের যুগ আর নেই, তবু তদের কয়েকটি জীবন্ত নমুনা আজও দক্ষিণ ভারতে বিদ্যমান।

সেই নির্দয় তুষার-যুগে পশ্চিম ও মধ্য য়ুরোপে, উত্তর-আফ্রিকায় ও উত্তর-ভারতে যে মানুষের অস্তিত্ব ছিল তার অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। অনেকের মতে, মানুষের প্রথম জন্ম হয় মধ্য-এশিয়ায়। কিন্তু অন্যান্য পণ্ডিতরা বলেন, আদিম যুগেও জায়গার উপরে প্রকৃতির দৃষ্টি ছিল এমন কঠোর যে, মানুষ সেখানে টিকতেই পারত না। এঁদের মতে উত্তর-আফ্রিকা থেকে পারস্যের মধ্যবর্তী কোন স্থান মানুষের আদি জন্মভূমি।

মানুষের আদি জন্মভূমি যেখানেই হোক, আদিম মানুষদের আত্মরক্ষার জন্যে যে কঠিন জীবন যুদ্ধে নিযুক্ত হ'তে হয়েছিল, আজকের আমাদের কাছে তা অমানুষিক ব'লে মনে হওয়া আশ্চর্য নয়। ভীষণ ভীষণ জানোয়ারের ও তুষার-যুগের কল্পনাতীত শীতের সঙ্গে দুর্বল বানর-মানুষরা অবিরাম যুদ্ধ করেছে—দেহ তাদের ক্ষুদ্র ও নগ্ন এবং তারা অগ্নির ব্যবহারও জানত না! আর পাথরের অস্ত্র পর্যন্ত তখনো তৈরী করতে শেখে নি!

তখনকার শীত এমন ভয়ানক ছিল যে, বহু অতিকায় ও মহাবলিষ্ঠ জীবও তা সহ্য করতে পারেনি ব'লে তাদের বংশ একেবারে লোপ পেয়েছে। কিন্তু সেই তুষারমরু পার হয়ে ক্ষুদ্র হয়েও মানুষ বর্তমানের দিকে বিজয়ীর বেশে এগিয়ে আসতে পেরেছে কেবলমাত্র মস্তিষ্কের জোরে। এই মস্তিষ্কেরই অভাবে মানুষের আগে আর কোন জীব বস্ত্র ও অগ্নি ব্যবহার করতে শেখে নি।

বানর-মানুষদের পরে আমাদের যে-সব পূর্বপুরুষ পৃথিবীতে বিচরণ করেছে, তাদের Peking, Rhodesian, Piltdown, Heidelberg, Pre-Chellean ও Chellean মানুষ প্রভৃতি ব'লে ডাকা হয়। এরই মধ্যে খুব সম্ভব আরো নানা জাতের মানুষ পৃথিবীতে এসে স্বজাতিকে ক্রমোন্নতির দিকে ধাপে ধাপে এগিয়ে দিয়ে বিদায় নিয়েছে, কিন্তু এখনো তাদের চিহ্ন আবিষ্কৃত হয় নি।

পূর্বোক্ত Keith সাহেবের মত হচ্ছে, পৃথিবীতে মানুষের প্রথম আবির্ভাব হয়, আনুমানিক দশ লক্ষ বৎসর আগে। কিন্তু নিশ্চয়ই প্রথম যুগে এবং তারও কয়েক লক্ষ বৎসর পরেও মানুষ ছিল বানরের নামান্তর মাত্র। কারণ জাভায় প্রাপ্ত মানুষের কঙ্কালাবশেষের বয়স হচ্ছে পাঁচ লক্ষ বৎসর, অথচ তখনো সে বানরের চেয়ে বিশেষ উন্নত হ'তে পারে নি। পিকিং মানুষের বয়স ধরা হয়েছে আড়াই লক্ষ বৎসর,—Rhodesian মানুষদেরও ঐ বয়স। Heidelberg মানুষরা দেড় লক্ষ থেকে দুই লক্ষ বৎসর আগে পৃথিবীতে বিচরণ করত। কিন্তু এদেরও মস্তিষ্ক অপরিণত। সুতরাং বুঝতেই পারছ, মানুষের মস্তিষ্ক বর্তমান আকার লাভ করেছে কল্পনাতীত কত যুগব্যাপী চর্চার পর।

তারপর 'নিয়ানডের্টাল' মানুষের আগমন—এতক্ষণ ধ'রে যাদের গল্প তোমাদের কাছে বলেছি। ঐ 'নিয়ানডের্টাল'দের দেহাবশেষ য়ুরোপেই পাওয়া গেছে বটে, কিন্তু ও-জাতের বা ওদেরই মতন মানুষ যে তখন পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও ছিল, এবিষয়ে সন্দেহ করবার কারণ নেই। কেউ কেউ হিসাব ক'রে ব'লেছেন, 'নিয়ানডের্টাল'রা পৃথিবীতে এসেছে পঞ্চাশ হাজার বৎসর আগে। এদের যুগের চিরস্মরণীয় ঘটনা হচ্ছে মানুষের অগ্নিলাভ। এই এক আবিষ্কারেই মানুষ যে কি ক'রে অপরাজেয় ও সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হয়ে উঠল, গল্পের মধ্যেই তার অল্পবিস্তর আভাস তোমরা পেয়েছ।

আমরা যে সময়ে হাঁহাঁর অগ্নিলাভ করার কথা উল্লেখ করেছি, অন্যান্য

জায়গাকার মানুষদের সঙ্গে অগ্নির বন্ধুত্ব হয়েছে, তার ঢের আগেই। কিন্তু এতে আমাদের ভুল হয় নি। কারণ আদিমকালে নানা দেশের মানুষদের মধ্যে কোন বিষয় নিয়েই আদান-প্রদানের সুযোগ ছিল না। কাজেই অগ্নি ব্যবহার করতে শিখেছে কোন দেশের মানুষ অনেক আগে, কোন দেশের মানুষ অনেক পরে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, আন্দামান দ্বীপ-পুঞ্জের কোন কোন আদিম জাতি আজও আগুন জ্বালাতে জানে না!

কিন্তু পণ্ডিতদের মতে, 'নিয়ানডের্টাল'রাও আমাদের মতন মানুষ নয়, কারণ তাদের দেহেও এমন সব লক্ষণ ছিল, যা বানর বা বন-মানুষদের দেহেই দেখা যায়।

আনুমানিক পনেরো হাজার বছর আগে থেকে 'নিয়ানডের্টাল'রা বিলুপ্ত হ'তে শুরু করে। তারা একেবারে লুপ্ত হবার আগে আবার যে-সব নতুন জাতির আবির্ভাব হ'ল তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও বিখ্যাত হচ্ছে 'ক্রো-ম্যাগ্নন' মানুষরা। এদেরই আধুনিক মানুষ ব'লে ডাকা হয় এবং কোন দেশে এদের প্রথম জন্ম বা আবির্ভাব তার কোন নিশ্চিত প্রমাণ নেই। তবে য়ুরোপে গিয়েছিল তারা বোধহয় উত্তর-আফ্রিকা থেকে। তাদের মুখে-চোখে ছিল কিছু কিছু মঙ্গোলীয় ও আমেরিকার 'রেড-ইণ্ডিয়ান' ছাপ।

আমরা অনায়াসেই অনুমান করতে পারি, এই রকম আধুনিক মানুষরা ভারতবর্ষেও আবির্ভূত হয়েছিল, কেননা ভারতীয় সভ্যতার বয়স য়ুরোপের চেয়ে অনেক বেশী। পরের পরিচ্ছেদে এই নতুন আধুনিক মানুষদের আকৃতি-প্রকৃতি ও আচার-ব্যবহারের কথা তোমরা জানতে পারবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নতুন মানুষ

ভারি চমৎকার ফুরফুরে হাওয়া উঠেছে! সখ ক'রে বেড়াতে বেরিয়েছে নতুন বর ঢুঁঢুঁর সঙ্গে নতুন বউ নিনি।

বনে বনে গাছের দোল, সেইসঙ্গে সবুজ ঘাসের বিছানার উপরে দুলছে আলো, দুলছে ছায়া।

সেদিনও কোকিল ডাকত, শ্যামলতার অন্তঃপুর থেকে। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের ভাষা অনেক বদলেছে, কিন্তু কোকিলের ভাষা ছিল ঐ একই রকম। অর্থাৎ—কুহু, কুহু, কুহু!

কোকিলের গান শুনতে শুনতে তারা নদীর ধারে গিয়ে হাজির হ'ল। মস্ত নদী,—তার দুধারে সারি সারি দাঁড়িয়ে পাহাড়রা দিচ্ছে পাহারা। নদী যে কত দূর গিয়েছে কেউ তা জানেনা।

ঢুঁঢুঁ হঠাৎ বললে, 'হ্যাঁ রে বউ, তোর বাপ আমাকে তোদের ঘরে ঢুকতে দ্যায় না কেন রে?'

ঘর, অর্থাৎ গুহা। তার মধ্যে আছে অগ্নিদেবকে জাগিয়ে রাখবার গুপ্তরহস্য এবং হাঁহাঁ তার জামাইকেও বিশ্বাস করে না। তার পক্ষে এটা অবশ্য অন্যায় নয়। কারণ সেই আদিমযুগের জামাইরা শ্বশুরদেরও খাতির রাখত না।

নিনি তা জানে। আর এটাও তার অজানা নেই যে একবার অগ্নি-রহস্য আবিষ্কার করতে পারলেই ঢুঁঢুঁর হাতে হাঁহাঁর প্রাণ যাওয়াও আশ্চর্য নয়। বাপের বিপদ কোন মেয়ে চায়?

অতএব ঢুঁঢুঁর প্রশ্ন চাপা দেবার জন্যে সে বললে, 'বাপের মনের কথা আমি কি জানি? ও কথা চুলোয় যাক, তুই ঐ ফুলগুলো তাড়াতাড়ি

পেড়ে দে দেখি!' ব'লে সে সামনের একটা ছোট পাহাড়ের উপরকার একটা গাছের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলে।

—'ফুল নিয়ে কি করবি?'

—'গন্ধ শুঁকব রে বর!' ফুল দিয়ে যে মালা গাঁথা যায় নিনিদের সমাজের মেয়েরা তা জানত না।

টুঁটুঁ হাতের প্রচণ্ড পাথুরে মুগুরটার উপরে ভর দিয়ে পাহাড়ে উঠতে লাগল। নিনি ঘাসের উপরে ছুই পা ছড়িয়ে ব'সে পড়ল।

উঁচু গাছের ডালের উপরে উঠে টুঁটুঁ কিন্তু ফুল পাড়বার নামও করলে না, নদীর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ব'সে রইল চিত্রার্পিতের মত।

নিনি নীচে থেকে ধমক দিয়ে বললে, 'এই কুঁড়ে বর, ফুল পাড় না!'

তবু টুঁটুঁর মুখে নেই রা।

নিনি বললে, 'হাঁ ক'রে ওদিকে কি দেখছিস রে বর? কখনো কি নদী দেখিস নি?'

—'নদী ঢের দেখেছি রে বউ, কিন্তু নদীতে অমন সব জানোয়ারকে কখনো সাঁতার কাটতে দেখি নি তো।'

—'জানোয়ার? কী জানোয়ার? হাতি-টাতি?'

—'উহু। বেয়াড়া জানোয়ার। ছদিকে ঝপাং ঝপাং ক'রে হাত ফেলে সাঁতার কাটছে। আর ওদের পিঠের ওপরে ব'সে পাঁচ-ছ'জন ক'রে মানুষ।'

—'দূর বোকা বর। জলে জানোয়ারের পিঠে চ'ড়ে মানুষ কখনো বেড়াতে পারে?'

—'বেড়াতে পারে কি, বেড়াচ্ছে। বিশ্বাস না হয়, পাহাড়ে উঠে দেখ।'

বিষম কৌতূহলে নিনি চঞ্চল হরিণীর মতন দ্রুত চরণে পাহাড়ের উপরে গিয়ে উঠল। সবিস্ময়ে দেখলে, টুঁটুঁর কথা তো মিথ্যা নয়। একটা নয়, ছটো নয়, পরে পরে বিশ-পঁচিশটা অদ্ভুত জানোয়ার।

তাদের প্রত্যেকের পিঠে রয়েছে পাঁচ-সাত জন ক'রে মানুষ।

নিনি সভয়ে বললে, 'ওরে বর, জানোয়ারগুলো যে একে একে আমাদের কাছেই তীরে এসে দাঁড়াচ্ছে। ঐ দেখ, মানুষগুলোও ওদের পিঠ থেকে ডাঙায় লাফিয়ে পড়ছে। চল, পালাই চল।'

ঢুঁঢুঁ বললে, 'না রে, ওরা আমাদের দেখতে পায় নি। এইখানে লুকিয়ে থেকে ওরা কি করে দেখ না।'

সে-যুগে মানুষের মন ছিল অনেকটা জন্তুর মত। পথে একটা কুকুরের সঙ্গে আর একটা অচেনা কুকুরের দেখা হ'লেই মারামারি কামড়া-কামড়ি হয়। তখনও চেনাশুনা না থাকলেই এক মানুষ করত আর এক মানুষকে আক্রমণ বিনাবাক্যব্যয়ে। আজ হাজার হাজার বৎসর পরেও মানুষ-শিশুর মনে এই ভাবেরই প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। অচেনা লোক দেখলেই শিশু ভয়ে কেঁদে ফেলে। কাজেই অন্তত পনেরো হাজার বছর আগেকার বুনো মেয়ে নিনির মনে অপরিচিতকে দেখে ভয়ের সঞ্চার হওয়াই স্বাভাবিক।

হঠাৎ ঢুঁঢুঁ, সচকিত কণ্ঠে বললে, 'ও বউ, দেখ দেখ। কুকুর। ওদের সঙ্গে বড় বড় কুকুর রয়েছে। কুকুরগুলো আবার ওদের সঙ্গে ল্যাজ নেড়ে লাফিয়ে লাফিয়ে খেলা করছে। মানুষের সঙ্গে কুকুরের ভাব। আজব কাণ্ড।'

হাঁহাঁ, হুঁহুঁ, ঢুঁঢুঁ প্রভৃতি যে সমাজে মানুষ হয়ে জন্মেছে, সে সমাজের কেউ কখনো গৃহপালিত জন্তুর কথা শোনে নি। জন্তু দেখলেই মাংস খাবার জন্যে তারা বধ করত, তাদের পোষ মানিয়ে কাজে লাগাবার চেষ্টা কেউ করত না।

নিনি বললে, 'দেখ বর, দেখ। একটা মানুষ আমাদের খুব কাছে এসেছে। এ কোন দেশের নতুন মানুষ?'

—'হ্যাঁ রে বউ, তাইতো! ওর গায়ের রং আমাদের মত কালো-কুচকুচে নয়, সাদা সাদা বিচ্ছিরি। ওর মাথার চুলগুলো আমাদের মত উস্কোখুস্কো নয়—সাজানো-গোছানো চকচকে!'

নিনি দুই চোখ পাকিয়ে দেখতে দেখতে বললে, 'ছি ছি ও কি কুচ্ছিৎ চেহারা! তোর নাকটি কেমন খাসা থ্যাবড়া, আর ওর নাকটা উঁচু, লম্বা! লোকটার গায়ে বড় বড় লোম পর্যন্ত নেই। গড়নও ছিপছিপে, তোর মতন বুক ওর চওড়া নয়। মাথাতেও বেমানান লম্বা। তুই কেমন বেঁটে-সেটে।'

ঢুঁঢুঁ বললে, 'আমরা চলি হেলেদুলে, আর ওরা চলছে সিধে হয়ে গট গট ক'রে! আবার দেখ, ওরা আমাদের মত চামড়ার কাপড় পরতে জানে না! ওরা কি দিয়ে কাপড় তৈরি করেছে বল দেখি!'

নিনি তাচ্ছিল্যভরে বললে, 'কে জানে! আরে ছ্যাঃ, ওগুলো কি মানুষ, না টিকটিকি? তুই একলা এক চড়ে ওদের পাঁচ-সাতজনকে মেরে ফেলতে পারিস।'

—'চুপ বউ, কথা কোস নে। লোকটা পাহাড়ের ওপরে উঠছে। দাঁড়া, ওকে একটু মজা দেখাই!'

লোকটা চারিদিকে তাকাতে তাকাতে পাহাড়ের উপরে উঠছে ধীরে ধীরে, শিয়রে যে কত-বড় বিপদ ওঁৎ পেতে আছে সেটা টেরও পেলে না।

ঢুঁঢুঁ পাহাড়ের গা থেকে বেছে বেছে মস্ত একখানা পাথর তুলে নিলে। তারপর বেশ টিপ ক'রে পাথরখানা ছুঁড়লে।

লোকটা বেজায় জোরে আর্তনাদ ক'রে একেবারে ঠিকরে সটান প'ড়ে গেল, তারপর পাহাড়ের ঢালু গা ব'য়ে গড়াতে গড়াতে নেমে গেল নীচের দিকে!

তার চীৎকার শোনবামাত্র নদীর ধার থেকে দলে দলে লোক ছুটে আসতে লাগল—সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো প্রকাণ্ড কুকুরও!

নিনি নিজেদের গুহার পথে ছুটতে ছুটতে বললে, 'ও বর, পালিয়ে আয় রে!'

কিন্তু তার কথা শোনবার আগেই ঢুঁঢুঁ পালাতে শুরু করেছে!

বনজঙ্গল ভেঙে, খানা-ডোবা ডিঙিয়ে, পাহাড়ের চড়াই-উৎরাই

পার হয়ে ঢুঁঢুঁ ও নিনি যখন গুহার কাছে গিয়ে পড়ল, হাঁহাঁ তখন সপরিবারে গুহার সামনে ভোজে বসেছে। ভোজ তো ভারি! কতগুলো গাছের শিকড় ও বন্য কুকুরের আধপোড়া মাংস।

হাঁহাঁ কুকুরের একখানা আস্ত ঠ্যাং তুলে নিয়ে, তার রান-য়ে মস্ত কামড় মেরে খুব-খানিকটা মাংস ছিঁড়ে নিয়ে বললে, 'আরে আরে, জামাইটার সঙ্গে আমার বেটি অমন ছুটে আসছে কেন রে?'

হুয়া বললে, 'তাইতো কর্তা! তোর প্রতাপে দেশ তো এখন ঠাণ্ডা, তবু ওরা ভয় পেয়েছে কেন?'

সত্যি, আশ্চর্য হবার কথাই বটে! হাঁহাঁর খোকা-আগুনের গুণ দেখে কেবল যে গুহা-ভাল্লুকরা ও খাঁড়াদেঁতোরাই সেখান থেকে চম্পট দিয়েছে, তা নয়; হুঁহুঁ-সর্দারের মত আরো কয়েকজন ছোট-বড় সর্দার ভক্তের মতন এসে তার দল খুব ভারি ক'রে তুলেছে। সে অঞ্চলে হাঁহাঁর শত্রু কেউ নেই, সকলেরই মুখে তার জয়ধ্বনি! সকলেই জানে এখন হাঁহাঁ-সর্দারের আশ্রয়ে থাকার মানেই হচ্ছে, পর্বতের আড়ালে থাকা। এদেশে তার মেয়ে-জামাইকে ভয় দেখাবে, এতবড় বুকের পাটা কার?

ঢুঁঢুঁ কাছে এসেই বললে, 'ওরে শ্বশুর, নতুন মানুষ এসেছে!'

হাঁহাঁ আশ্চর্য হয়ে বললে, 'আমি জানিনা, আমার মুল্লুকে নতুন মানুষ!'

নিনি বললে, 'হ্যাঁ রে বাপ! তারা জানোয়ারের পিঠে চ'ড়ে নদীর জলে বেড়ায়, তাদের রং সাদা, গায়ে লোম নেই, নাক খ্যাঁদা নয়! হাড়-কুচ্ছিৎ!'

ঢুঁঢুঁ বললে, 'গতরেও তারা আমাদের আধখানা! আমাদের চেয়ে মাথায় তারা লম্বা হ'তে পারে, কিন্তু চওড়ায় তারা একদম বাজে! তুই ফুঁ দিলে তারা উড়ে যায় রে সর্দার!'

—'ফুঁ দেব না রে হুঁহুঁর বেটা, খোকা-আগুনকে লেলিয়ে দেব। আমার মুল্লুকে নতুন মানুষ! দলে তারা পুরু নাকি রে?'

—'হ্যাঁ সর্দার!'

—'আমাদের চেয়েও?'

—'তা হবে না বোধ হয়।'

—'কোথায় তারা?'

—'কল-কল নদীর ধারে।'

হাঁহাঁ একবার আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকালে। চারিদিকে গোধূলির আলো জ্বলছে, পাখিরা ঝাঁকে ঝাঁকে ফিরে আসছে বাসার পানে।

টুটু বললে, 'কল-কল নদীর ধারে এখন যেতে-যেতেই আঁধার নামবে রে বাপ!'

হাঁহাঁ বললে, 'হ্যাঁ। আচ্ছা, আজকের রাতটা চুপচাপ থাকা যাক, কি বলিস রে?'

—'সেই ভালো।'

—'তারপর কাল সকালে দলবল নিয়ে নতুন মানুষদের ঘাড় ভাঙতে যাব।' ব'লেই হাঁহাঁ আবার কুকুরের আধপোড়া ঠ্যাংখানা হাতে ক'রে তুলে নিলে।

নবম পরিচ্ছেদ

হারা আলো

কলকল-নদীর অশ্রান্ত কল্লোলে সেখানে সঙ্গীতের অভাব হয় নি কোনদিন, একমুহূর্তের জন্যে।

কোকিল আছে, পাপিয়া আছে, ময়ূর আছে—আরো কত রঙ-বেরঙের পাখি আছে, সকলকার নাম কে করে? চুটকি সুর শোনাবার জন্যে আছে ভোমর, আছে মৌমাছি। তারা সবাই হচ্ছে বনভূমির বাঁধা গাইয়ে। মাইনে পায় যত খুশি পাকা ফল, ফুলের মৌ।

অরসিক পাখিগুলোও ছিল তখন। কাক, চিল, চড়াই, প্যাঁচা। কা-কা-কা-কা, চিঁহি-চিঁহি, কিচির-মিচির, চ্যাঁ-চ্যাঁ-চ্যাঁ-চ্যাঁ ক'রে চেঁচিয়ে যারা ভাবে জবর ওস্তাদি গান গাইছি।

মর্মরিত বনভূমি রাগ ক'রে বলে—মর মর মর মর, কিন্তু অরসিকরা মরতে কিংবা চুপ করতে রাজি নয়। তারা আজও মরে নি বা চুপ করে

নি। অসাধারণ তাদের ধৈর্য।

এই সঙ্গীতের সুরে-বেসুরে মুখরিত নদীর ধারে একটা উঁচু জমির উপরে নূতন মানুষদের তাঁবু পড়েছে সারে সারে।

হাঁহাঁদের সঙ্গে এদের চেহারার কত তফাৎ! হাঁহাঁদের কপাল, নাক, চিবুক, গলা ও চলবার কায়দা ছিল বনমানুষের মত, কিন্তু এদের দেখলে তোমরা মনে করতে, 'হ্যাঁ, এরা আমাদেরই জাত বটে।' এই নতুন মানুষদের বংশধররা আজও ভারতের নানা স্থানে বাস করে ব'লে বিশ্বাস হয়। হয়তো অন্য জাতির সঙ্গে মিশে এরাই পরে দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত দ্রাবিড়ী সভ্যতা গ'ড়ে তুলেছিল। মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পায় যে পাঁচ হাজার বৎসর আগেকার রাজ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, তার সঙ্গেও নতুন মানুষদের সম্পর্ক ছিল, এমন অনুমানও করা যেতে পারে।

ইতিহাস বলে, আর্যরা যখন মধ্য-এশিয়া থেকে ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন উত্তর ভারতে যারা বাস করত তাঁদের সঙ্গে তারা অনেককাল ধ'রে যুদ্ধ করেছিল।

তারা কারা? আমরা যাদের কথা এখন বলছি তারাই যে বিদেশী আর্যদের কবল থেকে স্বদেশকে বাচাবার চেষ্টা করেছিল, এমন অনুমানের যথেষ্ট কারণ আছে। বহুযুগব্যাপী সেই যুদ্ধে বার বার হেরে তারা ক্রমশ বিন্ধ্যাচল পার হয়ে ভারতের দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করে। আর্যরা তাদের নিয়ে আর বেশী মাথা ঘামান নি এবং মাঝে মাঝে মাথা ঘামিয়েও আর তাদের স্বাধীনতা হরণ করতে পারেন নি। এমনকি মুসলমান-প্রভাব স্বীকার ক'রে সমগ্র আর্যাবর্তের আর্যরা যখন ম্রিয়মান, দক্ষিণ ভারত তখন এবং তারপরেও দীর্ঘকাল পর্যন্ত আপন স্বাধীনতা রেখেছিল অক্ষুণ্ণ।

আর্যরা তাদের 'অমানুষ' বলতেন না বটে, কিন্তু তারা আর্য জাতীয় নয় ব'লে ঘৃণাভরে তাদের 'অনার্য' নামে ডাকতেন। 'অনার্য' বলতে অসভ্য বোঝায় না। কারণ তারাই জ্বেলেছিল ভারতবর্ষে প্রথম সভ্যতার প্রদীপ। আর্যরা যখন প্রথম ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তখন

সেই সভ্যতার প্রদীপশিখা বড় অল্প-উজ্জ্বল ছিল না।

আর্যদের মতন এই নতুন মানুষরাও বাহির থেকে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল। পৃথিবী তখন আজকের মতন জনবহুল ছিল না, তার অধিকাংশই ছিল নির্জন। কোথাও যখন খাবারের অভাব হ'ত বা অধিকতর পরাক্রান্ত জাতির কাছে আর এক জাতি পরাজিত হত, তখন এক দেশের লোক চ'লে যেত দলে দলে অন্য দেশে।

এইরকম সব কারণে একদল নতুন (বা 'ক্রো-ম্যাগ্নন' জাতীয়) মানুষ য়ুরোপে প্রবেশ করে। কারুর মতে তারা এসেছিল উত্তর আফ্রিকা থেকে, কেউ বলেন, এশিয়া থেকে। তারপর সেখানে হাঁহাঁদের জাত-ভাইদের হারিয়ে আস্তানা স্থাপন করে। এবং মেসোপটেমিয়া বা পারস্য অঞ্চল বা অন্য কোথাও থেকে আর একদল ঢোকে ভারতবর্ষে। হাঁহাঁদের জাতের চেয়ে সভ্যতায় ও চেহারায় তারা ছিল অনেক উন্নত। পণ্ডিতরা তাদের পৃথিবীর প্রথম সত্যিকার মানুষ বলেন। এবং তারাও হাঁহাঁদের জাতকে মানুষের জাত ব'লে মনে করত না। অনেকের মত হচ্ছে, পৃথিবীর সব দেশেরই পুরাতন রূপকথায় যেসব ভীষণদর্শন রাক্ষস-খোক্কসের বর্ণনা পাওয়া যায়, হাঁহাঁদের জাতের মানুষ থেকেই তাদের উৎপত্তি।

হাঁহাঁদের জাতের কোন মানুষ আজ আর পৃথিবীতে বেঁচে নেই। প্রাচীন মিশরী ও ইতালির আদিম বাসিন্দা ইত্রাস্কান প্রভৃতি জাতিদের মত তারাও লুপ্ত হয়ে গেছে। সম্ভবত একালের কোন কোন অসভ্য জাতিদের মধ্যে খুঁজলে তাদের রক্ত পাওয়া যাবে।

আর্যদেরও নানা দল পরে নানা কারণে তাঁদের প্রথম স্বদেশ মধ্য এশিয়া ছাড়তে বাধ্য হন। একদল আসে ভারতবর্ষে, আর একদল যায় পারস্যে, আর একদল ঢোকে য়ুরোপে। এই তিন দেশেই তখন প্রথম সত্যিকার মানুষরা বাস করত। তিন দেশেই যুদ্ধে তারা আর্যদের কাছে হেরে যায়। হেরে কতক এদিক-ওদিকে স'রে পড়ে এবং কতক মিলেমিশে যায় আর্যদেরই সঙ্গে। য়ুরোপে যেমন আর্যদের সঙ্গে

মিশেছে অনার্যদের রক্ত, ভারতেও তেমনি মারাঠী, বাঙালী, বিহারী ও যুক্ত প্রদেশের হিন্দুস্থানী প্রভৃতি জাতিদের মধ্যে অনার্য রক্ত আছে।

গল্প শুনতে শুনতে এসব কথা হয়তো তোমাদের শুকনো ব'লে মনে হচ্ছে! বেশ, তবে গল্পই শোনো।

বলছিলুম কি, কলকল-নদীর ধারে একটা উঁচু জমির উপরে পড়েছে নতুন মানুষদের তাঁবু। তাঁবুগুলো জানোয়ারদের শুকনো চামড়া সেলাই ক'রে তৈরি।

কিন্তু হাঁহাঁদের মতন তারা চামড়া পরে না। তারা পরে গাছের ছালে তৈরি পোশাক—ভারতে যা বল্কল বা বাকল নামে বিখ্যাত।

নিনির মত শুনেছ তো? তারা নাকি ফর্সা! হ্যাঁ, তারা নিনিদের চেয়ে ফর্সা নিশ্চয়ই, কিন্তু তাদের বর্ণ গৌর বলা যায় না। আর্যদের চোখে তারা কালোই ছিল। যেমন কাফ্রীদের চোখে আমরা ফর্সা হলেও সাহেবদের চোখে কালো।

নতুন মানুষদের অনেকগুলো দল উত্তর ভারতের নানা দিকে গিয়েছে। একটা দল এসেছে এইখানে। ছেলে বুড়ো-মেয়ে বাদ দিলেও দলে সক্ষম যোদ্ধা আছে তিনশোর কম নয়।

সেদিন সকালে আলোর সঙ্গে পাখিরা জেগে উঠেই দেখলে, নতুন মানুষদের দলে রীতিমত সাড়া প'ড়ে গেছে।

তাঁবুর ভিতরে ব'সে মেয়েরা জিনিসপত্তর গুছিয়ে রাখছে, কেউ শিকারে মারা জানোয়ারের রোমশ ছালে তৈরি বিছানা তুলে নিয়ে রোদে শুকোতে দিতে যাচ্ছে, কেউ নদী থেকে মাটির কলসী ভ'রে জল নিয়ে আসছে, কেউ মাটির বাসন-কোসন মাজছে, কেউ উনুন ধরাচ্ছে। পৃথিবীর কোথাও তখন কোন ধাতু আবিষ্কৃত হয় নি, মাটির বাসনই ছিল অতি বড় সভ্যের ব্যবহার্য। দলের সর্দার ও হোমরা-চোমরারা বড়জোর পাথরের ঘটি, বাটি, থালা ব্যবহার ক'রে বিলাসিতার পরিচয় দিতে পারতেন।

এ দলের সর্দারের নাম সূর্য। দলের মধ্যে সবচেয়ে তেজী, বলী

ও বুদ্ধিমান ব'লেই তিনি সর্দারির পদ পেয়েছেন। সেযুগে সর্দারের ছেলে বা ভাই হ'লেই কেউ সর্দারি পেত না। দলের লোকরা যাকে যোগ্য ও বুদ্ধিমান মনে করত সর্দারি দিত তাকেই।

সূর্য-সর্দারের দুই ছেলে—অগ্নি ও বায়ু! এক মেয়ে, নাম আলো।

প্রথম যুগের মানুষরা সকলেই ছিল প্রকৃতির ভক্ত। সূর্য-চন্দ্রের উদয়াস্ত-লীলা, ঝঞ্ঝা-পবনের বিরাট শক্তি, মহাসাগরের নৃত্যশীল অসীম উচ্ছ্বাস, অনাহূত আকাশের অনন্ত নীলিমা প্রভৃতি দেখে তাদের মন হ'ত বিস্মিত, অভিভূত। ভাষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষরা প্রাকৃতিক প্রত্যেক বিশেষত্বের এক-একটা নাম রাখলে এবং সেই সব নামেই নিজেদেরও ডাকতে শুরু করলে। এ প্রথা আজও লুপ্ত হয় নি।

সূর্য-সর্দার বলছিলেন, 'ওরে অগ্নি, নতুন দেশে এসেছি, কোথায় কি পাওয়া যায় জানিনা তো! খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কি হবে?

অগ্নির বয়স বছর চব্বিশ, বায়ুর চেয়ে তিন বছরের বড়। ছিপছিপে অথচ বলিষ্ঠ দেহ, তার চোখ, হাত, পা সর্বক্ষণই চাঞ্চল্য প্রকাশ করছে! সে বললে, 'কেন বাবা, কাল আসতে আসতে বনে তো অনেক হরিণ দেখেছি! বায়ুকে নিয়ে আমি শিকারে চললুম।'

—'কিন্তু শিকার যদি না পাস?'

শিকার না পাওয়া তখন বড় ভাবনার বিষয় ছিল। কারণ মানুষ তখনো চাষ করতে শেখেনি, ভাত, ডাল, রুটি প্রভৃতি দিয়ে উদর পূরণ করবার উপায় ছিল না। শাক-সব্জির ব্যবহারও ছিল না। বড়-জোর বনে কোন কোনরকম ফল-মূল পাওয়া যেত। কিন্তু মাংসই ছিল প্রায় একমাত্র আহার্য।

এমন সময়ে এক কোণ থেকে কোঁকড়ানো চুল দুলিয়ে আলো ছুটে এল। বয়স ষোলো। দাদা অগ্নির মতই চঞ্চল। মুখে-চোখে উছলে উঠছে কৌতুকহাসি। এসেই বললে, 'বাবা, বাবা! দাদা বনে হরিণ দেখেছে, আর আমি দেখেছি ঐ নদীতে বড় বড় মাছ!'

সূর্য-সর্দার সস্নেহে মেয়ের মাথায় হাত রেখে বললেন, 'ভালো

খবর দিলি। চল, তোকে নিয়ে নদীতে মাছ ধরতে যাই। আমার আজ শিকারে যাবার বা এখান থেকে নড়বার উপায় নেই—নতুন জায়গায় এসেছি, সবাই কথায় কথায় পরামর্শ করতে আর উপদেশ নিতে আসছে।······বায়ু, নিয়ে আয় তো আমার হাত-সুতো।'

বায়ু এনে দিলে। তখনো ছিপের বা জালের আবিষ্কার হয় নি, বেশী-সভ্য মানুষরা চামড়ার তন্ত্র দিয়ে তৈরি হাত-সুতোয় পাথর বা হাড় দিয়ে প্রস্তুত বঁড়সি পরিয়ে মাছ ধরত। কিন্তু মাছ ধরবার এ কৌশলও তখন হাঁহাঁ-হুঁহুঁদের জগতে ছিল স্বপ্নেরও অগোচর।

বাবার সঙ্গে প্রায় নাচতে নাচতে আলো বেরিয়ে গেল তাঁবুর ভিতর থেকে।

অগ্নি তখন নিজের ও ভাইয়ের জন্যে অস্ত্রশস্ত্র বার করছে। চকমকি পাথরের কুঠার, ছুরি, বর্শা। আরো দুটি অস্ত্র বার করলে—সে যুগের যা অশ্রুতপূর্ব মহাআবিষ্কার! ধনুক! বাঁশের ধনুক, কঞ্চির বাণ। বাণের ফলা পাথরের। তখনো তূণ গড়তে কেউ শেখেনি, তাই বাণগুলোকে গোছা ক'রে দড়িতে বেঁধে দেহের পাশে ঝুলিয়ে রাখা হ'ত।

অগ্নি ব্যবহার করতে শিখে জীবরাজ্যে মানুষ প্রথমে হয়েছিল সবচেয়ে বেশী শক্তিধর। তার পরের প্রধান আবিষ্কাররূপে ধনুকবাণের নাম করলে ভুল হবে না। শিকারী মানুষদের পক্ষে এর চেয়ে বড় অস্ত্র আদিম পৃথিবীতে কেউ কল্পনাও করতে পারে নি। কেবল আদিম পৃথিবীতে কেন, মধ্যযুগের সভ্য পৃথিবীও যুদ্ধক্ষেত্রে ধনুকবাণকেই মনে করত সবচেয়ে বড় অস্ত্র। আধুনিক যুগেও যেসব পশ্চাৎপদ জাতি বনে-জঙ্গলে বসতি বাঁধে, ধনুকবাণই হচ্ছে তাদের আত্মরক্ষার ও শিকার সংগ্রহের প্রথম উপায়। এই সেদিনও তিব্বতীরা ধনুকবাণ নিয়ে পাল্লা দিতে চেয়েছিল ইংরাজদের বন্দুকের সঙ্গে। একশো বছর আগে জাপানীরাও ব্যবহার করত ধনুক ও বাণ

অগ্নি ও বায়ু তাঁবুর ভিতর থেকে বেরিয়ে দেখলে, দলের অন্যান্য লোকরা এখানে-ওখানে নানা কাজে ব্যস্ত। কেউ পাথরের ছেনি মুগুর দিয়ে চকমকি

কেটে অস্ত্র তৈরি করছে, কেউ ভোঁতা অস্ত্র ঘ'ষে ঘ'ষে ধারালো ক'রে তুলছে, কেউ ফলগাছে উঠে ফললাভের চেষ্টায় নিযুক্ত হয়ে আছে।

অগ্নি চেঁচিয়ে বললে, 'আমার সঙ্গে কে শিকারে যাবে এস।'

জন-ছয়েক লোক তাদের সঙ্গী হ'ল। গোটাচারেক কুকুরও পিছু নিলে।

বায়ু বললে, 'বাঃ, আর কেউ যে এল না? ওরা কি আজ উপোস করবে?'

উত্তরে সঙ্গীদের একজন বললে, 'হুঁঃ, ওরা উপোস করবার পাত্রই বটে!'

—'তবে? ওরা কি হাওয়া খেয়েই উপবাস ভঙ্গ করবে?'

—'ক'দিন সমানে পথ হেঁটে হেঁটে ওরা ভারি শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। এখানকার নদীতে অনেক মাছ আর গাছে অনেক পাখি দেখে ওরা স্থির করেছে আজ আর বনে-জঙ্গলে ঢুকবে না। মারবে গাছের পাখি, ধরবে নদীর মাছ।'

অগ্নি বললে, 'আমাদের দল বড় অল্পেই কাবু হয়ে পড়তে শুরু করেছে। পনেরো দিনে একশো ক্রোশ পথ হেঁটে যাদের পায়ে ব্যথা হয়, তাদের আমি পুরুষ ব'লে গণ্য করি না।'

এমনি সব কথা কইতে কইতে আটজন শিকারী প্রথমে অনিবিড় জঙ্গল ও তারপর গভীর অরণ্যের ভিতরে গিয়ে পড়ল। সেজঙ্গল এমন নিরেট, স্তব্ধ ও স্থির যে তার বহুস্থানেই যেন বায়ু-চলাচল পর্যন্ত নেই! পাখিরা পর্যন্ত সেসব জায়গায় ঢুকতে বোধহয় ভয় পায়, কারণ গান না গেয়ে যারা থাকতে পারে না সেখানে তারা একেবারেই নীরব। মাঝে মাঝে পথ ও একটু-আধটু খোলা জমি, বাকি সর্বত্রই মস্ত মস্ত গাছ পরস্পরকে জড়াজড়ি ক'রে লতাগুল্মে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তাদের তলায় অন্ধকারের সঙ্গে যেন সন্ধ্যার ম্লান আলো আলাপ করছে মৌন ভাষায়। চারিদিকেই কি যেন একটা বুকচাপা ভয় দম বন্ধ ক'রে ব'সে আছে, চারিদিকেই কারা যেন অদৃশ্য পা ফেলে জীবনকে হত্যা করবার পরামর্শ করছে নির্বাক মুখে, অজানা ইঙ্গিতে!

পাছে কোন পশু মানুষের পায়ের শব্দ শুনে সাবধান হয়ে পালিয়ে যায়, সেই ভয়ে শিকারীরা পা টিপে টিপে এগিয়ে চলল। নতুন মানুষরা প্রথম সভ্যতার আস্বাদ পেলেও তখনো তারা বন্য প্রকৃতিরই আদিম সন্তান। তারা যেমন নিঃশব্দে অরণ্যের সঙ্গে মিশিয়ে থাকতে পারত, একালের কোন অর্ধ-সভ্য মানুষও তা পারে না।

এমন সময়ে এক কাণ্ড হ'ল। কথাটা খুলেই বলি।

তোমরা সেই গুহাবাসী ভাল্লুক ও ভাল্লুকীকে নিশ্চয়ই ভোলো নি। তারা পুরানো বাসা ছেড়ে এই অরণ্যেরই নিকটবর্তী এক গিরিগুহায় এসে আশ্রয় নিয়েছিল। ভেবেছিল মানুষের মুখ আর দেখবে না। অপয়া মুখ!

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে ভাল্লুকী জানালে যে, মৌচাকের সন্ধানে সে বনের ভিতরে একবার টহল মেরে আসতে চায়। ভাল্লুকও মতপ্রকাশ করলে, এ প্রস্তাব মন্দ নয়। সেও যাবে।

দুজনেই ঊর্ধ্বমুখে এগিয়ে আসতে আসতে দেখছিল, কোন গাছের ডালে আছে মৌমাছিদের বাসা!

হঠাৎ একটা জঙ্গলের ভিতর থেকে প্রথম বেরিয়ে ভাল্লুক চমকে ও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল! হাত বিশ তফাতেই ক-জন মানুষ!

মানুষরাও তাকে দেখেছিল, তারাও বড় কম চমকে উঠল না। জঙ্গলের ভিতর থেকে ভাল্লুক-জায়ার আওয়াজ এল—'ঘুক ঘুক?' অর্থাৎ 'ব্যাপার কি?'

দারুণ ঘৃণায় ও ক্রোধে ভাল্লুক বললে, 'ঘোঁৎ ঘোঁৎ, ঘোঁৎউম, ঘোঁৎউম!'—অর্থাৎ 'দু-চোখের বালি গিন্নী, মানুষ—মানুষ!'

গিন্নী বললে, 'ঘোঁৎকু, ঘোঁৎকু'—অর্থাৎ 'বল কি, বল কি' বলতে বলতে সেই ঝোপ থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল।

ওদিকে অগ্নি বললে, 'হুঁশিয়ার! চটপট সবাই ধনুকে বাণ লাগাও!'

সকলেই চোখের নিমেষে ধনুকে জুড়লে বাণ!

কিন্তু ভাল্লুক ভয় পেলে না, ভাল্লুকীও নয়। কারণ তারা এরিমধ্যে চট ক'রে দেখে নিয়েছিল যে, এই ধড়ীবাজ মানুষগুলোর হাতে

সেই দাউদাউ, জ্বলজ্বল-করা ভয়ানক জিনিসগুলো নেই।

উঁচু হয়ে, হেঁট হয়ে, ঘাড় কাৎ ক'রে, একটু এপাশে একটু ওপাশে গিয়ে ধনুকবাণগুলো ভালো ক'রে দেখে নিয়ে ভাল্লুক বললে, 'গিন্নি, হেসেই মরি। এই মানুষগুলো গোটাকয় কাঠি নিয়ে আমাদের ভয় দেখাতে এসেছে!'

ভাল্লুকী বললে, 'কর্তা, মধু নয়, অনেকদিন পরে আজ আবার মানুষ খাব। চল, ওদের ঘাড় ভাঙি।'

ভাল্লুক ও ভাল্লুকী তেড়ে এল।

অগ্নি বললে, 'ছাড়ো বাণ!'

বন-বন ক'রে এক ঝাঁক তীর ছুটে এল। পাথরের তীর হ'লেও ঘ'ষে ঘ'ষে তাদের ফলাগুলো এমন সূচালো ক'রে তোলা হয়েছে যে, গণ্ডার ছাড়া আর সব জীবের চামড়া ভেদ করতে পারে অনায়াসেই। ভাল্লুকের পিঠের উপরে ও সামনের ডান পায়ের উপরে এসে বিঁধল দুটো বাণ। ভাল্লুকীর বিশেষ কিছু হ'ল না বটে কিন্তু একটা বাণে তার এক কান হয়ে গেল এ-ফোঁড় ও-ফোঁড়।

ভাল্লুক গাঁক-গাঁক ক'রে চেঁচিয়ে দৌড়তে দৌড়তে বললে, 'পালাও গিন্নি, পালাও! আমি পালালুম!'

ভাল্লুকী কর্তার উপদেশ শোনবার জন্যে অপেক্ষা করে নি, আগেই অদৃশ্য হয়েছে।

বন পেরিয়ে, পাহাড়ে উঠে, গুহায় ঢুকে জিভ বার ক'রে শুয়ে প'ড়ে ভাল্লুক দেখলে, ভাল্লুকী আগেই সেখানে হাজির হয়ে ফোঁড়া কানটা ক্রমাগত নাড়ছে!

ঘোঁৎ-ঘোঁৎ ক'রে ভাল্লুক বললে, 'কী দেখলুম! কাঠি ছুঁড়ে কাবু করলে।'

ভাল্লুকী ছটফট করতে করতে বললে, 'জ্ব'লে মরি গো, জ্বলে মরি! এ কানে আর শুনতে পাব না!'

ভাল্লুক বললে, 'এ বনও ছাড়তে হ'ল গিন্নি। চল, আমরা হিমালয়ে

গিয়ে উঠি। মানুষ সেখানে যাবে না।'

ভাল্লুকী সায় দিয়ে বললে, 'তাই ভালো কর্তা! মানুষগুলো কাপুরুষ। তারা আমাদের কাছে আসে না। দূর থেকে কী সব ছোড়ে, কিচ্ছু মানে হয় না। ওদের দেখলে ঘেন্না হয়। ওদের কাছে থাকা অসম্ভব।'

তারা হিমালয়ে প্রস্থান করলে। আজও তাদের বংশধররা হিমালয়ে বাস করছে।

……ওদিকে সূর্য-সর্দার কলকল নদীর ধারে ব'সে মাছ ধরছেন। এরি মধ্যে মস্ত একটা মহাশের মাছ ধ'রে আবার তিনি জলে হাতসুতো ফেলেছেন।

মাছ ধরতে ধরতে মাঝে মাঝে তিনি মুখ তুলে দেখছেন, নদীর ওপারে অনেক দূরে নীলাকাশের তলায় সাদা নিরেট মেঘের মত স্থির হয়ে আছে চির-তুষারের চাদর গায়ে দিয়ে মহাগিরি হিমালয়। তার পায়ের তলায় প'ড়ে রয়েছে অগণ্য শিখর-কণ্টকিত বহুদূরব্যাপী ধূসর পর্বত-সাম্রাজ্য। তারও নীচে রয়েছে ক্রোশের পর ক্রোশ জুড়ে সীমাহীন নীল-অরণ্যের দেশ। বন যেখানে আরো কাছে নদীর ওপারের দিকে এগিয়ে এসেছে সেখানে তার রঙ হয়ে উঠেছে গাঢ়-শ্যামল থেকে ক্রমেই কচি-সবুজ। বনের আগেই এবং নদীর বালুরেখার পরেই দেখা যাচ্ছে দূর্বাঘাসে-মোড়া প্রান্তর, তার বুকে চরছে হরিণ ও বন্য মহিষের দল। মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড ম্যামথ-হাতিরা দল বেঁধে নদীর ধারে আসছে জল-পান করবার জন্যে। তাদের আগা বাঁকানো লম্বা লম্বা দাঁতগুলোর উপরে জ্ব'লে জ্ব'লে উঠছে সূর্যকর।

সূর্য-সর্দার নিজের মনেই বললেন, 'থাকবার জন্যে খুব ভালো জায়গাই নির্বাচন করা হয়েছে। এখানে জলাভাব হ'বে না, নদীতে আছে মাছ, গাছে আছে ফল আর পাখি, বনে আছে অগুন্তি শিকারের পশু। দীর্ঘকালের জন্যে নিশ্চিন্ত হ'তে পারব।'

আলো খানিকক্ষণ নদীর ধারে ব'সে বালি দিয়ে ছোট একটা কিম্ভুত-কিমাকার জন্তুর মূর্তি গড়বার চেষ্টা করলে। তারপর কিছুক্ষণ ধ'রে একটা মুখর কোকিলের ডাক নকল করতে লাগল। তারপর সুন্দর একটি প্রজাপতি দেখে ছুটল তারই পিছনে পিছনে। প্রজাপতিও ধরা দেবে না, সেও ছাড়বে না। ছুটতে ছুটতে সেই পাহাড়ের কাছে গিয়ে পড়ল, যার উপরে ফুলগাছ দেখে নিনি কাল আবদার ধ'রেছিল।

সূর্য-সর্দারের হাতসুতোয় তখন আর একটা মাছ টান মেরেছে, তিনি সুতো গুটিয়ে তাকে ডাঙায় আনতেই ব্যস্ত।

আচম্বিতে দূর থেকে আলোর ভীত, আর্তস্বর জাগল, 'বাবা, বাবা! রাক্ষস, রাক্ষস!'

সচমকে ফিরে দেখেই সূর্য-সর্দারের চক্ষু স্থির!

বিকটদর্শন বিপুলবপু এক ভয়াবহ মূর্তির কবলে প'ড়ে নিনি ধ্বস্তা-ধ্বস্তি করছে প্রাণপণে এবং পাহাড়ের উপর থেকে নেমে আসছে সেই রকম দেখতে আরো চার-চারটে মূর্তি! তারা হচ্ছে হাঁহাঁ, হুঁহুঁ, ঢুঁঢুঁ, টুটু, ঘটু।

প্রথমটা সূর্য-সর্দার স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এইমাত্র তিনি ভাবছিলেন এখানে এসে নিশ্চিন্ত হবেন, তা'হলে এখানেও রাক্ষসের দল আছে? অবশ্য এরা তাঁর অপরিচিত নয়, কারণ যেদেশ থেকে নতুন মানুষরা এসেছে সেখানেও এই রকম রাক্ষসরা তাঁদের উপরে অত্যাচার করে! এরা মানুষদের মেয়ে ধ'রে নিয়ে যায় এবং পুরুষদের নিয়ে গিয়ে মেরে মাংস খায়। তা'হলে কাল তার দলের একজন লোককে পাথর ছুঁড়ে মেরেছিল এরাই?

আলো কাতর স্বরে আবার ডাকলে, 'বাবা, বাবা, বাবা!'

কি বিপদ! তিনি যে নির্বোধের মত কোন অস্ত্র না নিয়েই মাছ ধরতে এসেছেন! তবু শুধুহাতেই মেয়ের দিকে ছুটলেন।

ওদিকে দলের অন্যান্য লোকরাও আলোর আর্তনাদ শুনতে পেয়েছিল। চারিদিক থেকে হৈ-হৈ রব তুলে তারাও বেগে ছুটে আসতে লাগল।

কিন্তু কেউ কাছে আসবার আগেই রাক্ষসরা আলোকে নিয়ে পাহাড় ও জঙ্গলের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সূর্য-সর্দার দলবল নিয়ে পাহাড়ের উপরে উঠলেন। কিন্তু কোথাও কেউ নেই। আলোর কান্নাও আর শোনা যায় না।

সূর্য-সর্দার পাগলের মতন চেঁচিয়ে উঠে বললেন, 'ওরে, আলো যে মা-মরা মেয়ে! আমিই যে তাকে নিজের হাতে মানুষ করেছি! খোঁজ, খোঁজ, চারিদিকে খোঁজ, সারা পৃথিবী খোঁজ! রাক্ষসদের হত্যা কর, যেখান থেকে হোক আলোকে আমার কোলে ফিরিয়ে আন!' বলতে বলতে শোকে ভেঙে তিনি সেখানেই ব'সে পড়লেন।

আলোর খোঁজে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল দলে দলে নতুন মানুষ।

সূর্য-সর্দার ভূমিতলে জানু পেতে ব'সে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে সাশ্রুনেত্রে ভগ্নস্বরে বললেন, 'সৃষ্টির প্রথম দেবতা, হে সূর্যদেব! অন্ধকার পৃথিবীতে আলো আনাই তোমার একমাত্র কর্তব্য। আমার অন্ধকার মনে আমার হারা আলোকে আবার ফিরিয়ে আনো প্রভু! হে সূর্যদেব! হে মানুষের প্রথম দেবতা'… …

দশম পরিচ্ছেদ

হুয়া আজও বেঁচে আছে

হাঁহাঁর বিপুল স্কন্ধের উপরে আলোর অজ্ঞান দেহ। তার পিছনে পিছনে আসছে হুঁহুঁ, চুঁচুঁ, টুটু ও ঘটু।

প্রথম অনেকখানি পথ তারা দ্রুতবেগে ঊর্ধ্বশ্বাসে পার হয়ে এল। এখানকার প্রকাশ্য ও গুপ্ত সমস্ত পথই তাদের নখদর্পণে এবং কোন পথ দিয়ে স'রে পড়লে এ প্রদেশে নব আগন্তুক অনুসরণকারীদের ফাঁকি দেওয়া সহজ হবে একথা তারা ভালোরকমই জানত।

কখনো নিবিড় জঙ্গলের মধ্যবর্তী ঘুটঘুটে শুঁড়ীপথ দিয়ে, কখনো পাহাড়ের মাঝখানকার খাদ লাফ মেরে পার হয়ে এবং কাঁটা তাদের রোমশ দেহের বিশেষ ক্ষতি করতে পারত না ব'লে কখনো কণ্টকবনের ভিতর দিয়ে এগিয়ে তারা অবশেষে এসে পড়ল নিজেদের গুহার অনতি-দূরে এক সবুজ রঙ-মাখানো উপত্যকায়।

তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে হাঁহাঁ কথা কইবার ফাঁক পেলে। হুঁহুঁকে ডেকে বলল, 'হ্যাঁরে, ও লোকগুলো কোন মুল্লুক থেকে এল, জানিস কিছু?'

হুঁহুঁ বললে, 'উহুঁ! ওগুলো কি মানুষ, না ক্ষুদে পোকার বাচ্ছা! কে ওদের নিয়ে মাথা ঘামায়?'

—'হ্যাঁ, আমাদের এক এক চড়ে ওদের মাথা গুঁড়ো হয়ে যাবে! ওরা দলে ভারি না হ'লে আমরা কখনই পালাতুম না।'

—'কিন্তু ওদের মাংস ভারি নরম ব'লেই মনে হ'ল!'

—'যা বলেছিস, ওদের দেখে আমার জিভে জল আসছিল রে!'

টুঁটুঁ বললে, 'চলনা রে শ্বশুর, আমরাও একদিন দল বেঁধে গিয়ে ওদের সবক'টাকে ধ'রে নিয়ে আসি!'

হাঁহাঁ সায় দিয়ে বললে, 'তাই যাব একদিন। অমন কচি মাংস হাতছাড়া করা হবে না।'

হুঁহুঁ বললে, 'কিন্তু ওদের গায়ে জোর কম হ'লেও হাতে অস্তর আছে, এটা ভুলিস না রে সর্দার!'

হাঁহাঁ বড়াই ক'রে বললে, আমার কাছেও খোকা-আগুন আছে, এটা ভুলিস না রে হুঁহুঁ!'

টুটু বললে, 'যাতে ভাল্লুক পালায়—'

ঘটু বললে, 'আর থাঁড়াদেঁতো মরে!'

হাঁহাঁ বললে, 'ঐ আগুনে পুড়িয়ে আমি ওদের মাংস খাব!'

হুঁহুঁ বললে, 'হয়তো ওরাও অন্য কোন ফুসমন্তর জানে। নইলে এখানে আসতে সাহস করে?'

ঢুঁঢুঁ বাপের কথায় সায় দিয়ে বললে, হ্যাঁ রে শ্বশুর, আমি নিজের চোখে ওদের তিনটে ফুসমন্তর দেখেছি।'

—'কি কি শুনি।'

—'কাল দেখেছি ওরা অনেকগুলো হাতওয়ালা জানোয়ারের পিঠে চ'ড়ে জলে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে।'

নতুন মানুষরা এসেছিল নৌকো ভাসিয়ে, দাঁড় ফেলে! এমুল্লুকে নৌকো কেউ দেখেনি, তাই ঢুঁঢুঁ সেই দাঁড়সুদ্ধ নৌকোগুলোকেই হাতওয়ালা জানোয়ার ব'লে মনে করেছে। বড় বড় গাছের গুড়ি কেটে, তাদের মাঝখানকার অংশ বার ক'রে ফেলে নতুন মানুষরা সেকেলে নৌকো তৈরি করত। বাংলাদেশের পল্লীগ্রামে এখনো এই উপায়েই কোন কোন শ্রেণীর নৌকো প্রস্তুত করা হয়।

হাঁহাঁ বললে, 'তুই আর কি দেখেছিস রে জামাই?'

—'আজ দেখলুম ওদের তিন-চার জন কলকল নদীতে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে ভেসে ওপারে গিয়ে উঠল।'

বানরদের মতন হাঁহাঁদের জাতের মানুষরাও নদীকে বড় ভয় করত, কারণ তারা সাঁতার কাটতে জানত না, বানর ও মানুষ জাতীয় কোন জীবই অন্যান্য অধিকাংশ পশুর মত সাঁতার কাটবার শক্তি নিয়েই জন্মগ্রহণ করে না। সাঁতার তাদের শিখতে হয়। নতুন মানুষরা মাথা খাটিয়ে সাঁতার কাটবার কায়দা আবিষ্কার করেছিল।

এইবারে হাঁহাঁ ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গিয়ে বললে, 'অ্যাঁ, বলিস কি রে, বলিস কি রে? মানুষ জলে চলে! বলিস কি রে?'

ঢুঁঢুঁ বললে, 'জলে গেলে তোর খোকা-আগুনও তো ম'রে যায়! ওরা জলে ঝাঁপ খেলে কি করবি তুই?'

—'ওদের ঝাঁপ খেতে দেব কেন রে বোকা? সে কথা যাক, আর কি দেখেছিস তুই?'

—'ওরা কি-একটা ছুঁড়ে জলে ফেলে দেয়, আর জলের মাছ ওঠে ডাঙায়। ওদের খাবারের ভাবনা নেই রে!'

হুঁহুঁ সভয়ে বললে, 'কে জানে ওদের আরো কত ফুসমন্তর আছে! ওরাও যে আগুন-মন্তর জানে না তাই বা কে বলতে পারে!'

আসলে নতুন মানুষরা আগুনকে আরো বেশী বশ করতে পেরেছিল। তারা কেবল অগ্নিকুণ্ডেই আগুন রাখত না, অন্ধকার দূর করবার জন্যে প্রদীপ গ'ড়ে তার গর্ভে চর্বি ও সলিতা রেখে আলো জ্বালাতে পারত এবং মশালের ব্যবহারও তাদের অজানা ছিল না।

কিন্তু চুঁচুঁর এসব দেখবার সুযোগ হয় নি। কাজেই হুঁহুঁর কথা শুনে বললে, 'ইস, আগুন-মন্তর জানবে ঐ মানুষ-পোকাগুলো? আরে ছ্যাঃ, অসম্ভব!'

এমন সময় আলোর জ্ঞান ফিরে এল। প্রথমটা সে কিছুই মনে করতে পারেনি। তারপর অনুভব করলে তার সর্বাঙ্গে রাশি রাশি কর্কশ লোমের মতন কি ফুটছে! তার নাকেও লাগল কেমন একটা বোঁটকা গন্ধ, আলিপুরের পশুশালায় গেলে এখন আমরা যেরকম দুর্গন্ধ পেয়ে নাকে কাপড়-চাপা দিই।—তখন তার সব মনে পড়ল। নিজের অবস্থা বুঝেই আবার সে চেঁচিয়ে কাঁদতে ও হাত-পা ছুঁড়তে শুরু ক'রে দিলে!

হাঁহাঁ তাকে এক ঝাঁকানি দিয়ে গজরে উঠতেই ভয়ে তার চীৎকার ও হাত-পা ছোঁড়া একেবারে বন্ধ হয়ে গেল!

সবাই তখন হাঁহাঁদের গুহার সামনে এসে পড়েছে।

ছেলেমেয়ে নিয়ে হুয়া গুহাপথের মুখে দাঁড়িয়েছিল। অত্যন্ত অবাক হয়ে দেখলে, তার স্বামীর কাঁধে ঝুলছে এক অদ্ভুত মেয়ের দেহ! তার মাথায় বাঁধা খোঁপা (হুয়া খোপা কখনো দেখেনি), গলায় দুলছে কড়ির মালা, দেহে বল্কলের বস্ত্র; তার রঙ কালো নয়, নাক থ্যাবড়া নয়, গলা খাটো নয়; তার মুখে দীর্ঘ দীর্ঘ দন্ত নেই, গায়ে লম্বা লম্বা লোম নেই, আঙুলে বড় বড় ধারালো নখ নেই! ওমা, এ আবার কেমন মেয়ে।

হুঁহুঁ আর চুঁচুঁ গুহার বাইরে ফর্দা জায়গায় থেবড়ি খেয়ে ব'সে পড়ল, কারণ ভিতরে যে তাদের প্রবেশ নিষেধ এ কথা আগেই বলা হয়েছে।

হাঁহাঁ গম্ভীর বদনে গুহার ভিতরে প্রবেশ করলে, কৌতূহলী হুয়াও চলল পিছনে পিছনে।

হাঁহাঁ ভিতরে গিয়ে আগে আলোকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিলে। একে বাপের কোল থেকে তাকে ছিনিয়ে আনা হয়েছে, তার উপরে যারা তাকে কেড়ে এনেছে, তাদের সে মানুষ ব'লেও ভাবতে পারছে না, তার চোখে এরা রাক্ষস ছাড়া আর কিছুই নয় এবং এরা যে তাকে কুচি কুচি ক'রে কেটে খেয়ে ফেলবে এই ভেবেই সে প্রায় মরো-মরো হয়ে পড়েছে, কাজেই আলো দু-পায়ে ভর দিয়ে মাটির উপরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে না, ধপাস ক'রে ব'সে প'ড়ে নতমুখে অশ্রুপাত করতে লাগল, নীরবে।

হাঁহাঁ বললে, 'হুয়া, দেখিস এ যেন পালায় না।'

হুয়া বললে, 'কোথাকার একটা ছুঁড়ীকে ধ'রে আনলি রে?'

—'যেখানকারই হোক, কিন্তু এটা যেন পালাতে না পারে!'

—'কেন, তুই একে নিয়ে করবি কি? মেরে খাবি?'

—'না।'

—'তবে? সংসারে আবার একটা পেট বাড়াবি কেন?'

—'সে কথা এখুনি নেই বা শুনলি?'

—'না, আমি শুনবই।'

—'আমি একে বিয়ে করব।'

হাঁহাঁদের মুল্লুকে পুরুষরা দুটো কেন, সময়ে সময়ে পাঁচটা-দশটাও বিয়ে করত। খালি হাঁহাঁদের মুল্লুকে কেন, সে সময়ে পৃথিবীর সব দেশেই পুরুষরা মোটে একটা বউ নিয়ে খুশি হ'তে পারত না। এ প্রথা আজও পৃথিবীর বহু দেশেই—এমন কি বাংলাদেশেও বর্তমান আছে। খালি সেকালে পুরুষরা নয় সেকালের মেয়েরাও সময়ে সময়ে একাধিক পুরুষকে বিবাহ করত। দেখনা, পরে ভারতবর্ষ যখন সভ্যতার উচ্চস্তরে উঠেছে, তখনো দ্রৌপদীর ছিল একটি-দুটি নয়, পাঁচ-পাঁচটি বর!

কিন্তু কোন যুগেই কোন স্বামী যেমন চাইত না যে, তার বউ একসঙ্গে অনেকগুলো বিয়ে করুক, তেমনি সতীন নিয়ে ঘর করতে হবে

শুনলে কোন স্ত্রীও কোনদিনই খুশি হ'তে পারে নি। হুয়াও খুশি হ'ল না।

আলোর দিকে একবার দৃষ্টিপাত ক'রে হুয়া বললে, 'এই এক ফোঁটা মেয়েকে তুই বউ করতে চাস নাকি রে?'

—'চাই।'

—'কেন, আমি কি মরেছি?'

—'তুই এখনো মরিস নি বটে, কিন্তু বেশী কথা কইলে এইবারে মরবি।' হাঁহাঁ হাতের মুগুরটা কাঁধের উপরে তুললে। আবার নামিয়ে মাটির উপরে সশব্দে রাখলে।

হুয়া বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক। বুঝলে, অত মোটা মুগুরের উপরে যুক্তি বা প্রতিবাদ চলে না। তার মুখ বোবা হয়ে গেল।

হঠাৎ বাহির থেকে টুটুর ব্যস্ত ডাক শোনা গেল—'বাবা, বাবা!'

—'কি রে টুটু!'

—'হাতি, হাতি!'

—'কোথায় রে, কোথায়?'

—'বনের গর্তে! হুঁহুঁদের লোক খবর এনেছে!'

হাঁহাঁ তাড়াতাড়ি গুহার কোণ থেকে কতকগুলো বর্শা তুলে নিয়ে বেগে পা চালিয়ে ভিতর থেকে অদৃশ্য হ'ল।

তা ব্যাপারটা হচ্ছে এই। সেকালের রোমশ ম্যামথ হাতি ও রোমশ গণ্ডার প্রভৃতি ছিল বিরাট জীব, একালের হাতি গণ্ডারের চেয়ে আকারে অনেক বড়। কিন্তু আদিম মানুষদের অস্ত্রশস্ত্র বলতে বোঝাত কেবল পাথরের বর্শা, কুঠার বা ছুরি-ছোরা এবং লাঠি। এসব দিয়ে তো আর হাতি, গণ্ডার বধ করা চলত না, কাজেই মানুষরা হাতি ও গণ্ডারদের চলাচলের পথে মস্ত মস্ত গর্ত খুঁড়ে তাদের মুখগুলো লতা-পাতা-ঘাস দিয়ে ঢেকে রাখত। হাতি বা গণ্ডার বুঝতে না পেরে লতা-পাতার আচ্ছাদনের উপরে পা দিলেই হুড়মুড় ক'রে গর্তের ভিতরে প'ড়ে যেত। তারপর মানুষরা এসে অস্ত্র ও বড় বড় পাথর ছুঁড়ে পাঠিয়ে দিত তাদের যমালয়ে। এখনো এই উপায়ে জন্তু শিকারের পদ্ধতি আফ্রিকায় ও

ভারতবর্ষে লুপ্ত হয় নি।

শিকারের পশু চিরদিনই তুর্লভ—বিশেষত সেই প্রস্তরযুগে। কত কষ্ট ক'রে, কত খোঁজাখুজির পর পাঁচ-সাতদিন অন্তর একটা হরিণ কি শূকর কি ভাল্লুক কি গরু পাওয়া যায়, একদল লোকের রাক্ষুসে ক্ষুধার মুখে তা উড়ে যেতে বেশীক্ষণ লাগে না। তারপর হয়তো দিনকয়েক পুরো বা আধা উপবাস! কারণ আগেই বলেছি, তখন চাষবাস ছিল না, মানুষ আসল খাবার বলতে বুঝত কেবল মাংসই। কাজেই সেকালের জীবন্ত পাহাড়ের মত একটা ম্যামথ হাতিকে বধ করতে পারলে মানুষ জীবনের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আনন্দ লাভ করত। অঢেল মাংস, আকণ্ঠ খেলেও দিন-কয়েকের আগে ফুরোয় না। এবং একথাও আগে বলা হয়েছে, আদিম মানুষদের পচা মাংসেও বিরাগ ছিল না। বরং পচা-মাংসই তারা বেশী ভালোবাসত। কারণ সত্য বধ করা পশুর মাংস হ'ত অত্যন্ত শক্ত, খেতে কষ্ট হ'ত। এ যুগের শিকারীরাও হরিণ প্রভৃতি বধ করলে অন্তত একদিন বাসি না ক'রে মাংস খায় না। অতএব বুঝতেই পারছ, সেকালে ম্যামথের মত প্রকাণ্ড জীবের দেহ অনেক দিন ধ'রেই তুলে রেখে দেওয়া হ'ত।

কাজেই হাঁহাঁ আলোর কথা ভুলে বেগে বেরিয়ে গেল। বউ যত-খুশি পাওয়া যায়, কিন্তু একটা ম্যামথের দাম দশ-বিশটা বউয়ের চেয়ে বেশী। প্রস্তরযুগের যুক্তি ছিল এইরকম।

হুয়া খানিকক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আলোকে দেখলে। তারপর এগিয়ে গিয়ে আলোর খোঁপাটা একবার টেনে কৌতূহলী স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, 'এটা কি রে?'

আলো তাদের ভাষা জানে না, কিছু বুঝতে পারলে না। একবার মুখ তুলে হুয়াকে দেখেই অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে আবার মুখ নামিয়ে ফেললে। হুয়া নারী হ'লেও তার কোন সান্ত্বনার কারণ নেই। রাক্ষসের বদলে রাক্ষসী, এইমাত্র!

হুয়া আরো অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করলে, 'তোর গায়ে লোম নেই

কেন?' 'তুই এত রোগা কেন?' 'তুই কাঁদছিস কেন?' প্রভৃতি···

কিন্তু আলো কথা কয় না।

তারপর হুয়া অনেকক্ষণ ধ'রে ব'সে ব'সে কি ভাবলে। খুব সম্ভব, সতীনের সঙ্গে ঘর করতে গেলে ভবিষ্যতে তাদের সংসার কি আকার ধারণ করবে, সেইটেই কল্পনায় দেখবার চেষ্টা করলে। দৃশ্যটা বোধকরি খুব উজ্জ্বল ব'লে মনে হ'ল না। একবার উঠে বাইরে গেল। সেখানে কেউ নেই, তার ছোট খোকাটা পর্যন্ত ম্যামথ বধের ঘটা দেখতে গেছে।

পাহাড়ের উপরে পড়ন্ত রোদে গাছের ছায়াগুলো সুদীর্ঘ হয়ে উঠছে। হুয়া বুঝলে, আলো নেবাবার আগেই সকলে আবার গুহায় ফিরে আসবে।

সে আবার ভিতরে এল। আলোর কাছে এসে বললে, 'এই ছুঁড়ীটা!'

সাড়া নেই।

আলোর হাত ধ'রে এক টানে তাঁকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে হুয়া বললে, 'আ মর! তুই বোবা নাকি রে?'

আলো শুধু কাঁদে।

আবার তার হাত ধ'রে হিড়-হিড় ক'রে টানতে টানতে হুয়া গুহার বাইরে এল। তারপর তাকে একটা বিষম ধাক্কা মেরে পথের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ ক'রে রুক্ষ স্বরে বললে, 'দূর হ বোবা আপদটা! বেরো!'

আলো তার ইঙ্গিত বুঝতে পারলে, কিন্তু নিজের এই কল্পনাতীত সৌভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারলে না। ভাবলে, এ হচ্ছে রাক্ষসীর ছলনা! সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভয়ে থর-থর ক'রে কাঁপতে লাগল।

পাহাড়ের উপর থেকে একটা লম্বা গাছের ডাল কুড়িয়ে নিয়ে মাথার উপরে তুলে নাড়তে নাড়তে হুয়া দু-চোখ পাকিয়ে বললে, 'আমার বরকে ভারি পছন্দ হয়েছে, না? মেরে না তাড়ালে বিদায় হবি না?'

যদিও আলো এখান থেকে পালাতে পারলেই হাতে স্বর্গ পায়, তবু পালাবার জন্যে নয়, হুয়ার লাঠি এড়াবার জন্যেই ভয়ে দৌড়তে আরম্ভ করলে।

হুয়া চেঁচিয়ে বললে, 'দূর হ রে সতীন, দূর হ। তোকে আমার বর দেব না রে!' সে জানে, হাঁহাঁ যখন আজ হাতি পেয়েছে, খুশিতে মশগুল হয়ে ফিরে আসবে। মেয়েটা পালিয়েছে শুনলেও বেশী গোল-মাল করবে না, খাওয়াদাওয়া নিয়েই ব্যস্ত হয়ে থাকবে। পেট আগে না বউ আগে? বড় জোর হুয়ার পিঠে পড়বে লাঠির দু-চার ঘা, তা

সতীনকে বিদায় করতে পারলে লাঠির গুঁতোও সে হজম করতে রাজি! লাঠির ব্যথা সারতে লাগে দুদিন, কিন্তু সতীন ঘাড়ে চেপে থাকে চিরদিন!

আলো যখন তার চোখের আড়ালে গেল, হুয়া একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সেইখানেই ব'সে পড়ল দুই পা ছড়িয়ে। তার সারা মন আনন্দে পরিপূর্ণ। সে গান জানলে নিশ্চয়ই এখন একটা গান ধরত। কিন্তু দুঃখের বিষয় হুয়াদের সময়ে গান-বাঁধিয়ে কবিরা ছিল না।

হুয়াকে তোমরা একবার ভালো ক'রে দেখে নাও। তার সঙ্গে এই আমাদের শেষ দেখা।

কিন্তু সত্যিকথা বলতে কি, সেই প্রস্তরযুগ থেকে এই বৈজ্ঞানিক যুগ পর্যন্ত প্রত্যেক মেয়ের মধ্যে লুকিয়ে আছে ঐ হুয়া। আজ সে ব্লাউজ, রেশমী শাড়ী, গহনা, 'হাই হিল' জুতো পরে, রকমারি কায়দায় সুবাসিত চিকণ চুল বাঁধে ও হাতে-গলায় মুখে-ঠোঁটে 'স্নো' আর 'পাউডার' আর রঙ মাখে এবং মিহি সুরে মাজা ভাষায় কথা কয় ব'লে তোমরা আর হাঁহাঁর বউ হুয়াকে চিনতে পারো না। হুয়ার প্রস্তর-যুগের লীলাখেলার ইতিহাস সাঙ্গ করলুম বটে, কিন্তু আজও সে আমাদের মধ্যে বেঁচে আছে। খালি হুয়া নয়, হাঁহাঁও। একটু তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেই সবাই তাদের চিনতে পারবে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ফুসমন্তরের চীৎকার

এইবারে আলোর কাছে যাই।

হুয়ার লাঠি এড়াবার জন্যে প্রথমে সে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল, তারপর একেবারে পাহাড়ের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে দেখলে।

অনেক দূরে গুহামুখে হুয়া পা ছড়িয়ে ব'সে আছে,—এত দূরে যে, তাকে দেখাচ্ছে খুব ছোট্টটি। সে তার পিছনে তেড়ে আসেনি দেখে আলো ভারি অবাক হয়ে গেল। তাহ'লে রাক্ষসীর মনেও দয়া-মায়া আছে।

কী বিষম বিপদ যে সে এড়িয়ে এসেছে এবং হুয়া যে কেন তাকে এত সহজে মুক্তি দিলে তা জানতে পারলে আলো নিশ্চয়ই মত-পরিবর্তন করত।

কিন্তু আলোর তখন রাক্ষসীর দয়া-মায়ার কথাও ভাববার সময় ছিল না। সূর্য পালিয়ে গেছে পশ্চিম আকাশে। এরিমধ্যে অরণ্যের তলায় বিরাট অন্ধকার-সভার আয়োজন হচ্ছে। নীচে সুদূর প্রান্তরে মোষ ও গরুর দল রাত্রের আশ্রয়ের সন্ধানে দলে দলে ফিরে আসছে। পাখিরা সাঁঝের গান শুরু করলে ব'লে। আদিমযুগের ভয়াবহ রাত্রে মানুষের পক্ষে বাইরে থাকা অসম্ভব।

কিন্তু আলো কোনদিকে যাবে? কোথায় সেই নদীর তীর, যেখানে তার বাবা তাঁবুর ভিতর ব'সে মেয়ের শোকে হাহাকার করছেন?

হ্যাঁ, বাবা যে তার জন্যে কাঁদছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই,—বাবা তাকে কত ভালবাসেন! কিন্তু আলো কেমন ক'রে তাঁর কাছে গিয়ে বলবে—'বাবা, এই তো আমি ফিরে এসেছি, আর কেঁদোনা!' সে যে পথ চেনে না! এ দেশ যে নতুন।

কিন্তু পথ চিনুক আর না চিনুক আলোকে আগে এই রাক্ষসপুরীর কাছ থেকে দূরে—অনেক দূ'রে পালাতে হবে! বাবার কাছে ফিরতে না পারা খুব দুঃখের কথা, কিন্তু অসম্ভব দুঃখের কথা হচ্ছে, আবার রাক্ষসের হাতে পড়া! অতএব আলো তাড়াতাড়ি পাহাড় থেকে নামতে লাগল। এ অভিশপ্ত মুল্লুক থেকে যত তফাতে যাওয়া যায় ততই ভালো।

পাহাড় থেকে নেমে সে দেখলে, বাঁদিকে খানিক দূরে আর একটা পাহাড় আরম্ভ হয়েছে, ডানদিকে একটা নোড়া-নুড়ি-ছড়ানো শুকনো নদীর গর্ভ, শীতকালে যা পরিণত হয়েছে চলন-পথে এবং সামনের দিকে বনজঙ্গল ও ছোট ছোট ঢিবি-ঢাবা ও বাচ্ছা পাহাড়। কিন্তু কোনদিকে তাদের আস্তানা? তার পক্ষে যে সবদিকই সমান!

হঠাৎ তার নজরে পড়ল, ডানদিকের মরা নদীর সাদা বালির পটে মূর্তিমান অভিশাপের মতন একটা কালো ছায়া! মস্ত এক নেকড়ে বাঘ ক্ষুধিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তারই পানে!

আলো আর দাঁড়াল না, দ্রুতপদে ছুটল সুমুখের পথ বা বিপথ ধ'রে। কিন্তু সেখান দিয়ে কি তাড়াতাড়ি চলবার উপায় আছে? পায়ে কাঁটা বেঁধে, চারিদিকে ছড়ানো নুড়ি-নোড়াতে ঠোক্কর খেতে হয়, এখানে ঝোপ, ওখানে নালা, পথের উপরের ঐ ঝুপসী গাছটা কেমন সন্দেহজনক, ওর একটা ডাল জড়িয়ে কালোপানা কি একটা যেন দেখা যাচ্ছে, প্রকাণ্ড অজগর হওয়াই সম্ভব, ওর তলা দিয়ে এগুনো হবে না, আবার ঘুরে যেতে হবে!

হুঁহুঁদের চেয়ে সবদিকেই ঢের বেশী সভ্য হ'লেও, আলোরাও হচ্ছে বনের মানুষ। সেদিনের মানুষ একটু একটু ক'রে সমাজবদ্ধ জীবে বা জাতিতে পরিণত হচ্ছে বটে, কিন্তু তখনো পৃথিবীতে প্রথম নগরের প্রতিষ্ঠা হয় নি। অনেক তফাতে তফাতে দুর্ভেদ্য জঙ্গলের মধ্যে জনকয় ক'রে মানুষ নদীর ধারে একটুখানি খোলা জায়গা বেছে নিয়ে বাস করত এবং তাদের সেইসব বসতিকে যদি 'গ্রাম' নাম দেওয়া যায় তাহ'লে তাদেরও ডাকতে হয় চলন্ত গ্রাম ব'লে। কারণ শিকারেরা পশুর সঙ্গে

সঙ্গে সেইসব গ্রামকে চলাফেরা করতে হ'ত ইতস্তত ! অর্থাৎ এক বনে শিকারের অভাব হ'লেই মানুষদের বাসা তুলে নিয়ে যেতে হ'ত অন্য বনে। যেদিন থেকে সে চাষবাস করতে শিখলে মানুষ স্থায়ী বাসা গড়লে সেই দিন থেকেই। কারণ ক্ষেতের ফসল ফলে তার নিজের পরিশ্রমে এবং ক্ষেত এক জায়গা ছেড়ে আর এক জায়গায় পালায় না। তাই নগর পত্তনের মূল হচ্ছে কৃষিকার্যই। কিন্তু সেদিন আসতে তখনো অনেক দেরি।

আলো জ্ঞান হয়েই দেখেছিল, নিজেদের চারিপাশে গহনবনের শ্যামল রহস্য,—নদীর মত, ঝরনার মত জন্ম তার নিসর্গ দৃশ্যের মধ্যেই। কাজেই জলের মাছের ডাঙায় উঠে যে দুর্দশা হয়, কিংবা আধুনিক কলকাতা শহরের মিস ইভা বসুকে সুন্দরবনে ছেড়ে দিয়ে এলে তার যে দুরবস্থা হয়, আলোর সেরকম কোন মুস্কিল হবার কারণ ছিল না।

কিন্তু অরণ্যের মধ্যে যে স্বাভাবিক বিভীষিকা তাকে এড়াতে পারে কে? সে বিভীষিকা বনবালা ব'লে তো আলোকেও ক্ষমা করবে না! বরং বনবালা ব'লেই আলো ভালো ক'রেই জানে যে, এই বন্ধুহীন নিবিড় অরণ্যে রাত্রি কি ভয়ঙ্করী! চামুণ্ডার যদি কোন রূপ থাকে তবে সে হচ্ছে আদিমযুগের বনবাসিনী ঘোরা নিশীথিনী।

এখনো রাত আসে নি, বেলাশেষের ম্লান আলোমাখা আকাশের দিকে দিকে ছায়াময়ী সন্ধ্যা সবে তার ধূসর অঞ্চল ছড়িয়ে দিচ্ছে, এরিমধ্যে দেখা গেল, একটা জঙ্গলের গর্ভ ভেদ ক'রে হেলে দুলে বেরিয়ে এল জ্যান্ত কেল্লার মত সেকালের বিরাটদেহ রোমশ গণ্ডার! আলো তীরের মত একটা বড় গাছতলায় দৌড় দিলে, দরকার হ'লে গাছে উঠে গণ্ডারকে ফাঁকি দেবে ব'লে। কিন্তু সে আলোকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না, নিজের মনে সেইখানেই বেড়িয়ে বেড়াতে লাগল।

গণ্ডারকে পিছনে রেখে আলো অন্য দিকে এগুতে লাগল। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং তার সর্বশরীর গেল যেন হিম হয়ে! এ যে গণ্ডারের চেয়েও সাংঘাতিক!

খানিক দূরে একটা সবুজ গাছপালার প্রাচীর ফুঁড়ে বেরিয়ে এল একদল রাক্ষস!

হাঁহাঁরা ম্যামথের মাংস নিয়ে ফিরে আসছে! তাদের দলে প্রায় পনেরো-ষোলোজন লোক এবং প্রত্যেকেই বহন ক'রে আনছে ম্যামথের খণ্ডবিখণ্ড দেহের এক একটা অংশ। আলোর চোখে একেই তো তারা মূর্তিমান রাক্ষস ছাড়া আর কিছুই নয়, তার উপরে তাদের সর্বাঙ্গ ম্যামথের রক্তে হয়ে উঠেছে বীভৎস! মুখে-মাথায়-গায়ে লম্বা লম্বা ছেঁড়া লোম, মাংস ও হাড়ের কুচি! দেখলে শিউরে উঠতে হয়!

হাঁহাঁও আলোকে দেখতে পেয়েছিল। এখানে তাকে দেখবার আশা মোটেই সে করে নি, তাই প্রথমে বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর মহাক্রোধে হুঙ্কার দিয়ে উঠল।

আলো পালাবে কি, সেই প্রচণ্ড হুঙ্কার শুনেই কাঁপতে কাঁপতে জ্ঞান হারিয়ে মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ল।

হাঁহাঁ দাঁত কিড়মিড় ক'রে বললে, 'টুটু, তোর মায়ের আক্কেল দেখছিস রে?'

—'কেন, মা কি করলে রে বাপ?'

—'ছুঁড়ীটাকে পালাতে দিয়েছে!'

—'যে পালাতে চায়, তাকে ধ'রে রাখে কে রে?'

—'আচ্ছা, ধ'রে রাখা যায় কিনা বাসায় গিয়ে বুঝিয়ে দেব। এখন শোন।'

—'বল বাপ!'

—'ছুঁড়ীটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে চল! তোর হাতির ঠ্যাংখানা আমার কাঁধে চাপিয়ে দে।'

টুটু যেরকমভাবে হাতির পা বাপের জিম্মায় দিয়ে আলোর দেহের দিকে এগিয়ে চলল তা দেখলে মনে হয়, এই আপদটাকে ঘাড়ে ক'রে বয়ে গুহায় নিয়ে যাবার ইচ্ছা তার মোটেই নেই। কিন্তু এ হচ্ছে প্রস্তর-যুগের কথা। অবাধ্য হ'লে বাপ তখন ডাণ্ডা মেরে পুত্রবধ করতেও

পিছপা হ'ত না। আবার বুড়ো ও অথর্ব হ'লে ছেলেও বাপকে দেখতো অকেজো উপদ্রবের মত—যে ছেলের পরিশ্রমে আনা খোরাকের পুরো ভাগ নেবে, অথচ পরিবর্তে কিছু দেবে না। ছেলে তখন অলস ও সংসারের পক্ষে অনাবশ্যক বুড়ো বাপকে খুন করে পিতৃদায় থেকে নিস্তার পেত সহজেই। এযুগে তোমাদের হয়তো এসব কথা শুনলে চমক লাগবে। ভাববে, সেকালে বুঝি পিতৃস্নেহ বা পুত্রস্নেহ বা মায়া-দয়া কিছুই ছিল না! ছিল। কিন্তু তখনকার স্নেহ-দয়া-মায়া ছিল সেযুগেরই উপযোগী। কারণ সকলের উপরে কাজ করত তখন জঙ্গলের পাশবিক আইন-কানুন। জীবতত্ত্ববিদদের মতে, মানুষও পশুশ্রেণীভুক্ত। তবে সে অসাধারণ পশু—কারণ উচ্চস্তরের মস্তিষ্কের অধিকারী। বহুযুগব্যাপী মস্তিষ্ক চর্চার ফলে আজ সে যদি সাধারণ পশুর চেয়ে দশধাপ উঁচুতে উঠে থাকে, তবে আদিমযুগে ছিল মাত্র এক ধাপ উঁচুতে। কাজেই প্রায়ই পশুধর্মপালন করত। আজও জঙ্গলের আইন একটুও বদলায় নি। হাতি, গণ্ডার, সিংহ ও ব্যাঘ্র প্রভৃতি বৃদ্ধ ও অক্ষম হ'লে আজও দল থেকে পরিত্যক্ত বা জোয়ান পশুদের দ্বারা নিহত হয়। এবং আধুনিক যুগেও কোন কোন বন্য মানুষদের সমাজে বৃদ্ধদের হত্যা করবার প্রথাও প্রচলিত আছে।......

বাপের হুকুম টুটু অমান্য করতে সাহস করলে না—হঁাহ্ঁা জোরসে লাঠি হঁাকড়াবার শক্তি আজও হারায় নি এবং তার শক্তির উপরে টুটুর শ্রদ্ধার মাত্রা আজও কমে নি।

এমন সময়ে এক কাণ্ড ঘটল।

খোলা জমির মাঝখানে পড়েছিল আলোর অচেতন দেহ। তার চারিধারেই অরণ্যের প্রাচীর, তারও পরে দূরে ও কাছে এখানে-ওখানে-সেখানে দেখা যাচ্ছে ছোট-বড় ধূসর বা শ্যামল শৈল—তাদের শিখরে শিখরে মাখানো মরন্ত দিবসের নিবন্ত দীপ্তি।

পশ্চিম দিকে ছিল হঁাহ্ঁার দল। টুটু সেইদিক থেকে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে, এমন সময়ে পূর্বদিকের অরণ্যের ভিতর থেকে বেগে

বেরিয়ে আসতে লাগল লোকের পর লোক। তারা নতুন মানুষ! সবাই যখন আত্মপ্রকাশ করলে তখন দেখা গেল, দলটি বড় মন্দ নয়। কারণ সংখ্যায় তারা ত্রিশ-বত্রিশ জনের কম হবে না। প্রত্যেকেই সশস্ত্র।

টুটু আর অগ্রসর হ'ল না, সবিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

হঁাহঁাও চমকে উঠে ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইল।

হুঁহুঁ বললে, 'সর্দার, পালাই চল রে!'

হঁাহঁার চমক ভাঙল। বললে, 'পালাব কেন?'

—'দেখছিস না, দলে ওরা ভারি?'

—'কিন্তু ওগুলো তো পোকার মত! আমাদের চড় খেলে মাথা ঘুরে প'ড়ে যাবে।'

—'কিন্তু আমরা চড় মারবার আগেই ওরা যে অস্তর ছুঁড়বে রে!'

হঠাৎ নতুন মানুষদের একজন শিঙা বার ক'রে ফুঁয়ের পরে ফুঁ দিয়ে বন-পাহাড়ের চতুর্দিক ক'রে তুললে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত! পরমুহূর্তে সেই মহারণ্যের চারিদিক আরো বহু শিঙার ভোঁ-ভোঁ রবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল! সূর্যসর্দারের লোকেরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে অরণ্যের নানাদিকে আলোকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। কথা ছিল, যে দল আলোকে প্রথম খুঁজে পাবে শিঙার সঙ্কেতে আর সবাইকে সে খবর জানিয়ে দেবে এবং তাহ'লেই সকলে একত্রে এসে মিলবে।

শিঙা যে কি চিজ, হাঁহাঁরা কেউ তা জানে না! হাঁহাঁ চকিত স্বরে বললে, 'অমন ভয়ানক চ্যাঁচায় কোন জানোয়ার রে?'

হুঁহুঁ ভয়ে ভয়ে বললে, 'জানোয়ার নয় রে সর্দার, জানোয়ার নয়—ফুসমন্তর! বনের চারিধারেই ফুসমন্তর চ্যাঁচাচ্ছে! ঐ শোন, আবার কাদের পায়ের শব্দ!'

সত্যই তাই! মাটির উপরে পায়ের শব্দ জাগিয়ে দলে দলে কারা যেন বেগে ছুটে আসছে!

হুঁহুঁ বললে, 'আমি লম্বা দিলুম রে সর্দার! ফুসমন্তরের সঙ্গে লড়তে পারব না!'

কেবল হুঁহুঁ নয়, টুঁটুঁ, টুটু ও ঘটুর সঙ্গে আর আর সকলেও যখন পৃষ্ঠভঙ্গ দিলে, হাঁহাঁরও তখন পালানো ছাড়া উপায়ান্তর রইল না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

যুদ্ধের আয়োজন

পরদিনের প্রথম সূর্যকরের সোনালি ছোঁয়া পেয়ে জেগে উঠল আদিম প্রভাত, জেগে উঠল বনবিহঙ্গের দল।

আর জেগে উঠল ম্যামথ হাতি, রোমশ গণ্ডার, বল্গা হরিণ, দেঁতো বরাহ, বুনো ঘোড়া, শৃঙ্গী মোষ ও গরু এবং বুনো ঘোড়া প্রভৃতির দল। আলো দেখে ঘুমোতে গেল কেবল খাঁড়াদেঁতো, গুহা-ভাল্লুক, হায়েনা ও নেকড়ে প্রভৃতি, রাতের আঁধার না জমলে যাদের শিকারের সুবিধা হয় না।

মানুষরাও জাগল বটে, কিন্তু তারা জাগল কিনা তা দেখবার জন্যে কারুরই ছিল না আগ্রহ। বিপুলা পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষ আজ জেগে উঠে এত বেশী গোলমাল করে যে, লোকালয়ের অনেক দূরে থেকে অরণ্যও তা শুনতে পায়। সুন্দরবনেও আজ বাঘের চেয়ে মানুষের সংখ্যাই বেশী বোধ হয়।

কিন্তু সেদিনকার অন্যান্য জীবজন্তুর তুলনায় মানুষের সংখ্যা ছিল কত কম! যেদেশে জন্তু থাকত একলক্ষ, সেখানে একশো জন মানুষও থাকত কিনা সন্দেহ! কাজেই মানুষরা জেগে উঠলেও অন্যান্য জীবরা এমন চীৎকার করত যে মানুষের জাগ্রত কণ্ঠস্বর শোনাই যেত না—যেমন ছোটনদীর কলধ্বনি ডুবে যায় সাগরগর্জনের মধ্যে!

কিন্তু কি ক'রে যে ছোট নদী শেষটা অনন্ত সাগরকেও হার মানালে, সে এক বিচিত্র ইতিহাস! জীবজন্তুর সংখ্যাধিক্য দেখেই

হয়তো মানুষ প্রথমে দলবদ্ধ হ'তে আরম্ভ করে। অধিকাংশ হিংস্র জন্তুই ছিল মানুষের চেয়ে বলবান। একা মানুষ তাদের কারুর সামনেই দাঁড়াতে পারত না। হিসাব ক'রে দেখা গেছে, 'নিয়ানডের্টাল' অর্থাৎ হাঁহাঁদের জাতের অধিকাংশ মানুষই তখন বিশ বছর বয়স হবার আগেই মারা পড়ত। শতকরা পাঁচ-ছয়জনের বেশী মানুষ পঞ্চাশ বছরে গিয়ে পৌঁছতে পারত না। মানুষ দীর্ঘজীবী হ'তে পেরেছে অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ আধুনিক যুগেই। আদিমকালে মানুষরা কেবল নিজেদের মধ্যেই সর্বদা মারামারি ক'রে মরত না, তাদের অধিকাংশকেই খাদ্যরূপে বা শত্রুরূপে গ্রহণ করত হিংস্র পশুর দল! কাজেই মানুষ তখন আত্মরক্ষার জন্যে অন্যান্য মানুষদের সঙ্গে ভাব ক'রে দল বাঁধতে লাগল। বাঘ, সিংহ, গণ্ডার, ভাল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জীবদের মগজে আজও এ বুদ্ধি ঢোকেনি, একা (বা বড়জোর আরো দু-একটা জীব মিলে) দলবদ্ধ মানুষদের আক্রমণ করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়ে বসে। দল বেঁধে মানুষ তার উচ্চতর মস্তিষ্কের পরিচয় দিয়েছে। পরে এই দল থেকেই হ'ল সমাজের সৃষ্টি।

আমরা যে নতুন মানুষদের দেখিয়েছি, তাদের ভিতরে ধীরে ধীরে সমাজ গ'ড়ে উঠেছিল ব'লে প্রমাণ পাওয়া গেছে। কিন্তু হাঁহাঁদের জাতের বা 'নিয়ানডের্টাল'-শ্রেণীভুক্ত মানুষদের মধ্যে সমাজের অস্তিত্বই ছিল না। সাধারণ স্বার্থের বা আত্মরক্ষার জন্যে বা ভয়ের দায়ে মাঝে মাঝে বড়জোর তারা দলবদ্ধ হ'তে পারত। ধর, হাঁহাঁ অগ্নি আবিষ্কার করলে দৈব-গতিকে, কিন্তু তার গুপ্তকথা নিজের ছেলেকেও জানাতে রাজি নয়। কিন্তু সমাজবদ্ধ জীব হ'লে হয়তো সে এমন লুকোচুরি করত না, ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে সামাজিক স্বার্থকেই বেশী বড় ব'লে মনে করত।

নতুন মানুষরা ব্যক্তির উপরে স্থান দিত সমাজকে। একজন নতুন-কিছু আবিষ্কার করলে সেটা সমস্ত সমাজেরই নিজস্ব হ'ত। নতুন কোন সমস্যায় পড়লে সমাজের সকলে মিলে করত তার সমাধান।

তাই একতায় ও সমষ্টিগত শক্তিতে তারা ছিল হাঁহাঁদের চেয়ে ঢের বেশী উন্নত। হাঁহাঁরা ব্যক্তিগত শক্তিতে নতুন মানুষদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হ'লেও প্রতি পদেই তাই তাদের কাছে ঠকে যেতে লাগল।

পরদিনের প্রভাতের কথা বলছিলুম। তোমরা সবাই দেখেছ, প্রভাত হয় কেমন শান্ত ও সুন্দর। প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে জাগে পাখিরা, কিন্তু তারা জাগলেও সৌম্য প্রভাতের শান্তি ও সৌন্দর্যকে ক'রে তোলেন কদর্য। প্রভাতকালের মধ্যে তপোবনের একটি যে ভাব আছে, মানুষ জেগে উঠেই তা নষ্ট ক'রে দেয়।

প্রস্তরযুগের সেই প্রভাতকেও আদিম মানুষ আজ বিশ্রী ক'রে তুলেছে।

আকাশের নীলসায়রে সোনার পদ্মের মতন চমৎকার সূর্য জেগে উঠেই দেখলে, কতদিনকার বিজন বন ধ্বনিত হয়ে উঠছে মানুষদের বিকট চীৎকারে! মার্জিত, দুর্বল কণ্ঠের অধিকারী আধুনিক শহুরে মানুষ আমরা, ম্যামথ-বিজয়ী আদিম বন্য মানবতার সেই গগনভেদী কোলাহলের বিকটতা বোঝা আমাদের পক্ষে সহজ নয়।

সকাল থেকেই দেখা যাচ্ছে, বনের অলিগলি দিয়ে, মাঠ প্রান্তরের উপর দিয়ে, পাহাড়ের পর পাহাড়ের উপত্যকা ও চড়াই-উৎরাই পার হয়ে দলে দলে বিরাটবক্ষ, হৃষ্টপুষ্ট, মসীকৃষ্ণ মানুষ চলেছে, পশু-শক্তির উচ্ছ্বাসে লাফাতে লাফাতে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে! অরণ্যের জীবরা যেদিকে পারলে ছুটে পালাতে লাগল—এ অঞ্চলে এমন বিষম চীৎকার-পাগল বৃহৎ জনতা আর কখনো দেখেনি তারা। মানুষদের কোনদিনই তারা বন্ধুর মত দেখেনি, তাই তারা সহজেই ভেবে নিলে যে, এরা ছুটে আসছে তাদেরই জব্দ করতে বা বিপদে ফেলতে!

হাঁহাঁ-সর্দার এ অঞ্চলে তার যত জাতভাই আছে সবাইকে জোরে ডাক দিয়েছে! কিছুদিন আগে হ'লে হাঁহাঁ-সর্দার এমন বেপরোয়া হুকুম জারি করতে সাহস করত না, কারণ সে জানত কেউ তার হুকুম মানবে না, উল্টে হয়তো তাকেই তেড়ে মারতে আসবে! কিন্তু আজ

সে যে সর্দার—যে সে সর্দার নয়, অগ্নিবিজয়ী হাঁহাঁ-সর্দার! হাতে যার দপদপে খোকা-আগুন, খাঁড়াদেঁতো আর গুহা-ভাল্লুকের দল যার প্রতাপে দেশছাড়া, তার কথা আজ শুনবে না কে? তাকে আজ ভয় করবে না কে?

অতএব জনতার পর জনতার স্রোত বয়েছে বনে বনে,—যেন সুন্দর শ্যামলতার উপরে কুৎসিত কালির ধারা! কিন্তু সব স্রোতের গতি এক মুখেই! সবাই চলেছে হাঁহাঁ-সর্দারের গুহার দিকেই। অসভ্যের জনতা, তারা মৌনব্রত কাকে বলে জানে না, তাদের চীৎকারে পৃথিবী তাই বিষাক্ত হয়ে উঠেছে।

হাঁহাঁ-সর্দার বড় চালাক। সে জানে, আজ এই বিপুল জনতার প্রত্যেকের হাতেই দিতে হবে অমোঘ অগ্নি-অস্ত্র এবং তাকে অগ্নি সৃষ্টি করতে হবে গোপনে, সকলের অগোচরেই। তাই আজ সে খুব ভোরে উঠে টুটু আর ঘটুকে নিয়ে নতুন মানুষদের আস্তানার অনতিদূরে, কলকল নদীর তীরবর্তী এক পাহাড়ের উপরে প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড সৃষ্টি ক'রে এসেছে। এর পর তার সঙ্গীরা শুকনো গাছের ডাল ভেঙে কুণ্ডের আগুনে জ্বালিয়ে অনায়াসেই শত্রুবধ করতে পারবে!

তোমরা বুঝতেই পারছ, হাঁহাঁ-সর্দারের শত্রু কে? তারা কেবল আলোকেই কেড়ে নিয়ে যায় নি, ভোঁ-ভোঁ ফুসমন্তর শুনিয়ে সকলের সামনে তার মহিমাকে ক'রে দিয়েছে অত্যন্ত খর্ব। যে ফুসমন্তরের জন্যে আজ তার এমন দেশজোড়া মানসম্ভ্রম, ওদের ভোঁ-ভোঁ ফুসমন্তর তার চেয়ে বড় হয়ে উঠলে তাকে কি এখানে কেউ মানবে? অতএব সে সকলকে দেখাতে চায়, দুনিয়ায় তার নিজস্ব ফুসমন্তরের তুলনা নেই!

সেই সুবৃহৎ জনতা যখন তার পাহাড়ের তলায় এসে জমল, হাঁহাঁ-সর্দার তখন একটা উঁচু পাথুরে ঢিপির উপরে দাঁড়াল বিচিত্র ভঙ্গীতে!

হ্যাঁ, তাকে আজ খুব জমকালো দেখাচ্ছে বটে! সে কোমরে পরেছে গুহা-ভাল্লুকের একখানা ছাল এবং গায়ে জড়িয়েছে খাঁড়াদেঁতোর

ছাল। সর্দার গৌরব প্রকাশ করবার জন্যে তার মাথায় রয়েছে রঙিন পাখির পালকের টুপী! কটিদেশে গোঁজা পাথরের ছোরা, পিঠে বাঁধা ছুটো বর্শা এবং তার ছুই হাতে আছে ছুখানা দাউ-দাউ ক'রে জ্বলন্ত কাঠ! কেবল গায়ের জোরে বা ভয় দেখিয়ে কেউ সর্দার বা দলপতির পুরো সম্মান আদায় করতে পারে না। প্রস্তরযুগের আদিম মানুষ হ'লেও হাঁহাঁ বুঝে নিয়েছিল, সর্দারির সম্মান অটুট রাখবার জন্যে অভিনয়েরও খানিকটা দরকার হয়—নইলে লোকে উচিত মত অভিভূত হয় না। আর অভিনয় করতে গেলে 'মেকআপ'-এর সাহায্য না নিলে চলবে কেন?

মাথা তুলে বুক ফুলিয়ে হাঁহাঁ-সর্দার গম্ভীর কণ্ঠে বললে, 'ওরে, তাদের কেন ডাক পড়েছে, সবাই তা জানিস তো?'

জনতা সমস্বরে বললে, 'জানি রে সর্দার!'

অগ্নিময় কাঠ ছুখানা শূন্যে তুলে বারংবার নাড়তে নাড়তে হাঁহাঁ বললে, 'আমাদের মুল্লুকে উড়ে এসে জুড়ে বসতে চায় কোথাকার একদল পোকার মতন মানুষ। আমরা হচ্ছি আগুন-ঠাকুরের চ্যালা, ছনিয়ার কাউকে ভয় করা কি আমাদের উচিত?'

জনতা একস্বরে বললে, 'না রে সর্দার, না!'

হুঁহুঁর দিকে ঘৃণাভরা দৃষ্টিনিক্ষেপ ক'রে হাঁহাঁ বললে, 'কিন্তু কী এক বাজে ভোঁ-ভোঁ ফুসমন্তর শুনে আমাদের ঐ হামবড়া হোঁদল-কুতকুতে হুঁহুঁটা ভয়ে একেবারে খাবি খাচ্ছে রে!'

সবাই কটমট ক'রে হুঁহুঁর দিকে তাকালে। সে মুষড়ে প'ড়ে ঘাড় হেঁট ক'রে বললে, 'আমি আজ দেখাতে চাই আমার খোকা-আগুনের সামনে পৃথিবীর কোন ফুসমন্তরই টেঁকতে পারে না! চল্ রে তোরা আমার সঙ্গে সেই মানুষ-পোকাগুলোর আড্ডায়! আমরা তাদের ধরব আর মারব!'

জনতা বললে, 'আর পুড়িয়ে খেয়ে ফেলব!'

হাঁহাঁ ফিরে বললে, 'হুঁহুঁ রে, তুই আমাদের সঙ্গে যাবি কি যাবি

না !’

হুঁহুঁ বুদ্ধিমানের মত বললে, ‘তোকে যখন সর্দার ব’লে মানি, তোর হুকুমে প্রাণ দিতেও রাজি আছি রে।’ কিন্তু মনে মনে এই অভিযানে যাবার ইচ্ছা তার মোটেই ছিল না।

হাঁহাঁ আবার চেঁচিয়ে সবাইকে সম্বোধন ক’রে বললে, ‘তোদের জন্যে কলকল নদীর ধারে পাহাড়ের ওপর আমি আগুন-দেবতাকে জাগিয়ে এসেছি রে ! আর দেরি নয়, আয় তোরা !’

নরহত্যা ও রক্তনদীতে স্নান করবার এমন মহাসুযোগ পেয়ে সেই বিরাট জনতা ভীষণ আনন্দে নাচতে নাচতে এগিয়ে চলল এবং বারংবার চীৎকার ক’রে বলতে লাগল, ‘জয় জয়, হাঁহাঁ-সর্দারের জয় !’

এই সভ্য যুগেও মানুষ নরহত্যার সেই বিকট আনন্দ ভুলতে রাজি নয়, নব নব কুরুক্ষেত্রের সৃষ্টি ক’রে পৃথিবীর সবুজ বুক সাদা ক’রে দেয় লক্ষ লক্ষ নরকঙ্কালের শয্যা পেতে! হাঁহাঁদের তাণ্ডব-নাচ আর জয়জয়কার আজও জেগে আছে মানুষের কর্মক্ষেত্রে।

কলকল নদীর সুদীর্ঘ আঁকাবাঁকা তটরেখার পাশ দিয়ে অগ্রসর হ’ল সেই উন্মত্ত জনস্রোত। সর্বাগ্রে চলেছে হাঁহাঁ-সর্দার। দুই হস্তে তার অগ্নির নৃত্য !

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

যুদ্ধ

কলকল-নদীর তীরে আজ প্রভাতের রবিকর নতুন মানুষদের সভাকেও ক’রে তুলেছে সমুজ্জ্বল।

নদীতটের বালুরেখার উপরেই যে উচ্চভূমিতে খাটানো হয়েছিল তাদের তাঁবু, তারই একটা অংশ ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ক’রে

ফেলা হয়েছে। এবং সেইখানে মণ্ডলাকারে আসন গ্রহণ করেছে আদিম পৃথিবীর নবযুগের শিকারী যোদ্ধারা। প্রত্যেকেরই সাজ-পোশাকে আজ একটু বিশেষ মনোযোগের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

সে ছিল এমন যুগ, তখন সশস্ত্র থাকতে হ'ত প্রত্যেককেই। যোদ্ধাদের সকলেরই কাছে রয়েছে ধনুক-বাণ, মুগুর, ছোরা, বর্শা কিম্বা কুঠার। অরণ্যে তাদের বাস, কখন কোন দিক থেকে মানুষ-শত্রু বা হিংস্রজন্তু আক্রমণ করে বলা যায় না, তাদের অভ্যর্থনার জন্যে সর্বদাই প্রস্তুত থাকতে হয়। আহারে বিহারে শয়নে সর্বদাই অজ্ঞাত সব বিপদের হঠাৎ আবির্ভাবের সম্ভাবনা! এরও ঢের পরের যুগেও এই প্রথা লুপ্ত হয় নি, তখনো জামাই যেত শ্বশুরবাড়িতে তরোয়াল হাতে নিয়ে! আজও শিখ আর গুর্খারা সবসময়েই অস্ত্র কাছে রাখে।

যোদ্ধারা যেখানে মণ্ডলাকারে ব'সে আছে, তার একদিকে রয়েছে একখানা উঁচু পাথর,—সর্দারের আসনরূপে যা ব্যবহৃত হবে। সর্দারের জন্যে উচ্চাসনের ব্যবস্থা হয়েছিল প্রাচীন যুগ থেকেই। সেই উচ্চাসনই পরে পরিণত হয় রত্নখচিত স্বর্ণ বা রৌপ্য সিংহাসনে।

প্রত্যেক যোদ্ধার মুখ দেখলেই বুঝতে দেরি লাগে না, আজ তারা এখানে সমবেত হয়েছে যুদ্ধবিগ্রহ বা শিকারের জন্যে নয়, কোন বিশেষ উৎসবের জন্যে। কারণ প্রত্যেকেরই হাসি-হাসি মুখ—কেউ গল্প করছে, কেউ গান গাইছে, কেউ তালে তালে করতালি দিচ্ছে।

এমন সময়ে দেখা গেল, ডানহাতে আলোর কোমর জড়িয়ে তাঁবুর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছেন সূর্য-সর্দার—প্রশান্ত মুখে শান্ত হাসির লীলা। আলোর মুখও হাসি-খুশিতে মনোরম।

সূর্য-সর্দার এসে উঁচু পাথরখানির উপরে বসলেন। আলো বসল বাপের পাশে মাটির উপরে, তাঁর জানুর উপরে হেলে মাথা রেখে। একালে রাজকুমারী বা সর্দার-কন্যার জন্যেও বিশেষ আসনের ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু তখন সর্দারের ছেলেমেয়েদের জন্যে কেউ মাথা ঘামাতো না।

সূর্য-সর্দার ধীরে ধীরে বললেন, 'বন্ধুগণ, তোমরা জানো, রাক্ষসদের কবল থেকে আমার আদরের মেয়ে আলো উদ্ধার পেয়েছে ব'লে আজ আমি দেবতাদের কাছে জীব বলি দেব। শুভকার্যে দেরি করা উচিত নয়, তোমরা বলির পশু নিয়ে এস।'

তখনি একজন লোক উঠে প্রকাণ্ড দামামা বাজিয়ে বলির পশু আনবার জন্যে সঙ্কেত করলে।

তারপরেই দেখা গেল, কয়েকজন লোক মস্তবড় একটা ভাল্লুককে টেনে হিঁচড়ে সভার দিকে আনছে। ভাল্লুকের চার পায়ে চারগাছা চামড়ার দড়ি বাঁধা, চারজন লোক চারদিক থেকে দড়িগুলো টেনে আছে! তার কোমরে ও গলাতেও চামড়ার দড়ি বেঁধে ধ'রে আছে আরো দুজন লোক। ভাল্লুক ভীষণ গর্জন করছে, দাঁত খিঁচোচ্ছে, নখ-বার-করা থাবা ছুঁড়ছে এবং অগ্রসর হ'তে চাইছে না, কিন্তু তার সমস্ত আপত্তি ও ভয় দেখাবার চেষ্টাই নিস্ফল হয়ে যাচ্ছে। ঘৃণ্য ও তুচ্ছ মানুষের হাতে জাতভাইয়ের এই অবস্থা দেখলে তোমাদের পূর্ব-পরিচিত গুহা-ভাল্লুক তার কান-কাটা বউয়ের কাছে কি মত প্রকাশ করত বল দেখি?

তোমরা মোষ, ছাগল বলি দেওয়ার কথা শুনেছ, হয়তো সাঁওতাল-দের মুর্গী বলি দেওয়ারও কথা তোমাদের অজানা নেই এবং এও জানো, আগে নরবলিও দেওয়া হ'ত। কিন্তু ভাল্লুক-বলির কথা এই বোধকরি প্রথম শুনলে? কিন্তু আদিম যুগে পৃথিবীর নানা দেশেই যে ভাল্লুক বলি দেওয়া হ'ত, এর বহু প্রমাণ পাওয়া গেছে। আজও জাপানের আদিম বাসিন্দা আইনু এবং অন্যান্য জাতিদেরও মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে।

আদিম মানুষদের প্রধান শত্রু ছিল ঐ গুহা-ভাল্লুকরা! তাদের বলবিক্রমের উপরে মানুষদের শ্রদ্ধা ছিল যথেষ্ট। পণ্ডিতরা অনুমান করেন, খুব সম্ভব সেইজন্যেই অন্যান্য বাজে বা দুর্বল পশুর বদলে দেবতা-দের উদ্দেশ্যে ভাল্লুক বলি দিয়ে প্রার্থনা করা হ'ত, যারা বলি দিচ্ছে

তারা যেন ভাল্লুকেরই মত মহাবলী হ'তে পারে।

আফ্রিকার অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে কারুকে বীর ও যথার্থ পুরুষ ব'লে গণ্য করা হয় না, যদি একা একটি সিংহ বধ করতে না পারে। রাজপুতদের পুরুষত্বের বিচার হয় বন্য বরাহ শিকারে। আদিম-কালে যে গুহা-ভাল্লুক বধ করতে পারত তাকে মানা হ'ত মহাবীর বলে। সেযুগে ভাল্লুকদের কেবল বলিই দেওয়া হ'ত না। বলির পর ভাল্লুক-দের মাথার হাড় আগে খুব যত্ন ক'রে সাজিয়ে তুলে রেখে দেওয়া হ'ত সারে সারে। খুব সম্ভব সেগুলোকে অত্যন্ত পবিত্র জিনিস ব'লে ভাবা হ'ত। অনেক হাজার বছর পরে সেই হাড়গুলোকে ঠিক তেমনিভাবে সাজানো অবস্থাতেই আবার পাওয়া গিয়েছে।

ভাল্লুককে সবাই মিলে সভাস্থলের মাঝখানে এনে হাজির করলে, অমনি সভার সমস্ত লোক একসঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠল—সূর্য-সর্দার পর্যন্ত।

সূর্য-সর্দার হচ্ছেন দলের প্রধান ব্যক্তি, অতএব বলির কার্যারম্ভের ভার তাঁরই উপরে। তিনি বাঁ-হাতে ধনুক ও ডান হাতে বাণ নিয়ে ভাল্লুকের দিকে লক্ষ্য স্থির ক'রে জলদগম্ভীর স্বরে বললেন, 'আলোক-স্রষ্টা হে সূর্য-দেবতা! তৃষ্ণার বারিদাতা হে নদী-দেবতা! নিঃশ্বাস-বায়ুদাতা হে পবন-দেবতা! অন্ধকারের চক্ষুদাতা হে অগ্নি-দেবতা! তোমাদের সকলের কাছে এই বলির পশু নিবেদন করছি, তোমরা আমাদের উপর প্রসন্ন হও, আমাদিগকে এই ভাল্লুকের মত শক্তিমান ক'রে তোলো!'—তাঁর প্রার্থনা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো দামামা সমস্বরে বেজে উঠল তালে তালে এবং তারপরেই সূর্য-সর্দার ধনুক থেকে বাণ ত্যাগ করলেন!

বাণ গিয়ে বিঁধল ভাল্লুকের বুকের কাছে এবং পরমুহূর্তেই সভাস্থ সমস্ত শিকারী যোদ্ধা একসঙ্গে জয়ধ্বনি তুলে ভাল্লুককে লক্ষ্য ক'রে বর্শা বা বাণ ছুঁড়তে লাগল।

সর্দারের বাণ খেয়ে ভাল্লুকটা একবার মাত্র গর্জন করবার সময় পেয়েছিল, তারপরেই একসঙ্গে অতগুলো অস্ত্রের আঘাতে তার মৃতদেহ

মাটির উপরে ধড়াস ক'রে প'ড়ে গেল, আর নড়ল না!

তারপরে চারিদিকের উত্তেজনা, দামামা-নিনাদ, জয়ধ্বনি ও কোলাহলের মধ্যে সূর্য-সর্দার আবার পাথরের উপরে উঠে দাঁড়িয়ে দেবতাদের উদ্দেশ্যে ভক্তিভরে প্রণাম করতে লাগলেন বারংবার।

ওদিকে জনতার সমস্ত লোক এগিয়ে এসে ভাল্লুকের চারিধারে চক্রাকারে বেড়ে দাঁড়াল এবং দামামার তালে তালে বিজয় বা যুদ্ধ নৃত্য আরম্ভ করলে। কলকাতায় আধুনিক ছেলে মেয়েদের যে তরল ও চুটকী নাচ দেখা যায়, এ নাচ নয় তেমনধারা! এর প্রতি ছন্দে বীর্যের ব্যঞ্জনা, প্রতি পদক্ষেপে প্রলয়ের তাল, প্রতি ভঙ্গিতে আদিম দরাজ প্রাণের উচ্ছ্বাস! একালের কোন নিজিনিস্কি বা উদয়শঙ্করই সেই বন্য, স্বাধীন নৃত্যের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি দেখাতে পারবে না।

নর্তকরা যখন শ্রান্ত হয়ে থামল, দামামা যখন মৌন হ'ল, সূর্য-সর্দার বললেন, 'বন্ধুগণ, দেবতারা নিশ্চয়ই বলি পেয়ে আর তোমাদের নাচ দেখে তুষ্ট হয়েছেন। এইবারে চল, আমরা সকলে মিলে বনের ভিতরে গিয়ে ঢুকি। আজ চাই গোটাকয় বন্য-হরিণ আর বরাহ। তারপর ফিরে এসে বিরাট ভোজের আয়োজন হবে!'

সর্দারের মুখের কথা শেষ হ'তে-না-হ'তেই আচম্বিতে কোথা থেকে তীব্র স্বরে শিঙা বললে তিনবার—'ভোঁ-ভোঁ-ভোঁ! ভোঁ-ভোঁ-ভোঁ! ভোঁ-ভোঁ-ভোঁ!

সূর্য-সর্দার সচমকে উত্তেজিত স্বরে ব'লে উঠলেন, 'এ যে আমাদের প্রহরীর সঙ্কেত! শত্রুরা আমাদের আমক্রণ করতে আসছে!'

চারিধারে অমনি রব উঠল—'শত্রু! শত্রু!' 'অস্ত্র ধর! অস্ত্র ধর!' 'মেয়েরা তাঁবুর ভেতরে যাক!'

দেখতে দেখতে ভিড়ের ভিতরে যত মেয়ে ছিল সবাই তাঁবুর দিকে দৌড় দিলে এবং যোদ্ধারা নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র ঠিক করতে লাগল ব্যস্ত ভাবে।

শিঙা আবার চেঁচিয়ে উঠল, 'ভোঁ! ভোঁ! ভোঁ! ভোঁ!'

অগ্নি বললে, 'বাবা, প্রহরী এবারে শিঙায় চারটে ফুঁ দিলে। তার মানে শত্রুদের সংখ্যা হচ্ছে চার শত!'

সূর্য-সর্দার জবাব দিলেন না, শত্রুদের আবিষ্কার করবার জন্যে তীক্ষ্ণ নেত্রে দূরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বায়ু উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, 'আমাদের দলে তিনশো'র বেশী লোক নেই!'

ছেলেকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে সূর্য-সর্দার চোখ না ফিরিয়েই বললেন, 'বাছা, শত্রুদের সংখ্যা বেশী হ'লেই হতাশ হবার কারণ নেই। আগে দেখা যাক, শত্রুরা কোন জাতের মানুষ! প্রহরী সঙ্কেতে সে কথা জানাচ্ছে না কেন?'

কয়েক মুহূর্ত পরেই শিঙা টানা সুরে বললে, 'ভোঁ ও-ও-ও-ও!'

সূর্য-সর্দার তখন সহাস্যে উচ্চস্বরে বললেন, 'বন্ধুগণ, সঙ্কেতে জানা গেল, রাক্ষসরা আমাদের আক্রমণ করতে আসছে! আমরাও তো তাই চাই! ওরা না এলে আমরাই ওদের আক্রমণ করতে যেতুম, কিন্তু ওরা নিজেরাই এসে আমাদের অনেক পরিশ্রম বাঁচিয়ে দিলে! দলে ওরা ভারি ব'লে আমাদের ভাবনার কারণ নেই। কারণ আমরা সকলেই জানি, রাক্ষসরা তীর-ধনুক ব্যবহার করতে জানে না! অতএব দাঁড়াও সবাই সারি সারি, বাজাও দামামায় যুদ্ধসঙ্গীত!'

উঠল বেজে দামামার পর দামামা, শিঙার পর শিঙা! যোদ্ধারা শ্রেণীবদ্ধ হ'তে লাগল।

তারপরেই দেখা গেল, শত্রুরা দলে দলে বিশৃঙ্খলভাবে লাফাতে লাফাতে, নাচতে নাচতে পাহাড়ের তলদেশের সুদীর্ঘ অরণ্যের নানা দিক থেকে বেরিয়ে এল! অতর্কিতে আক্রমণ করবে ব'লে এতক্ষণ তারা চ্যাঁচায় নি, এইবারে শুরু করলে বিকট চীৎকারের পর চীৎকার!

সূর্য-সর্দার অল্পক্ষণ তাদের ভাবভঙ্গি ও অস্ত্রশস্ত্র লক্ষ্য ক'রে বললেন, 'ওরা মুর্খ! দেখছি ওরা ঠাউরেছে যে, জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে আমাদের সঙ্গে

যুদ্ধ করবে! যেন আমরা বন্য জন্তু, কাঠের আগুন দেখলে ভয় পাব।'

অগ্নি বললে, 'বাবা, ওরা ক্রমেই এগিয়ে আসছে। আমাদের কর্তব্য কি? আমরা কি আগেই ওদের আক্রমণ করব?'

সূর্য-সর্দার বললেন, 'না। দেখছ না, আমরা উচ্চভূমির উপরে আছি? এখান থেকে নামলে আমাদের সুবিধা ক'মে যাবে! বিশেষ, আমরা যদি ওদের কাছে গিয়ে পড়ি তাহ'লে বাণ ছোঁড়বারও সুবিধা হবে না। হাতাহাতি যুদ্ধে আমাদেরই হারতে হবে। কারণ একে ওরা সংখ্যায় বেশী, তার উপরে গায়ের জোরেও আমরা ওদের কাছে দাঁড়াতে পারব না।'

অগ্নি বললে, 'তবে কি আমরা এইখানেই দাঁড়িয়ে ওদের জন্যে অপেক্ষা করব?'

—হ্যাঁ। সবাই এক জায়গায় দলবদ্ধ হয়ে থেকো না। তাঁবুগুলো পিছনে রেখে, অর্ধ-চন্দ্রাকারে ফাঁক ফাঁক হয়ে দাঁড়াও। যতক্ষণ না ওরা আমাদের বাণের সীমানার মধ্যে আসে ততক্ষণ অপেক্ষা কর।'

শিঙা নিয়ে সঙ্কেত-ধ্বনি ক'রে অগ্নি পিতার আদেশ প্রচার ক'রে দিলে। তিনশত যোদ্ধা তৎক্ষণাৎ অর্ধচন্দ্র ব্যূহ রচনা ক'রে ফেললে। যোদ্ধাদের পিছনে রইল তাঁবুর ভিতরে মেয়েরা—শত্রুদের নাগালের বাইরে। অর্দ্ধচন্দ্রের মাঝখানে দুই পাশে দুই ছেলেকে নিয়ে এসে দাঁড়ালেন সূর্য-সর্দার স্বয়ং।

ওদিক থেকে হৈ-চৈ তুলে, মুখ ভেংচে ও লাফালাফি ক'রে যারা আক্রমণ করতে আসছে, তাদের মধ্যে ব্যূহ, শ্রেণী, শৃঙ্খলা কোনরকম পদ্ধতিরই বালাই ছিল না। তাদের নির্ভরতা কেবল নিজেদের পশু-শক্তির উপরে। আর আছে তাদের খোকা-আগুন।—খাঁড়াদেঁতো ও গুহা-ভাল্লুক যার সামনে দাঁড়াতে পারে না, তার সামনে মানুষপোকা-গুলো তো তুচ্ছ! সেই হ'ল তাদের যুক্তি।

কেবল হুঁহুঁ কিছুতেই আশ্বস্ত হ'তে পারছে না। সে অত্যন্ত সন্দিগ্ধ চোখে নতুন মানুষদের সবকিছু পর্যবেক্ষণ করতে করতে সাবধানে

অগ্রসর হচ্ছে।

হাঁহাঁ বিরক্ত স্বরে বললে, হ্যাঁ রে হুঁহুঁ, তুই আবার পিছিয়ে পড়লি যে রে! দেরি করলে খোকা-আগুন তোর হাত থেকে পালিয়ে যাবে, জানিস না?'

হুঁহুঁ বিস্ফারিত নেত্রে একদিকে তাকিয়ে বললে, 'গ্যাখরে সর্দার, গ্যাখ!'

—'কি?'

কোন কোন তাঁবুর ভিতর থেকে ফাঁক দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে আসছিল—বোধহয় উনুনের জ্বালানি কাঠের ধোঁয়া। সেইদিকে অঙ্গুলী নির্দেশ ক'রে হুঁহুঁ বললে, 'গ্যাখ, ওদেরও কাছে খোকা-আগুন আছে রে!'

হাঁহাঁ দেখে প্রথমে দস্তুরমত ভড়কে গেল। কিন্তু তারপরেই সে ভাবটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে হেসে বললে, 'ও বাজে খোকা-আগুন রে! ওদের যদি আগুন-মন্তর জানা থাকত, তাহ'লে ওরা হাতে কতগুলো কাঠি নিয়ে নাড়ানাড়ি করত না।'

—'হয়তো ঐগুলোই ওদের নতুন ফুসমন্তর!'

—'ফুসমন্তর ফুসমন্তর ক'রেই কবে তুই ফুস ক'রে পটল তুলবি রে!......এগিয়ে চল। ওরা আমাদের খোকা-আগুনকে দেখে ভয়ে কাট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এগুতে চাইছে না।'

টুটু বললে, 'দাঁড়িয়ে থাকলেই প্রাণ বাঁচবে কিনা। আমরা আর একটু কাছে গেলেই মজাটা টের পাবে!'

ঘটু বললে, 'যেমন টের পেয়েছিল ভাল্লুক আর খাঁড়াদেতো—'

হুঁহুঁর দিকে আড়-চোখে চেয়ে হা-হা ক'রে হেসে হাঁহাঁ বললে, 'আর টুঁটুঁর বাপ হুঁহুঁ!'

টুটু বললে, 'হ্যাঁ।'

সেকথা যেন শুনতেই পায়নি এমনি ভাব দেখিয়ে হুঁহুঁ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ালে।

প্রস্তরযুগ হ'লেও বাপের এমন অপমান টুটুঁরও ভালো লাগল না। সেও মুখ ফেরালে অন্যদিকে।

হাঁহাঁ দামামা-ধ্বনি শুনতে শুনতে বললে, 'অমন দুম-দাম শব্দ ক'রে কানের পোকা বার করছে কারা বলদিকি?'

হুঁহুঁ ফুসমন্তর সম্বন্ধে আবার কি মত প্রকাশ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু টুঁটুঁ রাগ-ভরা চোখে বাপের দিকে তাকাতেই সে তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিলে।

টুটু বললে, 'বোধহয় যে জানোয়ারগুলোর পিঠে চড়ে ওরা নদীতে বেড়ায়, তারাই ক্ষিধের চোটে চেঁচিয়ে মরছে!'

—'তাই হবে।'

ঘটু বললে, 'লড়ায়ে জিতে ফেরবার সময়ে জানোয়ারগুলোকে আমরা ধ'রে নিয়ে যাব।'

হাঁহাঁ মাথা নেড়ে বললে, 'না, না! বড্ড চ্যাঁচায়। ঘুমোতে দেবে না।'

এমনি সব আজে-বাজে কথা কইতে কইতে তারা যে অজানা মৃত্যুর সীমানার মধ্যে এসে পড়েছে, সেটা আন্দাজও করতে পারলে না! নতুন মানুষরা অকস্মাৎ ধনুকের ছিলা টেনে বাণ ছাড়লে। এবং পরমুহূর্তে যা ঘটল, সেটা সম্পূর্ণরূপে তাদের ধারণাতীত! ঝাঁকে ঝাঁকে বাণ উড়ে এসে হাঁহাঁদের দলের ভিতরে গোঁৎ খেয়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে পনেরো-ষোলো জন লোক নিহত বা আহত হয়ে পপাত ধরণীতলে! পরমুহূর্তে তেড়ে এল আবার অসংখ্য মৃত্যুদূত এবং আবার কয়েকটা মূর্তি করলে পৃথিবীকে আলিঙ্গন!

তারপর নতুন মানুষরা বাণ ছোঁড়া থামিয়ে ধনুক নামিয়ে ফলাফল দেখতে লাগল।

অসভ্যদের লাফালাফি ও জয়ধ্বনি থেমে গেল একেবারে, তার বদলে জেগে উঠল আকাশভেদী আর্তনাদ!

হাঁহাঁ নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলে না, হতভম্বের মত

রক্তাক্ত মূর্তিগুলোর দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ! তারপর বিস্মিত স্বরে ঠিক গুহা-ভাল্লুকের মতই বললে, 'অ্যাঃ! কাঠি ছুঁড়ে কাবু করলে!'

হুঁহুঁ ত্রস্তভাবে পিছোতে পিছোতে বললে, 'বাপ রে বাপ, কী ফুসমন্তর!'

এমন সময়ে এল আবার এক ঝাঁক বাণ। এবারে প্রথমেই বাণ খেয়ে বাপের পায়ের কাছে মুখ থুবড়ে পড়ল ঘটু। বাণ বিঁধেছে তার বুকে!

হাঁহাঁ স্তম্ভিত নেত্রে ছেলের মুখের পানে তাকিয়ে রইল।

মৃত্যু-কাতর কণ্ঠে ঘটু ডাকলে, 'বাবা!'

হাঁহাঁ মাটির উপরে হাঁটু গেড়ে ব'সে প'ড়ে বললে, 'ঘটু রে!'

দুইহাতে নিজের বুক চেপে ধ'রে হাঁপাতে হাঁপাতে ঘটু বললে, 'আমাকে যে মেরেছে তাকে তুই মারিস রে বাপ! তাকে তুই খুঁজে বার করিস, তাকে তুই ছাড়িস নে, তাকে তুই—' আর কিছু বলবার আগেই তার মৃত্যু হ'ল।

ছেলের দেহ কোলের উপর টেনে নিয়ে হাঁহাঁ অশ্রু-অস্পষ্ট চোখে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলে, উচ্চভূমির উপরে নতুন মানুষরা ঠিক পাথরের মতই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের একজনও হত বা আহত হয়নি! হাঁহাঁর অনুচররা তাদের লক্ষ্য ক'রে কতগুলো জ্বলন্ত কাঠ ছুঁড়েছে বটে, কিন্তু একগাছা কাঠও তাদের কাছ পর্যন্ত পৌঁছয় নি।

কিন্তু হাঁহাঁদের দলে মরেছে বা জখম হয়েছে প্রায় চল্লিশজন লোক। দলের অনেকেরই যুদ্ধ করবার সখ এখন মিটে গেছে, তারা পায়ে পায়ে ক্রমেই পিছিয়ে যাচ্ছে এবং যারা এখনো পালায় নি তারাও পালাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে, কিংবা অগ্রসর না হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে। তাদের অনেকের হাতেই আর জ্বলন্ত কাঠ নেই, যাদের হাতে আছে তাদের কাঠে আগুন নেই।

হাঁহাঁ হঠাৎ প্রবল বেগে মাথা ঝাঁকানি দিলে, তার তৈলহীন জটার

মতন লম্বা রুক্ষ চুলগুলো ঠিক যেন একদল ক্রুদ্ধ সর্পের মত চতুর্দিকে ঠিকরে পড়ল লটপট করে! তারপরেই ছেলের মৃতদেহ মাটিতে নামিয়ে রেখে তড়াক ক'রে লাফ মেরে সে দাঁড়িয়ে উঠল এবং পিঠে বাঁধা বর্শা ও কোমরে ঝোলানো মুগুর এক এক টানে খুলে নিয়ে দুই হাতে ধরে বজ্রকঠিন স্বরে হেঁকে বললে, 'কি রে ভীতুর পাল, তোরা পালাবি নাকি রে? চেয়ে ত্তাখ মাটির দিকে, তোদের বন্ধুদের রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে! পোকার মতন দেখতে ঐ বিদেশীগুলো এসে তোদের বধ করলে, আর প্রতিশোধ না নিয়ে তোরা পালাবি নাকি রে?'

একজন বললে, 'আমাদের খোকা-আগুন পালিয়ে গেছে রে সর্দার!'

দপ্ দপ্ ক'রে হাঁহাঁর দুই ভীষণ চক্ষু জ্বলে উঠল! বিপুল ক্রোধে তার বিষম চওড়া বক্ষ ফুলে আরো চওড়া হয়েছে এবং বিকট দন্তগুলো কালো মুখের ভিতর থেকে দেখাচ্ছে যেন বিদ্যুৎ দীপ্তির মত চকচকে! সত্যই এখন তার দানব মূর্তি! কর্কশ কণ্ঠে সে আবার চীৎকার করে বললে, 'তোদের মত ভীতুর হাতে খোকা-আগুন থাকবে কেন? এতক্ষণে তোরা একটাও শত্রু মারতে পারলি না, তাই তো আগুন তোদের ত্যাগ করেছে! আগুন গেছে, তোদের কাছে বর্শা নেই কুঠার নেই মুগুর নেই? এতদিন তোরা কী নিয়ে লড়াই ক'রে এসেছিস রে?'

যুদ্ধপাগল আদিম মানুষ, হাঁহাঁর দৃপ্ত উৎসাহবাণীতে জেগে উঠল আবার তাদের রণোন্মাদনা!—নেচে উঠল ধমণীর তপ্ত পশুরক্ত! তারা রুখে দাঁড়িয়ে বললে, 'হাঁ রে হাঁহাঁ-সর্দার! আমরা ভীতু নই—আমরা হয় মারব, নয় মরব! হারে রে রে রে রে!'

হাঁহাঁ এক হাতে বর্শা ও আর এক হাতে মুগুর উঁচিয়ে মূর্তিমান বিভীষিকার মত তীরবেগে ছুটতে ছুটতে বললে, 'হাঁ, হাঁ, হাঁ! হয় মারব, নয় মরব! কে আসবি আমার সঙ্গে, ছুটে আয় রে মরদ-বাচ্ছা, ছুটে আয়!'

তার সঙ্গে সঙ্গে ধেয়ে চলল ভয়াবহ হুঙ্কার তুলে প্রায় দুইশত

আদিম যোদ্ধা।

হুঁহুঁ গেল না। টুঁটুঁও গেল না।

হুঁহুঁ বললে, 'ওরা মরণের মুখে ছুটেছে। আমরাও কেন ওদের সঙ্গে মরব রে?'

টুঁটুঁ বললে, 'ঠিক বলেছিস রে বাপ। চল ফিরে যাই!'

উচ্চভূমি থেকে আবার ঝাঁকে ঝাঁকে বাণ ছুটে আসছে। আবার অনেকে মরল, আবার অনেকে পালালো। কিন্তু জন-পঞ্চাশের গতি-রোধ করতে পারলে না কেউ!

পদে পদে লোক মরছে, তবু তারা থামল না। হাতে কাঁধে উরুতে বাণ বিঁধছে, তবু তারা থামল না। তিনশো শত্রু চারিদিক থেকে তাদের ঘিরে ফেলবার জন্যে ছুটে আসছে, তবু তারা থামল না। তারা মরিয়া! তারা প্রাণের মায়া রাখে না। তাদের অগ্রগতি রোধ করতে পারে কেবল মৃত্যু।

হাঁহাঁ ভয়ানক স্বরে অট্টহাস্য ক'রে বললে, 'চ'লে আয় রে মরদ-বাচ্ছা, চ'লে আয়! ঐ ওদের সর্দার—আমি মারব ওকে, তোরা যে যাকে পারিস মার। হয় মার, নয় মর!'

হাঁহাঁরা তখন নতুন মানুষদের দলের ভিতরে ঢুকে পড়েছে মত্ত হস্তীদলের মত। তারা যেদিকে তাকায়, সেই দিকেই দলে দলে শত্রু। এত কাছে ধনুক-বাণ অচল দেখে শত্রুরাও ধরলে বর্শা বা কুঠার বা মুগুর। আরম্ভ হ'ল তখন বিষম হাতাহাতি লড়াই। হাঁহাঁর চোখের সামনে বর্শার আঘাতে টুটু ভূতলশায়ী হ'ল, তবু তার ভ্রুক্ষেপও নেই। তার নিজের বর্শা ভেঙে দু-টুকরো হয়ে গেল, হাঁহাঁ ফিরেও তাকালে না। বাণের খোঁচায়, বর্শার খোঁচায় ও কুঠার-মুগুরের চোটে তার সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত ও জর্জরিত, তবু সে-সব হাঁহাঁ খেয়ালেও আনলে না। দুই হাতে মুগুর ধ'রে ডাইনে বামে সামনে আঘাত করতে করতে সূর্য-সর্দারের দিকে অটল পদে এগিয়ে চলল, সে শরীরী বজ্রকে ঠেকায় কার সাধ্য! তার সুমুখে দাঁড়ায় কার সাধ্য! অবশেষে হাঁহাঁ তার লক্ষ্যস্থলে এসে হাজির হয়ে হো হো রবে হেসে উঠে উন্মত্তের মতন ব'লে উঠল, 'এইবারে তোকে পেয়েছি রে পালের গোদা!' ব'লেই দুই হাতে মুগুর তুলে প্রাণপণে আঘাত করলে সূর্য-সর্দারকে!

সূর্য-সর্দারও নিজের মুগুর তুলে হাঁহাঁর মুগুরকে ঠেকাতে গেলেন, কিন্তু হাঁহাঁ বুঝেছিল তখন তারে অন্তিমকাল উপস্থিত, তাই সে তার

মহা-বলিষ্ঠ বিরাট দেহের সমস্ত শক্তি একত্র ক'রে এই চরম আঘাত করেছিল, কাজেই সূর্য-সর্দারের মুগুর হাঁহাঁর মুগুরকে ঠেকিয়েও তাকে থামাতে পারলে না, দুই যোদ্ধার দেহই একসঙ্গে জড়াজড়ি ক'রে মাটিতে লুটিয়ে প'ড়ে গেল।

তখনি চারিদিক থেকে অনেক লোক ছুটে এসে হাঁহাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল, কেউ মারলে কুঠারের ঘা—কেউ দিলে বর্শার খোঁচা! কিন্তু তার আর দরকার ছিল না, কারণ এই চরম আঘাত করবার জন্যেই সে ছিল এতক্ষণ বেঁচে। মুগুরের দ্বারা শত্রুকে শেষ আঘাত ক'রেই সে শক্তিহারা হয়ে মৃত্যুর মুখে করেছে আত্মদান।......

সূর্য-সর্দার কেবল মূর্চ্ছিত হয়েছিলেন। জ্ঞান হবার পর রক্তাক্ত দেহে উঠে ব'সে দেখলেন, শত্রুদের কেউ আর বেঁচে নেই। কিন্তু মাত্র পঞ্চাশ জন শত্রুর শেষ আক্রমণে তাঁর দলে হত বা আহত হয়েছে একশো কুড়ি জন!

অভিভূত স্বরে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, রাক্ষসরা যথার্থ যোদ্ধা বটে! কিন্তু এদের সম্বল শুধু পশুশক্তি। ওর সঙ্গে ওদের মনের শক্তি থাকলে পৃথিবীতে আমরা কেউ বেঁচে থাকতুম না!'

সূর্য-সর্দার যাকে মনের শক্তি বললেন, এখনকার পণ্ডিতরা তাকে বলেন মস্তিষ্কের শক্তি।

কেবল উত্তর ভারতের নানা স্থানে নয়, গোটা পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই সে-যুগের আদিম মানুষদের সঙ্গে যুদ্ধ বেঁধেছিল নতুন মানুষদের। কিন্তু শুধু দেহের শক্তির উপরে নির্ভর করেছিল ব'লে আদিম মানুষরা কোথাও নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে নি।

প্রথম মনুষ্য সৃষ্টির পর দশলক্ষ বৎসর কেটে গেছে। এই সুদীর্ঘকাল-ব্যাপী মস্তিষ্ক-চর্চার ফল হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর মানুষ। মস্তিষ্কের মহিমায় মানুষ যে উন্নতির পথে আরো কতখানি অগ্রসর হবে, সে কথা জানে কেবল সুদূর ভবিষ্যৎ।

পরিশিষ্ট

গল্প তো ফুরুলো, কিন্তু আমার শেষ কথা এখনো বাকি। বোধ হচ্ছে, কোন কোন বিষয় নিয়ে কারুর মনে প্রশ্ন উঠতে পারে। আন্দাজে দু-একটা উত্তর দিয়ে রাখি।

'মানুষের প্রথম অ্যাড্‌ভেঞ্চার' উপন্যাসের আকারে লেখা হ'ল আবালবৃদ্ধবনিতার চিত্তরঞ্জনের জন্যে। কিন্তু কেবল উপন্যাসরূপে পাঠ করলে এ রচনাটির আসল উদ্দেশ্য হবে ব্যর্থ। কারণ গল্পের ভিতর দিয়ে আমি প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম মানুষ ও তার জীবনযাত্রাপদ্ধতির যে ছবি ফোটাবার চেষ্টা করেছি, তা কাল্পনিক হ'লেও কল্পনার মূলে আছে প্রধানত বিশেষজ্ঞদের মতামত।

আদিম মানুষদের নিয়ে পণ্ডিতদের অনুসন্ধান-কার্য এখনো সমাপ্ত হয় নি—অদূর ভবিষ্যতেও সমাপ্ত হবার সম্ভাবনা নেই। যতটুকু আবিষ্কৃত হয়েছে, আবিষ্কৃত হ'তে বাকি তার চেয়ে ঢের বেশী! সমস্তটা কখনো আবিষ্কৃত হবে কিনা সন্দেহ। মহাকাল অনেক প্রমাণ নিঃশেষে ধ্বংস করেছেন—আধুনিক নৃতত্ত্ববিদদের মুখ তাকান নি।

যতটা জানা গিয়েছে, তার দ্বারাও কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হবার উপায় নেই। কারণ বিশেষজ্ঞদেরও মধ্যে মতভেদ দেখা যায় সর্বত্র। Sir Arthur Keith, Dr. Davidson Black, H. J. Fleure, Dr. E. Dubois, Professor H. F. Osborn, R. R. Marret, Sir G. E. Smith ও Darwin প্রভৃতির মতামত পাঠ ক'রেও নির্দিষ্ট কোন পথ খুঁজে পাওয়া যায় না। Keith সাহেবের মতন বিশেষজ্ঞও স্পষ্ট ভাষায় বলতে বাধ্য হয়েছেন, 'আমাদের অনুসন্ধান সবে আরম্ভ হয়েছে। এমন অনেক কিছুই আছে যা আমরা এখনো বুঝতে পারি না।' এক্ষেত্রে আমাদের মতন সাধারণ লোকের অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

মানুষ যে গোড়ায় কি ছিল, এখনো সেইটেই জানা যায় নি। Darwin ও Lamark সাহেব বলেন, মানুষের উৎপত্তি শিম্পাঞ্জীর মত কোন লাঙ্গুলহীন বানর থেকে। Keith সাহেবেরও ঐ মত।

আবার Professor H. F. Osborn-এর মত হচ্ছে, 'আমি মানুষের ক্রমোন্নতিতে বিশ্বাস করি, কিন্তু লাঙ্গুলহীন বানর থেকে যে তার উৎপত্তি, এ কথায় বিশ্বাস করি না। মানুষ তার নিজের পথ ধ'রেই বরাবর এগিয়ে এসেছে, কখনো তাকে বানর অবস্থার মধ্যে পড়তে হয় নি।' আবার Professor Westenhofer সম্পূর্ণ উল্টো কথা বলেন। তাঁর মতে, মানুষ থেকেই লাঙ্গুলহীন বানরের উৎপত্তি। এই অদ্ভুত মতানৈক্যের জঙ্গলে আমাদের মতন সাধারণ পাঠককে পথ হারাতে হয় পদে পদে। আমরা কোন দিকে যাব? কার কথায় বিশ্বাস করব?

কোন দেশে মানুষের প্রথম আবির্ভাব, তা নিয়েও তর্কাতর্কির অন্ত নেই। Darwin, Smith ও Broom প্রভৃতি পণ্ডিতরা বলেন, মানুষের প্রথম জন্মভূমি হচ্ছে আফ্রিকা। তাঁদের মতে, আফ্রিকায় যখন গরিলা ও শিম্পাঞ্জীর মত লাঙ্গুলহীন বানরের জন্ম হয়েছে তখন ঐখানেই মানুষের প্রথম আবির্ভাবের সম্ভাবনা বেশী।

কিন্তু যুক্তির দিক দিয়ে ঐ মতই যথেষ্ট নয়। ভারতের কাছেই জাভা দ্বীপে মানুষের সবচেয়ে পুরানো কঙ্কালাবশেষ পাওয়া গিয়েছে এবং তার পাশাপাশি দ্বীপে—সুমাত্রায় ও বোর্ণিয়োয়—যখন লাঙ্গুলহীন বানর-জাতীয় বৃহৎ ওরাং-উটানের বাস, তখন পূর্ব-মত অনুসারে ঐ অঞ্চলেও মানুষের প্রথম জন্ম হ'তে পারে। *

---

* দক্ষিণ আমেরিকার গভীর জঙ্গলে টারা নদীর ধারেও সম্প্রতি লাঙ্গুলহীন এক বৃহৎ বানরীকে গুলি ক'রে মারা হয়েছে—মাথায় সে পাঁচ ফুট উঁচু। ও-জাতের পুরুষদের মাথার উচ্চতা নিশ্চয়ই তরে চেয়ে বেশী। গরিলা, ওরাংউটান বা শিম্পাঞ্জীর সঙ্গে উক্ত বানরীর দেহ মেলে না, অর্থাৎ সে ভিন্ন-জাতের। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আফ্রিকা, সুমাত্রা ও বোর্ণিয়োর মতন দক্ষিণ আমেরিকাতেও বড় জাতের লাঙ্গুলহীন বানর আছে। কিন্তু তাই ব'লে কেউ মতপ্রকাশ করেন না যে, দক্ষিণ আমেরিকাই মানুষের প্রথম জন্মভূমি।

আধুনিক বহু পণ্ডিত বলেন, মধ্য-এশিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলেই মানুষ প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। হিমালয়ের পাদপ্রদেশে (অর্থাৎ শিবলিক শৈলশ্রেণীর মধ্যে) সম্প্রতি নানান জাতের লাঙ্গুলহীন বানরের শিলীভূত কঙ্কাল (fossil) আবিষ্কৃত হয়েছে, তাদের Dryopithecus নামে ডাকা হয়। আদিম বানরদের মধ্যে তারা ছিল অতিকায়। নিউ ইয়র্কের W. K. Gregory সাহেবের মতে, দাঁতের গড়নে তারা ছিল বানর ও মানুষের পূর্বপুরুষদের মত। চীনদেশেও যে আদিম মানুষের (Peking man নামে বিখ্যাত) কঙ্কালাবশেষ পাওয়া গিয়েছে, প্রাচীনতায় তা স্থান পেয়েছে জাভার মানুষের পরেই। এই সব কারণে আধুনিক অনেক বিশেষজ্ঞ প্রাচ্য দেশকেই প্রথম মানুষের জন্মক্ষেত্র ব'লে বিশ্বাস করেন।

পণ্ডিতদের বহুবর্ষব্যাপী পরিশ্রমের ও মস্তিষ্কচালনার ফলে জানাও গিয়েছে অনেক কিছু। প্রাগৈতিহাসিক রঙ্গমঞ্চের যবনিকার অংশ-বিশেষ তুলে তাঁরা নানা বিচিত্র দৃশ্য দেখতে পেয়েছেন। যেসব বিষয় সম্বন্ধে তাঁরা প্রায় নিঃসন্দেহ, বর্তমান ক্ষেত্রে সেইগুলিই হয়েছে আমার প্রধান অবলম্বন।

আমরা এই গল্পে যে 'নিয়ানডের্টাল' মানুষদের কথা বলেছি, তারা ছিল কতকটা বানরধর্মী মানুষের শেষ বংশধর। (তারা অগ্নি, বস্ত্র ও অস্ত্র ব্যবহার করত এবং কথা কইত ব'লে ধরা যায়, যথার্থ মানুষী চিন্তা-শক্তি তাদের ছিল। মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও বোধহয় তাদের অস্পষ্ট ধারণা ছিল, কারণ মৃতদেহকে তারা সযত্নে গোর দিত।) ১৮৫৭ শতকে জার্মাণীর ডুসেলডর্ফ নামক স্থানে নিয়ানডের্টাল গুহায় সর্বপ্রথমে তাদের কঙ্কালাবশেষ আবিষ্কৃত হয়, তাই ঐ নাম। মাথায় তারা পাঁচফুট তিন ইঞ্চির বেশী উঁচু হ'ত না, কারুর কারুর মতে আফ্রিকার আধুনিক অসভ্য মানুষ হটেনটটদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আবিষ্কার করা যায়। কেবল য়ুরোপের নানা স্থানে নয়, আফ্রিকায় এবং এশিয়াতেও (ককেসসে ও প্যালেষ্টাইনেও) তাদের দেহাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। ভারতে এখনো তাদের কঙ্কাল পাওয়া যায় নি বটে, কিন্তু

আমরা অনায়াসেই ধ'রে নিতে পারি, আদিমকালে এখানেও তারা কিংবা তাদের কোন নিকট আত্মীয় বা প্রায় ঐ-জাতীয় মানুষ বিচরণ করত। কিন্তু তর্কের খাতিরে কেউ যদি জোর ক'রে বলেন যে, 'নিয়ানডের্টাল'দের কঙ্কাল যখন ভারতে পাওয়া যায় নি, তখন এদেশে তাদের আবির্ভাব দেখানো মস্ত ভুল, তাহ'লে আমি প্রতিবাদ করব না। তবে এক্ষেত্রে আর একটি কথাও স্মরণ রাখতে হবে। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে জাভা-দ্বীপেও 'নিয়ানডের্টাল' লক্ষণ-বিশিষ্ট মানুষের কঙ্কালাবশেষ পাওয়া গিয়েছে, তার নাম রাখা হয়েছে 'সোলো'-মানুষ।

বহু পণ্ডিতের মতে, 'ক্রো-ম্যাগ্নন' জাতের মানুষও এশিয়া থেকে য়ুরোপে প্রবেশ করে। সুতরাং ভারতেও তারা কিংবা প্রায় ঐ-জাতের মানুষদের আবির্ভাব স্বাভাবিক। 'নিয়ানডের্টাল'রা সিধে হয়ে হাঁটতে পারত না, এরা পারত। এবং এদের মধ্যে বানরকে মনে পড়ে, এমন কোন লক্ষণই ছিল না। কিন্তু য়ুরোপ থেকে এদের জাতও আজ অদৃশ্য হয়ে গেছে, (Fleure-এর মতে) আধুনিক বহু মানুষের উপরে নিজেদের অল্পবিস্তর ছাপ রেখে।

'নিয়ানডের্টাল' মানুষদের শেষ-জীবন থেকেই আমাদের গল্প আরম্ভ করেছি। তাদের প্রথম আবির্ভাবের সময়ে 'ক্রো-ম্যাগ্নন' মানুষরা পৃথিবীতে বর্তমান ছিল ব'লে প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

যদি কোন বিশেষজ্ঞ এই কাহিনীর মধ্যে ভুলভ্রান্তি পান, তাহ'লে তা গল্পলেখকের অজ্ঞতা বুঝে মার্জনা করবেন। আমি নৃতত্ত্ববিদ নই, নৃতত্ত্বের অল্পস্বল্প উপাদান নিয়েছি গল্পের ভিতর দিয়ে মানুষের আদিম জীবনের মোটামুটি একটি পরিচয় প্রদান করব ব'লে। পাঠকদের মধ্যে হয়তো আমারও চেয়ে কম অগ্রসর লোক আছেন, সেই ভরসাতেই এমন কঠিন আখ্যানবস্তু গ্রহণ করেছি। পণ্ডিতদের জন্যে নয়, তাঁদের জন্যেই এই কাহিনী। তাঁদের ভালো লাগলেই আমার শ্রম সার্থক।

—ইতি